ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

কর্ত্তৃক

কুটীরে যোগভক্তিবিষয়ক উপদেশ।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

১৮৫৩ শক।

মূল্য ৬০ আনা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ তৃতীয় সংস্করণে উপক্রমণিকা এবং সেবাশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের প্রথম উপদেশ সংযোগ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই সংস্করণে ভুলক্রমে এ দুইটি উপদেশ দেওয়া হয় নাই। আমাদের একটি বন্ধু দয়া করিয়া পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে এই দুইটি উপদেশ অনেক পরিশ্রম করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন; আমরা সেই বন্ধুর নিকট এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। "প্রবৃত্তি যোগ" উপদেশটিতে পূর্ব্ব সংস্করণে অনেকগুলি ভুল ছিল, এবার সে সমস্ত সংশোধিত হইয়াছে।

১৮৩২ শক। প্রকাশক।

সূচীপত্র।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ

অর্থাৎ

কুটীরে আচার্য্যের উপদেশ

উপক্রমণিকা

যোগ ও ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি।

কলুটোলা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ;

তোমরা দুইজন এক সময় সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। থাক্, পড়িয়া থাক্ সংসার, এ কথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার মানসিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার, অন্তরের পাপ-বিকার পড়িয়া থাক্, এই কথা বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমেশ্বরকে দেখ নাই, যাঁহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী, পরম ভক্ত ভাসেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া

রাখিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধানের পরম দেবতা স্বহস্তে কাজ করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের আদি বর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঈশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায়? সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ। বহু দূরে। এই পথ অতিক্রম করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে, তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে।

বিজয় এবং অঘোর, তোমরা সেখানে গিয়াও দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা হইবে, আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাসনা কেবল তীর্থভ্রমণ। কতকদূরে গিয়া দেখিবে, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এরূপে কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কতবার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড় লোক বলিয়া সম্মান করিব না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগ্নীদিগের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজবেশ দিব না, ধার্ম্মিকদের মধ্যেও গণ্য করিব না। ব্রতদান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। তোমাদের স্থান ভ্রাতাদিগের মস্তকের উপর নহে; কিন্তু সকলের পদতলে। যতবার তাঁহাদিগকে দেখিবে, ততবার তাঁহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমরা ভৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয়সংযম অতি কঠিন কার্য্য; কিন্তু যে ইন্দ্রিয়সংযম না করে, সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও কাম রিপু, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ,

দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অসূয়া দ্বেষ, দূর হও সংসারাসক্তি, দূর হও মানাকাঙ্ক্ষা, দূর হও স্বার্থপরতা, ব্রহ্মবলে বলী হইয়া এই কয়জনকে প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তপস্যাভূমির নিকটে আসিতে দিবে না। ব্রহ্ম শিখাইবেন, কিসে একার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। এইরূপে যদি ইহাদিগকে দমন করিতে না পার, তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদিগকে সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন, এরূপ না হয়। প্রবল রিপু জয় করা উপহাসের কথা নহে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর, ইহাদের যোগে অধিকার নাই। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই দুইজন সমুদয় রিপু বিনাশ করিবার জন্য গূঢ়রূপে সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তোমরা জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বর জানেন, কিসে মন দমন হয়। পৃথিবীর মধ্যে সার কর্ম্ম মন দমন করা। স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ অগ্নি আসিয়া হৃদয়ের মলা পরিষ্কার করিয়া দেয়। একান্তমনে নির্ভর করিয়া থাক, রিপুকুল বশীভূত হইবে। হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, একজন যোগ, একজন ভক্তি সাধন করিবে। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জান না, আমিও জানি না। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন। আমি জানাইব তোমাদিগকে, যখন তিনি শুভ বুদ্ধি প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মন্ত্র, আমার কথা দ্বারা তোমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। যেখানে কণ্টক, যেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা, স্ত্রী হউন, সন্তান হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্ম ভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাহ্মিকা ভগ্নী হউন, বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যে কার্য্য করিলে, যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে ভক্তিপ্রসঙ্গ

ভঙ্গ হয়, সেই কার্য্য ও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি দশ দিন কি এক মাস কালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে। প্রলোভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। অন্যে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন করিতেই হইবে। মন যদি তোমাদের কাহার সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশা মহাপাপ। দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ-পোষণের ইচ্ছা। সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরস্পরের কাছে এমন ভাবে থাকিবে, যে অন্যে বাধা দিলে 'আমরা ব্রতপালন করিব না' এরূপ নির্ব্বন্ধ কদাপি করিবে না। এই নিগূঢ় বিধি সর্ব্বদা অপরাজিত চিত্তে পালন করিবে। যদি আদেশ পাইয়া তাহা লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহা অপরাধ হইবে। অন্য প্রকার যদি অসদাচরণ হয়, তথাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্য পাঁচ প্রকার দোষ আছে বলিয়া, বিধি—যাহা বাঁচিবার উপায় এবং ঔষধ—তাহার প্রতি কখন যেন কোন প্রকার অযত্ন এবং অবহেলা না হয়।

ভক্তির অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচ জন ভক্ত একত্র হইয়াছেন ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি, এ সমুদয় ভক্তের লক্ষণ।

প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণমাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উন্মীলিত হইবে। দিবসে রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদিত হইবে। চিরপ্রসন্নতা ভক্তের লক্ষণ।

যোগধর্ম্মশিক্ষার্থী অঘোর, তুমি চক্ষু নিমীলন করিয়া এমনি ভাবে

যোগাভ্যাস করিবে যে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে। ঘোর অন্ধকার দ্বিপ্রহরা যামিনীতে যোগের নিগূঢ়তা অনুভব করিবে। এরূপ যোগসাধন করিবে যে, তোমার সমস্ত প্রাণের স্রোত ভিতরে যাইবে। তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কর নাই, যাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে। যোগের এমন অবস্থা আসিবে, যখন ধ্যান না করিলেও যোগ থাকিবে। যোগেশ্বরের শান্ত প্রশান্ত, সুগম্ভীর মুখ তুমি দেখিবে। নিমীলিতনয়নে ক্রমাগত বৎসর বৎসর তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তোমার চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তখন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরমহংসের ন্যায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়াও সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে। এই অসার সংসার মধ্যে হংসের ন্যায় কেবল সার গ্রহণ করিবে।

তোমরা দুই জনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতির বার্ত্তা আসিবে, তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান-বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্ম্মব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহারা তোমাদের নিকটে আছেন, তাঁহারা তোমাদের নিকট শিক্ষা করিবেন। কে বলিতে পারে, কার হস্ত পিতা কবে ধরিবেন?

হে উথলিত প্রেমসিন্ধু, সকল আয়োজন বৃথা হইবে, যদি, প্রভু, দয়া করিয়া তুমি আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত না হও। অসার জগৎ ছাড়িয়া সার সত্য জগতে প্রবেশ করিব বলিয়া আসিয়াছি।

এক ছায়ার হস্ত হইতে অন্য ছায়ার হস্তে পড়িতে আসি নাই। এক জন সারাৎসার গম্ভীর-প্রকৃতি যোগেশ্বর যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছেন, একজন প্রেমসুন্দর মঙ্গলময় ভক্তবৎসল ভক্তিশিক্ষা দিবার জন্য আসিয়া বসিয়াছেন, গুরু, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন শুভ কার্য্যে বিঘ্ন না হয়। বহু কাল হইতে প্রতীক্ষা করিয়া আছি, তোমার কাছে কবে প্রকৃতরূপে দীক্ষিত হইব। পাপীগুলোকে মহা আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়া দাও। তোমার প্রবল যোগধর্ম্মে আমাদের ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী আন্দোলিত হউক। কল্পনার শত্রু তুমি আসিয়াছ, সত্যের রাজ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দাও। স্নান করিয়া, ভক্তির ফুল, প্রেমের ফুল সঙ্গে লইয়া, তোমার নিকটে উপস্থিত হই। ইন্দ্রিয় দমন করিব, প্রাণের সহিত তোমাকে এবং তোমার সন্তানদিগকে ভালবাসিব। তোমার এ রাজ্যে প্রবেশ করিলে, সকলই আপনা আপনি হইয়া যাইবে। এক বার, হে ভবসাগরের মাঝী, আমাদিগের দিকে তাকাও। নৌকা যে ডুবিল! এ বৎসর আর হৃদয় চায় না, ভাঙ্গা নৌকায় পার হই। কি কি জিনিস সঙ্গে লইব, কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইব? করুণাময়, শুভ বুদ্ধি দাও, সঙ্গে লোকগুলি বাছিয়া লই, সম্বলবিহীন হইয়াছি বলিয়া পথে কষ্ট হইবে না। যাহারা শিক্ষা পাইল না, তাহারা কিরূপে যাইবে? যোগধর্ম্মের অত্যন্ত বল, ভক্তিশাস্ত্রের অত্যন্ত বল, এত তেজ নিষ্ফল হইয়া যাইবে না। বিপৎকালে বিপদ্‌ভঞ্জন বলিয়া তোমাকে ডাকিতেছি, কাছে এস। প্রলোভনগুলি ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, আরও কাছে যাইতে দাও, কয়জন জড় সড় হইয়া তোমার কাছে বসি। সংসারের মন্দ বায়ু যেন আর আমাদের কাছে আসিতে না পারে। তুমি গুরু, তুমি সহায়, তুমি শিক্ষক হও। আর কাহারও কাছে

উপদেশ শুনিতে চাই না। এ কাণ তোমারই জন্য রহিল, এ রসনা তোমারই জন্য রহিল। বাস্তবিক কিছুই জানি না। এখন দেখি, যে দিকে যাই, সেই দিকেই বিপদ্। পবিত্র হব বলে যে পথে গেলাম, সে পথে পাপ অপবিত্রতা আসিল। আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের মন দমন কিছুই ঠিক নয়। যখন মনে করিলাম ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম, তখনও দেখি কত অপবিত্রতা। এবার যেন অসার কিছু না থাকে। যাহা ধরিব, তাহাই তোমার আদেশে যেন সফল হয়। তোমার শ্রীচরণের ধূলি পাইয়া, সকলের কাছে বিনীত সেবক হইয়া থাকিব। আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাসঘাতক হইল, সে হাল ছাড়িল, এমন সময় তোমার যোগ ধর্ম্ম, তোমার নূতন বিধি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইল। সাধনের সমস্ত বিধি বলিয়া দাও। কে কোন্ পথে যাইবে, এখন তুমি নূতন শাস্ত্রে দীক্ষিত কর। আমাদের ভাব, আমাদের গান, আমাদের পূজা তুমি নূতনরূপে বিরচিত করিয়া দিবে। হে দয়ার সাগর, হে আমাদের জীবনের জীবন, আমাদের ভার তোমার হস্তে, তব হস্তে আমাদের জীবন রাখিতেছি। গূঢ় কথা সকল গোপনে বলিবে। সাধারণ মন্ত্রদাতা, এখন আমাদিগকে সাধারণ মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তোমার চরণার্থীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

ভক্তি।

কলুটোলা, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভক্তি কি, স্থিরচিত্তে অনুধাবন করা উচিত। যোগ বা ভক্তির পথে কি চাই, তাহা স্পষ্ট

জানা প্রয়োজন। অগ্রে জানা না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। এ পথের বাঞ্ছিত ফল কি, ভক্তির লক্ষণ কি, কিরূপে উহা সাধিত হয়, এ সকল সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে।

ভক্তি কি? হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি। কোন্ প্রকারের পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উদিত হয়? সত্যং শিবং সুন্দরং পদার্থ। যে পদার্থে কেন সত্য শিব সুন্দর ভাব থাকুক না, তাহা দেখিয়াই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ ভক্তি ভাববিশেষ; সত্য, শিব, সুন্দর এই তিন গুণ উহার উদ্দীপক। ভক্তি এই তিন গুণ ভিন্ন আর কিছু চায় না। যেখানে এই তিন গুণের একটিরও অভাব আছে, সেখানে ভাবের পূর্ণতার ব্যাঘাত এবং ভক্তির বিকার উপস্থিত হয়। ভক্তি অবিকৃত কোথায়? সেইখানে, যেখানে একজন পুরুষ, যিনি সৎ, মঙ্গল ও সুন্দর, তাঁহাতে উহা অর্পিত হইয়াছে। এই পুরুষ কিসে সুন্দর? মঙ্গলে এবং দয়াতে। সেই দয়া কাহার? যিনি একমাত্র সৎ পদার্থ তাঁহার।

ভক্তি বিশ্বাসমূলক। ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। কারণ ভক্তির প্রধান অবলম্বন দয়া ও মঙ্গল ভাব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণা বিশ্বাস ভিন্ন হয় না। বিশ্বাস ভক্তি বিনা থাকিতে পারে, ভক্তি বিশ্বাস বিনা থাকিতে পারে না। যেখানে ভক্তি আছে, সেখানে বিশ্বাস অন্তরে নিহিত আছে, ইহা নিশ্চয়। যদি ভক্তিতে বিশ্বাসের অল্পতা হয়, তবে নিশ্চয় উহা বিকৃতা হইয়া যায়। ভক্তিতে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জানা চাই,—এই যাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি সৎ, তিনি আছেন, নিশ্চিত আছেন, তিনিই মঙ্গলময় এবং দয়াল পিতা। সত্য আধার, তাহাতেই দয়া আরোপিত হয়। এই আরোপিত দয়া সুন্দর

ভাব ধারণ করে। এই সৌন্দর্য্য আর কোন সৌন্দর্য্য নহে, দয়ার সৌন্দর্য্য। সত্য আধারে দয়া পড়িলে উহা সুন্দর হইবেই হইবে। ইহা কল্পনা নহে; কারণ যথার্থ আধারে দয়া আরোপিত হইয়া সুন্দর বস্তুর গঠন হয়। ঈশ্বরের এইরূপই গঠন। কারণ যিনি দয়াতে সুন্দর হইয়াছেন, তিনি দয়াতে অনন্ত, সুতরাং সৌন্দর্য্যেও অনন্ত। যেখানে সৌন্দর্য্য আছে, সেইখানে আকর্ষণ আছে। যিনি সৎ, মঙ্গলময়, সুন্দর, তিনি হৃদয়কে টানেন। এই টানে আকৃষ্ট হওয়ার ভাবই অনুরাগ, ভক্তি, প্রেম।

সত্য, শিব, সুন্দর, এই তিনেতে যিনি এক, ভক্তি তাঁহাকেই দেখে, তাঁহাকেই চায়। ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা এই যে, ভক্তির মূল স্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক করা উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত নহে, তাহা দুই পাঁচ বৎসর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। যাহার ভক্তির ভূমি স্থিরতর, যাহার ভক্তি সত্য, শিব, সুন্দরে প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভক্তি অনন্তকাল পূর্ণতা লাভ করে। যদি এই তিন গুণের একটিরও ব্যাঘাত হয়, সমুদায় সাধন, ভজন, পূজা, অর্চ্চনা ব্যর্থ হয়। সত্যে ভক্তি ক্ষীণভাবে অবস্থিতি করে, দয়াতে উহার কোমলতা বৃদ্ধি পায়, ক্রমে প্রবল হইয়া উহা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধতারূপে পরিণত হয়। সত্যে বিশ্বাস ও ভক্তির আরম্ভ, কিন্তু উহা তখন দুর্ব্বলভাবে অবস্থান করে। দয়াতে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। সত্যে ভক্তির বাল্যকাল, এই বাল্যকাল ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া যৌবন প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে পরিণত-বয়স্ক হইয়া দয়ার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়। ভক্তির আকার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন মধুরতাময়। সৌন্দর্য্যে মগ্নভাব, প্রগল্‌ভা ভক্তি। উহা স্রোতের ন্যায় ভক্তকে টানিয়া লইয়া যায়, সৌন্দর্য্যে ভক্ত একেবারে জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। দয়া ভাবিতে ভাবিতে পুরুষ সুন্দর হইয়া দাঁড়ান।

সেই সৌন্দর্য্যে ভক্ত একেবারে বিমোহিত হইয়া যান। "সত্যং শিবং সুন্দরং" ভক্তি-পথের মন্ত্র, এই মন্ত্র জপে আশু সিদ্ধি হয়।

যোগ।

কলুটোলা, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

কোন পথের পথিক হইলে লোকে কোথায়, কতদূর যাইতে হইবে, অগ্রে স্থির করিয়া লয়, অন্যথা পথের মধ্যে একটি স্থানকে গম্যস্থান বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে। সুতরাং যোগপথে যাইবার পূর্ব্বে যোগের লক্ষণ কি, যোগ কি, জানা আবশ্যক। যোগ শব্দের অভিধানের অর্থ, দুই স্বতন্ত্র স্থানে স্থিত পদার্থের একত্র মিলন। দুয়ের সংযোগ, দুয়ের একত্র মিলন যোগ। যোগে দুটি পদার্থের আবশ্যক, এবং সেই দুই স্বতন্ত্র পদার্থের একত্র মিলন হইলে যোগ হয়। পবিত্রতা অপবিত্রতা, পুণ্য পাপ, এ এক ভিন্নতা; সৃষ্ট ও স্রষ্টা, অল্পশক্তি ও অনন্তশক্তি, এ আর এক ভিন্নতা। ইহার একটিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিয়া ভিন্নতা হইয়াছে, আর একটি প্রকৃতিতে ভিন্নতা। ইচ্ছায় বিরোধ সহজ নহে, উহা শত্রুতা। এই পাপমূলক শত্রুতা, বিবাদ, বিরোধ, যুদ্ধ যাহাতে দূর হয়, এজন্য যোগের আবশ্যক। এই যোগ দ্বারা বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মিলন হয়। যোগের ইহাই লক্ষ্য। শত্রুতা বিনাশ করিয়া উভয় পদার্থের মিলন হইলেই যোগ হইল। প্রথমতঃ কালদেশ সম্বন্ধে যে দূরতা থাকে, তাহা যোগে যত্ন করিতে করিতে নিকট হয়; কারণ উপাসনাসময়ে যে সামীপ্য অনুভূত হয়, তাহাই যত্ন দ্বারা অন্যসময়েও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে সাধুমণ্ডলীতে, পুষ্পে, কাননে বা পর্ব্বতে যে

সামীপ্য অনুভূত হইয়াছিল, তাহা অন্যত্রও অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান, ভাব এবং কার্য্যে আমাদিগের ঈশ্বর হইতে যে দূরতা, উহাই এইরূপ সাধন দ্বারা নিরস্ত হয়। এইরূপে ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে দূরত্ব চলিয়া গিয়া ঈশ্বর এবং জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একত্ব বা মিলনই যোগ। এইরূপে যাহার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে, তাহাকেই যোগী বলা যায়। অন্যথা যে অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া সেখানে অবস্থান করে, তাহাকে কখন যোগী বলা যায় না। ব্রহ্মে যোগী অবস্থিত, যোগীতে ব্রহ্ম অবস্থিত, এইরূপ যোগযুক্ত হইলে যোগী পরম নিবৃত্তি লাভ করেন।

যোগ ভক্তির সাধারণ ভূমি।

কলুটোলা, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

যোগের লক্ষণ, ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। যোগ এবং ভক্তির এক স্থলে মিল আছে, তাই তোমাদিগকে একত্র বসাইয়াছি। ভক্তির মূল মন্ত্র "সত্যং শিবং সুন্দরং", যোগ ঈশ্বরের নৈকট্যানুভব। ঈশ্বরকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি, এ দুয়েরই প্রথম পাঠ। এ স্থলে দুজন এক। শিব, সুন্দরে গভীররূপে নিমগ্ন হইলে, ভক্তের যোগী হইতে ভিন্নতা উপস্থিত হয়। বিশ্বাসভূমি, শ্রদ্ধাভূমি যোগী এবং ভক্তের এক। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা ভক্তি পরিপক্ক হয় না, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা যোগেও অধিকার জন্মে না। অতএব শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের বিষয় তোমাদিগের দুজনেরই শ্রবণ করা আবশ্যক।

ঈশ্বরের সত্তাতে নিঃসংশয় না হইলে ভক্তি বা যোগ কিছুই সম্ভব নহে। অতএব দুজনেরই প্রথম পাঠ "সৎ"। সৎ শব্দের অর্থ কি?

সৎই বলা যাউক, আর সত্যই বলা যাউক, ইহার গূঢ় অর্থ জানা আবশ্যক। সৎ কি? না, যাহা "যথার্থ আছে"। ঈশ্বর যথার্থ আছেন; পদার্থরূপে, সৎ পদার্থরূপে আছেন। যাহা নাই, তাহা অসৎ, অসৎ মিথ্যা। ঈশ্বর নাই নন, এই প্রথম। ইহার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা দর্শন। সাধনের নিম্নতম অবস্থায় "নাই তাহা নয়" এই আরম্ভ, সাধনের পরিসমাপ্তি দর্শন। মধ্যমাবস্থায় "ইনি নন তাহা নয়।" এই তিনটি সোপানে ক্রমে উত্থান হইয়া থাকে। 'তিনি নাই তাহা নহে', এই হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে, 'তিনি আছেন' স্বীকার করিয়া ক্রমিক উন্নতি চাই, পূর্ণ নিঃসন্দেহ চাই। প্রথমাবস্থায় ছায়া এবং কল্পনার ভাব, অস্থিরতা, অসমান ভাব, অনিশ্চিত জ্ঞান, চঞ্চল দীপশিখার ন্যায় চঞ্চল বুদ্ধি। মধ্যমাবস্থায় 'নাই'র দিকে হ্রাস, 'হাঁ'র দিকে বেশী। "আছেন", ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হইলে দর্শনের আরম্ভ হইল, ক্রমে ইহা উজ্জ্বল হইবে। প্রাতে একরূপ, দ্বিপ্রহরে একরূপ। আরম্ভে 'নাই' অস্বীকার। সৎ—অসৎ নন, এই আরম্ভ। তিনি ছায়া, কে বলিল? দর্শনের সাধন, সৎস্বরূপের সাধন এইরূপে হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ বুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত দর্শন হয় না। মধ্যমাবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে অল্প আলোক পড়ে, সদসতের মিলন থাকে, সতের সঙ্গে মিশ্রিতভাবে অসৎ থাকে, অবশেষে শেষটি কমিয়া যায়।

জ্ঞানীর নিকটে বর্ত্তমানতা সর্ব্বস্ব। ঈশ্বরপূজা, বর্ত্তমানতার পূজা একই! 'তিনি আছেন, তাঁহার যে গুণ থাকে থাক, তিনি আমার সঙ্গে আছেন', এইটি করিলে কল্পনাবর্জ্জিত সাধন হইবে। যদি অসৎ ঈশ্বর হইতে বাঁচিতে চাও, তবে যাহাতে বর্ত্তমানতা ধরিতে পারা যায়, তজ্জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিবে। যদিও বর্ত্তমানতার সঙ্গে কোন গুণ যোগ দিলে ব্রহ্মদর্শন সুলভ হয়, কিন্তু এরূপে রং দিয়া সাধক

জাজ্বল্যমান পুরুষসত্তাতে যত আরোপ করিবেন, তত বিপদের সম্ভাবনা। কেবল যিনি বর্ত্তমানতার পূজা করেন, তিনিই নিরাপদ্। সর্ব্বপ্রকারের মূর্ত্তি ছাড়িতে হইবে, সুতরাং কেবল বর্ত্তমানতা গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানতাই ব্রাহ্মের পূজনীয় বস্তু। কেবল বর্ত্তমানতা ধরা, সাধন ভিন্ন হয় না। সাধন কি? নিরাকার যিনি, তাঁহাকে কি প্রকারে ধারণ করিব? এখানে ধারণ করিবার বিষয় আছে। এই তিনি এখানে আছেন, নাই নহে, এখানে একজন আছেন,—এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রথম তাঁহাকে শুক্ল রং বর্জ্জিত আকাশের তুল্য গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য তিনি "আকাশ" নাম পাইয়াছেন। গুণ নাই, বর্ণ নাই, যতদূর আকাশ ততদূর আছেন, এই ভাবটিকে অধিকার করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ইহাতে কল্পনা আসিবে না। নির্জ্জনে অন্ধকারে আমার সমক্ষে একজন বর্ত্তমান আছেন, এই যে 'আপনি ছাড়া আর একজন' এই ভাবটি প্রথম শিক্ষা ইহার আরম্ভ কঠিন, শেষে সুলভ। কল্পিত পথে অগ্রে মধু, পশ্চাৎ বিরস; যথার্থ পথে প্রথম কণ্টক, পরে পুষ্প। সর্ব্বপ্রথমে সেই স্থির সত্তা গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল পদার্থ সৎ, এইরূপ ধারণ করিতে হইবে। তিনি ভালবাসেন, কি ভালবাসেন না, তথাপি আছেন; তিনি দেখেন, কি দেখেন না, তথাপি আছেন; তিনি শাস্তি দেন, কি না দেন, তথাপি আছেন; তিনি ক্রিয়াবান্ হউন বা ক্রিয়াহীন হউন, তথাপি আছেন। এরূপে গ্রহণ কঠিন, কিন্তু এরূপে গ্রহণ করিতে যদি ছয় মাসও অতীত হয়, তথাপি করিতে হইবে, কেন না এরূপ করিয়া গ্রহণ করিলে সব সুলভ হইবে। কল্পনা লইয়া ছয় বৎসর সাধন করিলেও যথার্থ ঈশ্বর কেহ প্রাপ্ত হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞানী কল্পনার পূজাকে পৌত্তলিকতা

বলেন। এই সৎপদার্থ গ্রহণ কি, জ্ঞান প্রতিভাত হইলে বুঝিতে পারা যায়, অন্যথা বুঝিতে পারা যায় না। তবে উপমাতে এই বলা যায় যে, যেমন ছাদের উপরে অন্ধকারে আমি আছি, আর একজন আমার চারিদিকে আছেন, এই ভাবিয়া যে মনের অবস্থান্তর হয়, ভয় উপস্থিত হয়, উহাই উহার প্রথম লক্ষণ। এইরূপ অনুভবে মন চমকিত ও স্তম্ভিত হয়, হৃদয় গুরুত্ব অনুভব করে, লঘুতা চলিয়া যায়।

এখানে উপমা বিফল। শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, উহা অনুভব করিতে হয়। এই অদৃশ্য সত্তাকে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে কঠোরতা চলিয়া গিয়া আহ্লাদের উদয় হয়। ঘরে থাকি আর বাহিরে থাকি, তখন কেবল সত্তানুভব। "তুমি আছ" এই মন্ত্র ততক্ষণ ততবার চিন্তা করিবে, যতক্ষণ না স্তম্ভিত ভাব আসে। এইরূপ স্মরণে ভয় ও ক্রমে আহ্লাদ, প্রথমে হউক বা না হউক, অন্ততঃ একা থাকিলে যে ভাব হয়, তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। আমি একা, এইটি ভাবিলে যে ভাব উপস্থিত হয়, উহাই নাস্তিকতার অবস্থা। ফলতঃ আমি আছি, আর কেহ নাই, ইহা নাস্তিকতা, ইহার বিপরীত আস্তিকতা। প্রথমাবস্থায় 'এখানে কেহ নাই তাহা নয়' ইহাতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে জীবনের প্রত্যুষাবস্থায় একজন থাকিলে যে ভাব হয়, সেই ভাব উপস্থিত হয়। অন্ধকারে একজন স্পর্শ করিলে যেমন গা ছ্যাঁক করিয়া উঠে, ইহাতে সেই ভাব হয়। কেহ যেন এখানে লুক্কায়িত আছেন, গুপ্ত আছেন, এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। কিরূপে, কি ভাবে, কে আছেন জানি না, অথচ আছেন, এই প্রথম ভাব। দৃষ্টান্ত দিতে, অন্ধকারে ভূতের ভয়কে দৃষ্টান্ত স্থলে আনিতে পারা যায়। কোন শ্মশানে প্রবেশ করিলে কেহ ভয় বারণ করিতে পারে না। সেই দৃষ্টান্ত লইলে বুঝিতে পারা যায়, আমি ছাড়া অদৃশ্য

কেহ আছে বুঝিলে মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। কিন্তু সেই সময়ে যদি অন্য কেহ তথায় আসে, তবে আর ভয় থাকে না। কেন না, তখন দৃশ্য পদার্থে মন অভিনিবিষ্ট হয়।

সত্তানুভবে স্মরণ মাত্র অবলম্বন। এই স্মরণ ঈশ্বর-দর্শনের প্রথমাবস্থা। এই স্মরণ হইতে সুন্দর সুগঠিত ভাবের উদয় হয়। ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য স্মরণ প্রধান সহায়। স্মরণে দ্বৈত ভাব অনুভূত হয়। সত্তা প্রথম অদৃশ্য ছিল, এখন অনুভব হইল। মনে ইচ্ছা হইল, উহা ভাল করিয়া ধরিব। এখানে একাকিত্ব অস্বীকারের ভাবটিকে প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। ভাব আন্তরিক, সত্তা বাহিরে। যখন সত্য কথঞ্চিৎ অনুভব হইল, তখন "সত্যং" বলিতে অধিকার হইল। মনে রাখিও, এইটি সূত্রপাত। অন্ধকার দেখিলে হাতে প্রদীপ লইয়া দেখিতে স্বভাবতঃ কৌতূহল হয়। বাহিরে যখন সত্তার ভাব প্রস্ফুটিত হয়, অন্তরে গাম্ভীর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবকে স্থায়ী করিবার জন্য মনের প্রধান বৃত্তি স্মরণ পরম বন্ধু। "আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন" এই শব্দ ক্রমান্বয়ে সাধনার্থ আবৃত্তি করিতে হইবে এবং ভাবগুণবিবর্জ্জিত সত্তা ভাবিতে হইবে। ততবার উচ্চারণ করিবে, যতবার ভাব ঠিক না হয়। সাধনের একটি সঙ্কেত এই, ক্ষুদ্র কখন ব্যাপ্তভাব ধারণ করিতে পারে না, সঙ্কীর্ণভাবে আবার পৌত্তলিকতা হয়। সৎ সর্ব্বব্যাপী, সাধনের অবস্থায় সাধক তাঁহাকে অল্পাকাশে ধারণ করিবেন। এই অল্প স্থানে আবদ্ধ রাখিলে পৌত্তলিকতা হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাকাশে স্মরণ, অল্পাকাশে ধারণ। অনন্ত সত্তা জ্ঞানে, ধারণ অল্পস্থানে

সংযম।

কলুটোলা, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

কোন ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সংযম আবশ্যক। যেটি সঙ্কল্প করিয়া ব্রত গ্রহণ করা যায়, সেইটির প্রতি সমস্ত বুদ্ধি, অনুরাগ, সমস্ত চেষ্টা সম্বদ্ধ হয়, এজন্য সংযম আবশ্যক। এ পৃথিবীতে সিদ্ধির পক্ষে বিভক্ত মন বিশেষ প্রতিবন্ধক। একটি স্থিরতর সঙ্কল্প না থাকিলে, পাঁচটি সঙ্কল্পের দিকে মন ধাবিত হয়, ইহাতে কোন দিকেই সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এজন্য ব্রত-গ্রহণের পূর্ব্বে সংযম ঈশ্বরের আদেশ। বুদ্ধি, যত্ন, হৃদয়, মন সমুদায় শক্তি এক স্থির সঙ্কল্পের দিকে নিয়োগ কর, পরে ব্রত গ্রহণ করিবে। এক পক্ষ পরে ব্রত গ্রহণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই এক পক্ষে বিশেষরূপে সংযত হইতে হইবে।

বুদ্ধি স্থির করিয়া মনঃসংযোগ কর। মনকে স্থির করিবার পক্ষে দুইটি শত্রু। ১ম অন্য চিন্তা, ২য় পাপ চিন্তা; কিম্বা ১ম অন্য চিন্তা, ২য় ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য। একাগ্রতা উদ্দেশে সংযম। বিক্ষিপ্ত মনকে এক দিকে নিয়োগ—সংযম। ইহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা আবশ্যক। ভক্তিই অভিপ্রেত হউক, বা যোগই অভিপ্রেত হউক, অন্য চিন্তার উপরে জয়লাভ করিতেই হইবে। উপাসনার সময়ে একজনের অন্য চিন্তা আসিতে পারে, কিন্তু যোগ ভক্তিতে অন্য চিন্তা আসিতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে অন্য চিন্তা করা পাপ নয়, কিন্তু সাধকের পক্ষে উহা অপরাধ। ঈশ্বর-চিন্তা পাঁচ মিনিট করিতে না করিতে অন্য চিন্তা আসিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাকে থাকিতে দেওয়া পাপ। ইহাতে অঙ্গীকার লঙ্ঘন হয় বলিয়া পাপ; অল্পমাত্রও অনধিকার চিন্তায় সঙ্কল্পস্থিরতার ব্যাঘাত হয়।

দীপশিখার নিকটে সামান্য বায়ু আসিলেও উহা নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। মনের কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্যেও দৃঢ়তা যায়, তেজের অল্পতা এবং অনুরাগের হীনতা হয়। সুতরাং অন্য চিন্তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যবধান দূর করা যোগের উদ্দেশ্য, এক বস্তুতে অনুরাগ ভক্তির উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে অন্য ভাব, অন্য চিন্তা শত্রু; কেন না, অবিভক্ত মন ভিন্ন অনুরাগ হয় না, যোগ হয় না। ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে যে বিভাগ, তাহাকেই পূর্ব্বে শত্রুতা বলা হইয়াছে। এ বিভাগ আর কিছুই নহে, অন্য চিন্তা। স্থির সমুদ্রে কিছু পড়িলেই চাঞ্চল্য আইসে। সাধকের মন এইরূপ অল্প অন্য চিন্তাতেই দুষ্ট পথে ধাবিত হয়, চেষ্টা অনুরাগ বিভক্ত হইয়া পড়ে।

অন্য চিন্তাকে লোকে পাপ মনে করে না। কিন্তু কোন্ সময়ে ইহা পাপ বলিয়া গণ্য? ধ্যান, উপাসনা, ভক্তি ও সংযম সময়ে। এ সময়ে যদি সচ্চিন্তা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পর্কায় চিন্তাও আইসে, তাহাও পরিত্যাজ্য। কারণ যে চিন্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন করা যায়, তাহাতে নিশ্চয় অপরাধ। যদি কোন চিন্তা ভাবযোগের নিয়মানুসারে আইসে, উহা পোষণ করা পাপ। ভাল চিন্তাও আহ্বান করিয়া আনিয়া মুহূর্ত্তমাত্র রক্ষা করাও অপরাধ। এ সাধন দুরূহ হইলেও বৎসর ব্যাপিয়া আত্মাকে শান্ত করিবে বলিয়া যখন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, সেই সময়েই অঙ্গীকার করিয়াছ যে, তোমাদিগের আর অন্য চিন্তায় অধিকার নাই। এরূপ অঙ্গীকার করিয়া অন্য চিন্তাকে অধিকার দেওয়া সত্যলঙ্ঘন। বিশেষতঃ এরূপ হইতে দিলে মনের অবিভক্ত ভক্তিযোগ জন্মিবে না, এবং তদ্ভিন্ন তোমাদিগের সাধন সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং স্থির হইল, অন্য চিন্তা পাপ চিন্তা; ১ম সত্যলঙ্ঘন, ২য় সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত।

মন বিশেষতঃ অল্পাধিক স্বভাবতঃ চঞ্চল। মন কর্ম্মশীল, সুতরাং উহাতে চিন্তা অধিক। যে মন সংযম করে নাই, সে অন্যচিন্তাপ্রিয়। এই মনকে সংযত করিতে বহু অভ্যাস, বহুকালের অভ্যাস চাই। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি যদি এক মিনিট অন্য চিন্তা করেন, অন্যের পক্ষে চুরী করা যেমন পাপ, তাঁহার পক্ষে সেই এক মিনিটের চিন্তা তেমনি পাপ। তোমাদের এখনকার অবস্থা এরূপ নহে। তোমাদিগকে এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে। সঙ্কল্পবহির্ভূত চিন্তা আসিবা-মাত্র তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সাধনের অবস্থায় চিন্তা আসিবামাত্র দূর করিয়া দিতে দণ্ডায়মান থাকা এবং দূর দূর বলিয়া তাড়াইয়া দেওয়াতে ঈশ্বর তাহাকে নিরপরাধিরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং এ বিধি অবশ্য পালনীয়। অন্য চিন্তা আসিবামাত্র আত্মা গম্ভীর ভাবে 'দূর হ' শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহার সুফল দেখিয়া তোমরা অবাক্ হইবে। এ কথা উচ্চারণে সরলতা এবং গাম্ভীর্য্য চাই। সরল গম্ভীর ভাবে এ কথা উচ্চারণ করিলে দেখিতে পাইবে, এ কথার মধ্যে বল আছে। আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনার সময়ে, নির্জ্জন সাধনের সময়ে প্রেম ভাবের মধ্যে, চিন্তামগ্ন যোগের অবস্থাতে অন্য চিন্তা আসিতে পারে। ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা আসিল, কি অপরাধসম্বন্ধে চিন্তা আসিল, বিচার করিও না। যে পরিমাণে উহা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিল, সেই পরিমাণে উহা শত্রু, উহা অপরাধ। এই বিধি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। যখনি কোন বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনি 'দূর হ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহাকে দূর করিয়া দিবে।

ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য।—এটি আরো ভয়ানক। মন সংযত কর। বিরুদ্ধ চিন্তা হইতে আপাততঃ মন অস্থির না হউক, কিন্তু জানিও, সকল অবস্থাতে ইন্দ্রিয়-সংযম একান্ত আবশ্যক। ধ্যানাদি কঠিন এবং

অসম্ভব হইবে, যদি কাম, লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি অবস্থিতি করে। যে স্বভাবে এ সকল প্রবল, তাহাতে স্থিরতা, শান্তি অসম্ভব। এ জন্য চতুর্গুণ যত্নে ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হইবে। তোমরা দুইজন ইন্দ্রিয়-সংযমে বিশেষ চেষ্টা করিবে। আহার স্নানাদির নিয়মকে সংযম বলে না, কঠোর ব্রতাদি দ্বারা প্রিয় ইন্দ্রিয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখা সংযম। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম পরে বলা যাইবে। এখন এই মাত্র বলিতেছি, তোমরা মনকে অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন না করিলে, ইন্দ্রিয়-সংযমে কৃতসঙ্কল্প না হইলে, ব্রতগ্রহণে অক্ষম হইবে। এই পক্ষ পরে যদি দৃষ্ট হয়, অপর চিন্তা এবং রিপুসম্বন্ধে মনের দ্বার অবরুদ্ধ হয় নাই, তবে সংযমের সময় আরো বিস্তৃত করিতে হইবে। এই সংযমের অবস্থার উপরে এক বৎসরের ফলাফলের বীজ রোপিত হইবে। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। সংযমকালে সাধক সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে, ইহা দেখিয়া ঈশ্বর তাহাকে নিরপরাধ স্থির করিতে চান। তিনি তোমাদের চেষ্টায় সন্তুষ্ট হইলে, তবে তোমরা ব্রতগ্রহণে অধিকারী হইবে। যদি রিপু প্রবল থাকিল, সংযম হইল না। বাহ্যিক উপায় বৃথা, তোমরা অন্তর দেখিবে। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে চিন্তা আসিলেও 'দূর হ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। দুয়েরই একই মন্ত্র। সম্পূর্ণ যত্ন, চেষ্টা ও ভাবে 'দূর হ' বলিলে সাধক নিরপরাধিরূপে গণ্য হন। ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য দীক্ষা-পথ অবরুদ্ধ করে। এ স্থলে সম্পূর্ণ চেষ্টা দীক্ষাপথে প্রবেশের অধিকার। যে ব্যক্তি কুভাব কুচিন্তা আসিলে গম্ভীরভাবে প্রার্থনাশীল অন্তরে বজ্র-ধ্বনিতে 'দূর হ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, ঈশ্বর তাহাকে অধিকারী জ্ঞান করেন। পরে তিনি সাধককে এই সকল চিরকালের জন্য

সংহার করিবার ঔষধ অর্পণ করেন। তোমাদিগকে অদ্য এই বিশেষ করিয়া বলিতেছি, তোমরা এরূপ যত্ন কর যে, অন্য চিন্তা, পাপচিন্তা, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য তোমাদের সাধনের ব্যাঘাত না করে। এ সম্বন্ধে প্রথমতঃ তোমরা নিজে সাক্ষী হইবে, পরে তোমাদের ভ্রাতা ভগিনী সাক্ষী হইবেন। তোমাদের চিত্ত স্থির সমাহিত হইল কি না, এ বিষয়ে তোমরা সাক্ষী এবং তৎপর চারিদিকের লোক ইহার সাক্ষী হইবে। এ কয় দিন তোমরা সাবধানে ধৈর্য্য শিক্ষা কর। সাধনের সময়ে যদি তোমাদিগের মন আয়ত্ত হয়, অন্য সময়ের জন্য ভাবনা নাই। সমুদায় দিন ঈশ্বরের হইয়া থাকা সুলভ নহে, কিন্তু উপাসনা-ব্যতিরিক্ত সময়েও চিন্তাতে বিরুদ্ধ চিন্তা আসিতে না দেওয়া আবশ্যক।

স্থৈর্য্য-সাধন।

কলুটোলা, ১৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ; ১লা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

চিত্তের স্থিরতাসম্বন্ধে যে সাধন, সেই সাধনের আরম্ভ স্থানেতে, তার পর আসনে, তার পর শরীরে, তার পর মনে। এই চতুর্বিধ সংযম অবলম্বন করিলে মনের স্থিরতা পরিপক্ব অবস্থা ধারণ করে। প্রথম তিনটি ভৌতিক, সর্ব্বশেষ আধ্যাত্মিক। ইহারা স্থৈর্য্যের পক্ষে সহায় ও হেতু, সুতরাং এ সম্বন্ধে অবহেলা করিও না। তিনটি এক শ্রেণীর, চতুর্থটি অন্য শ্রেণীর। কিন্তু সহায়তাসম্বন্ধে দুইই সাধকের পক্ষে প্রয়োজন ও অনুকূল।

১ম, স্থান।—সাধকের জন্য যে স্থান স্থির করা হয়, যতদূর সম্ভব, সেই স্থানই অবলম্বনীয়। কতকগুলি বিষয় এমন আছে, যাহার স্খলনে

পবিত্রতার ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু সাধনের ব্যাঘাত হয়। স্থানসম্বন্ধে এই জন্য বলা যাইতে পারে, প্রাতঃকালে এক স্থানে, সায়ংকালে অন্য স্থানে, পরদিন অপর স্থানে পূজা করিলে; এইরূপ একই ঘরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পূজা করিলে; উহা পরিত্যাজ্য। যে ঘরে উপাসনা করিবে, সে ঘর এবং সেই ঘরের যে স্থানে পূজা করিয়া থাক, সেই স্থান ও সেই দিক্ স্থির রাখিয়া, প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপাসনা করা বিধেয়। যে দিকে মুখ করিয়া যে বিভাগে বসা হইল, উহা স্থির রাখিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিবে। ঘটনাক্রমে একান্ত বাধ্য হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পার, নচেৎ নয়। ফলতঃ এক ঘর, এক স্থান, এক মুখে সাধন আবশ্যক। চিন্তা, নির্জ্জনসাধন, সঙ্গীত, সজন উপাসনা, সর্ব্বত্র এইরূপ স্থির রাখিতে হইবে। যদি ছাদের এক স্থান মনোনীত করা হইয়া থাকে, সেই স্থানে সাধন আবশ্যক। এইরূপ স্থির রাখিবার তাৎপর্য্য কি? স্থানে ধর্ম্ম বদ্ধ নহে, ইহা ঠিক কথা; কিন্তু স্থানসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। কেন না, একস্থানে শান্ত হইয়া না বসিলে, সর্ব্বদা স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কখন উদ্যানে, কখন নদীর কূলে, কখন পর্ব্বতের উপরে ইত্যাদি। ইহাতে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু উচিত এই যে, যে স্থানে প্রথম বসিলাম, সেই স্থানে বসিয়াই সাধন করিব; কেন না, ইহাতে প্রথমে ব্যাঘাত হইলে পরিশেষে তাহা জয় করিতে পারিব। এরূপ সাধনে মনঃসংযম, মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব-সংস্থাপনে সুফল ফলিবে। যত পরিবর্ত্তন করিবে, তার সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু স্থির রাখিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তা হয়।

২য়, আসন।—আসনসম্বন্ধেও এইরূপ। আজ এক প্রকার আসনে

বসিলাম, কল্য আর এক প্রকার আসনে বসিলাম, আজ কিছুর উপরে বসিলাম, কল্য বসিবার কিছুই নাই, আজ অতি পরিপাটী বস্তুর উপরে উপবেশন করিলাম, কল্য অতি কদর্য্য আসনে বসিলাম—ইহা স্বেচ্ছাচার। স্থান জঞ্জালপূর্ণ অপরিষ্কার হইতে পারে, এজন্য আসনের ব্যবস্থা। তাদৃশ স্থানে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, এজন্য আসনের প্রয়োজন। পূর্ব্বে যেরূপ অস্থিরতার কথা বলা হইয়াছে, আসন-সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কখন মাটীতে, কখন প্রস্তরে, কখন বহুমূল্য আসনে, কখন সামান্য আসনে, কখন উচ্চ আসনে, এইরূপ নানা প্রকার আসনে মনকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া রাখাতে আসনসাধনের ব্যাঘাত হয়। কারণ আসনকে এইরূপ করিতে হইবে, যেন উহা শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত। শরীরের সহিত উহা ভিন্ন নয়, সর্ব্বদা এই ভাবটি মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমি ছাড়া অপর বস্তু আছে, এরূপ মনে থাকিলে মনঃসংযমে ব্যাঘাত হয়। আসনের সঙ্গে ধনমর্য্যাদা, বা গরিবী, এ সকলের যোগ চিত্তবিক্ষেপের কারণ। ধনবানের আসনে বসিলে গর্ব্বিত ভাবে কথা আসিবেই। ধনবানের আসন, গরিবের আসন, এ সকল দূর করিয়া দিয়া চিত্ত স্থির করা উচিত। আপন আপন আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে মনের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইবে। আসন এত আপনার হওয়া চাই যে, উহাতে ভাবান্তর বা চিত্তবিকার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

৩য়, শরীর।—উপবেশনসম্বন্ধে শরীরের স্থিরতা আবশ্যক। সাধন আরম্ভে এ নিয়মে বিশেষ আবদ্ধ থাকা উচিত। বারম্বার হস্তচালনাদি, নানা প্রকার ভাবভঙ্গী, চক্ষুরুন্মীলন, নিমীলন, দিক্ পরিবর্ত্তন অনেকে সামান্য মনে করেন; কিন্তু স্থৈর্য্যসাধনে এ সকল একান্ত পরিহার্য্য। আত্মসংযম শরীরসংযমের সঙ্গে সম্বদ্ধ। শরীর স্থির হইলে মহৎ

বিষয়েও মন স্থির হয়। ক্ষুদ্রে মন স্থির না হইলে, মহৎ বিষয়ে মন স্থির হয় না। শরীর এরূপে রাখার বিধি নাই, যাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ, রোগ বা ক্লেশ হয়। আসনের উপরে এমত ভাবে উপবেশন করিতে হইবে, এতটুকু আরামে থাকিবে যে, সাধনে ব্যাঘাত না হয়। শরীর লইয়া ক্রীড়া করা—যেমন উঠা বসা, শরীরের ভাবভঙ্গী পরিবর্ত্তন করা, ইহাতে মন স্থির হয় না। বাহ্যে স্থিরতা হইলে সর্ব্ববিষয়ে স্থিরতা হয়। পাঁচ মিনিট সাধন করিতে হইলেও এই নিয়ম অনুসরণ কর্ত্তব্য। আরাধনা ধ্যান সকলই এই ভাবে সাধন করিতে হইবে। একটি সাধন যতক্ষণ শেষ না হয়, সেই ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে। একবার হাত পা নাড়িলে পরিত্রাণ হয় না তাহা নহে, কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার জন্য ইহা আবশ্যক।

এই ত্রিবিধ স্থিরতা দিন দিন মনের স্থিরতার পক্ষে সহায় হইবে। ইন্দ্রিয়সংযমে বাহ্যিক ব্যাঘাত ব্যাধাত নহে, কিন্তু ইহাতে শরীর মনের স্থৈর্য্য উপস্থিত হয় না। ত্রিবিধ স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলে গূঢ় ভাবে মনের স্থিরতা হয়।

৪র্থ, মনের স্থিরতা।—বিরুদ্ধ চিন্তা 'দূর হ' বলিয়া দূর করিতে হইবে, ইহাই সে রোগের প্রতীকার। চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, এজন্ত শম, দম, নিয়ম অভ্যাস করা উচিত। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা, এইরূপ করিয়া চিন্তা অভ্যাস করিবে। কোন পুস্তক পড়িতে ভাল লাগে না, অন্ততঃ এক কোয়াটর তাহাতে মনকে বদ্ধ রাখিতে হইবে। মন যদি অন্ত সময়ে স্বেচ্ছাচারী হয়, উপাসনার সময় তাহার বিষময় ফল দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকচিন্তা, ভক্তি, বিনয়, জীবনের কার্য্য, পরিবারের হিত, কিয়ৎকাল স্থির মনে অনুসরণ করিবে। চিত্তসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার, কার্য্যে কথায় ভাবে যতদূর সম্ভব

পরিত্যাজ্য, মনকে এ সকল বিষয়ে শাসন করা উচিত। গানসম্বন্ধেও স্বেচ্ছাচার হইয়া থাকে। যদি এরূপ গানে উপকার হয়, তথাপি ত্যাজ্য। মনের উপর এমন জয় লাভ করা উচিত যে, একই গানে সাত বৎসর ভাবের উদয় হইবে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাধক বলিয়া এরূপ হয় না। যদি বল এরূপ স্বেচ্ছার অনুসরণ করিলে ফল হয়, ইহার প্রমাণ আছে। কেহ একথা অস্বীকার করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ফলাফলবাদী সাধকের পক্ষে এ কথা খাটে, উচ্চ শ্রেণীর সাধকের পক্ষে এ কথা খাটে না। আপাততঃ ফল পাইলাম, উচ্চ হইলাম, আশু হিত লাভ হইল, এ কথা যাহারা বলে, তাহারা উপাসনার প্রতি মর্য্যাদা করে না, পরিবর্ত্তনের মর্য্যাদা করে। স্বেচ্ছাচারনিবারক স্থৈর্য্যতত্ত্ব, তাহাতে ইহার বিপরীত বিধি। উপকার হইলেও পরি-বর্ত্তন পরিহার্য্য। এ স্থলে মনে রাখা উচিত যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল পুস্তক, সকল শ্লোক উপযোগী হয় না, সেখানে আত্মার উন্নতির জন্য তত্তদ্ভাবের গ্রন্থাদি অবলম্বন আবশ্যক; কিন্তু ইহাতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে, পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পরিবর্ত্তন যতদূর আবশ্যক, ততদূর করিতে হইবে, ভাল লাগে না বলিয়া পরিবর্ত্তন দূষণীয়। যত্নে স্বেচ্ছাচারকে আয়ত্ত করা উচিত। চিন্তা, সাধনপ্রণালী, পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তন, ভাবোদয় সম্বন্ধে যখন যাহা ভাল লাগে, তাহা অনুসরণ করিলাম, ইহা পরিহার্য্য। আরাধনা, ধ্যান, প্রণাম, একই প্রণালীতে করিতে হইবে। সাধনের অঙ্গে যে সকল শ্লোক পাঠ করিবে, তাহাও নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা এবং শ্লোক, সেই সেই বিভাগে অপরিবর্ত্তনীয়। এক কথা উচ্চারণে প্রেম হইবে। সেই শব্দ চিন্তার মূলে থাকিলে ভাবোদয় হইবে।

যে চারিটি বিষয় বলা হইল, সেই সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ

করিয়া, একতা, স্থিরতা, সমতা অবলম্বন আবশ্যক। আসন ও স্থান মন ভাবিবে না, শরীর মনের সঙ্গে এক হইয়া যাইবে। এক প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই, একদিন একজন যে পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন, সেই স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি উচ্চতর স্থানে যাইতে পারেন; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিলে কখন সেরূপ হয় না। এক পথ হইলে কতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, বুঝিতে পারা যায়। এমনি এক বিষয়ের সাধন করিলে সাধনের গভীরতা হইতেছে কি না, বুঝিতে পারা যায়। যেমন এক "সত্যং" সাধন করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলে উন্নতি বুঝিতে পারা যায়, অন্যথা উন্নতি পরিমাপক যন্ত্রের অভাব হয়। এক সময়ে নানা সাধনে গেলে উন্নতি জানা যায় না। সুতরাং বলিতেছি, এক প্রণালীতে চেষ্টা করিলে প্রচুর ফললাভ হয়। এরূপে চারিটিকে একটি করিয়া ঈশ্বর স্থির আত্মাকে গম্যস্থানে লইয়া যান।

আত্মসংযম ব্যায়ামের ন্যায়। ব্যায়ামে যেমন বলবৃদ্ধি হয়, অভ্যাসে তেমনি বলবৃদ্ধি হয়। যদি সামান্য সামান্য কার্য্যেও দৃঢ়তা অবলম্বন করি, তাহাতে অবিধি নাই। এক পুস্তক, এক চিন্তা, এক পথ, এক লেখা, এমন কি স্থচে সূত্র দেওয়া প্রশংসনীয় প্রণালী। স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিবার জন্য কার্য্যে পর্য্যন্ত নিয়ম করিতে হইবে। অমুক বিষয় ভাল লাগিল না বলিয়া ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া স্বেচ্ছাচার; সাধনের পথে এরূপ স্বেচ্ছাচার থাকিতে দেওয়া অন্যায়। ভাল লাগুক আর না লাগুক, কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে অবলম্বন করিতেই হইবে।

সমতা-সাধন।

কলুটোলা, ২০শে ও ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
২রা ও ৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

মনের স্থিরতা সম্পাদন জন্য আরও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। সমাহিত মন হওয়া, সমচিত্ত হওয়া প্রয়োজন। একইরূপ মন থাকিবে, শরীর একাবস্থায় থাকিবে, এরূপ সাধন চাই। মনকে স্থির করা বড় কঠিন। অবস্থাভেদে মনের ভিন্নতা হয়, সাধনভেদে মনের অবস্থা ভিন্ন হয়। সংসারে ধর্ম্মপথে মনের অবস্থা ভিন্ন। সৎকার্য্যে উপাসনা প্রার্থনাদিতে মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। সমাহিত মন, সম চিত্ত পরম সম্পত্তি, উহা অর্জ্জন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মের অবস্থা অত্যন্ত শান্ত এবং সর্ব্বদা সমান। উপাসকের সেই আদর্শ রাখিতে হইবে। অবস্থাবিশেষ মনকে কখন চঞ্চল করিতে না পারে, এজন্য যত্ন করিতে হইবে। অবস্থাকে জয় করিয়া স্থির হইতে হইবে। সুখে উল্লাস, দুঃখে অধীর হইবে না। আপাততঃ সাধনের প্রথমে তৎসম্বন্ধে আতিশয্য পরিত্যাজ্য। সংসারের কাজে, স্তুতি, নিন্দা, প্রশংসা, অপ্রশংসা, সম্পদ্‌, বিপদ্‌ সকলেতেই প্রসন্ন থাকিতে হইবে, কখন অবসন্ন হইবে না। সর্ব্বদা সমভাব অবলম্বন করিয়া দুইয়ের মধ্যস্থলে থাকা উচিত। সমচিত্ত না হইলে, না উপাসনা হয়, না সংসার হয়।

উপাসনায় সর্ব্বদা এক প্রণালী থাকিবে। যে ব্যক্তির তৎসম্বন্ধে স্থিরতা নাই, সে সময়ে সময়ে উপাসনায় উন্মত্ত, সময়ে সময়ে শুষ্কহৃদয় হয়। এরূপ এক সময়ে উন্মত্ততা, এক সময়ে শুষ্কতা নিজ ইচ্ছার স্বেচ্ছাচারিতায় হয়। যে ব্যক্তি এক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে,

তাহার সাধন ও ভক্তি এক অবস্থায় থাকিবে, কোন প্রতিকূল কারণে বিনষ্ট হইবে না। একটি পথ ধরিয়া তাহা ছাড়া নিষিদ্ধ, এ সম্বন্ধে নিয়ম থাকিবে। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ নিয়ম হইতে পারে, ইহাতে প্রণালীর দৃঢ়তা বিনষ্ট হয় না। দৃঢ় প্রণালীতে আরাধনা, স্তব, প্রার্থনা, ধ্যান, সঙ্গীতাদি করিলে সমতা হয়। তিনি সৌভাগ্যবান্, যিনি বিশেষ দিনে বিশেষ এবং প্রতিদিন সমান সুখ প্রাপ্ত হন।

সাধক সর্ব্বদা মনকে আয়ত্তে রাখিবেন। অশ্ব যদি সমান গতিতে যায়, তবে অধিক দূরে যাইতে পারে। সাধন দ্বারা মন-অশ্বকে এক গতিতে রাখা উচিত। সাধনরজ্জু দ্বারা মনকে সংযত করিলে উহা একই ভাবে থাকে। সময়বিশেষে, অবস্থাবিশেষে ভিন্নতা হইবে, কিন্তু দৈনিক সাধনকে প্রমত্ত অবস্থাতে রাখা চাই। দর্শন, প্রেম, আশা বিশ্বাস, উল্লাস, মগ্নভাব প্রতিদিন স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। সমচিত্ত হইয়া থাকিলে বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, সমস্ত সমাবস্থায় থাকে। প্রকৃত সাধন থাকিলে এইরূপ হয়।

স্বেচ্ছাচারী হইয়া একদিন অনেক গান করিলে, আলোচনা করিলে, সাধন করিলে, আর একদিন অবসন্ন হইয়া পড়িলে, ইহা চেষ্টা দ্বারা পরিহার্য্য। প্রতিদিন ভাবের সহিত একটি বা দুইটি সঙ্গীত যথেষ্ট। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপ। যিনি ঈদৃশ উপায়ে সাম্যাবস্থা লাভ করেন, তিনি সিদ্ধমনোরথ হন।

সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া অনেক গান, অনেক পুস্তক পাঠ ইত্যাদি অবলম্বন করিলে, ক্রমে উহা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রথম হইতে আতিশয্য দোষ পরিহার করা উচিত। দুই পাচ দিন সংযমের সময়ের মধ্যে দেখিতে হইবে, উপাসনার গতি এক প্রকার নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছে কি না? স্থায়ী ভাব অধিকৃত রহিয়াছে

কি না? সজনে নির্জ্জনে গাম্ভীর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা? যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা স্বভাবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে কিনা? ফলতঃ যতদিন মন স্থির থাকিবে, ততদিন সব সমান থাকিবে। সুতরাং সাধন দ্বারা সমুদায় স্থির করিয়া লইতে হইবে।

২য় উপায়।—জীবন কখন শীতল হয়, কখন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়, কখন সংসারের শীতল বায়ু লাগিয়া মৃতপ্রায় হয়। জীবনে কেবলই হ্রাস বৃদ্ধি। এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে উত্তাপ এবং শৈত্য স্বাভাবিক হয়। বিধি এই;—ঈশ্বরের নামসংক্রান্ত কোন প্রকারের বাক্য উচ্চারণ বা হৃদয়ে আলোচনা করিবে। উচ্চ নীচ ভাব নিবারণের জন্য এটি বিশেষ উপায়। কারণ, নামের মধ্যে উত্তাপ আছে। দিনের মধ্যে পাঁচবার বা দশবার মনে মনে বাক্য উচ্চারণ করিলে হৃদয়ে গভীর ভাব উপস্থিত হয়। যেমন "সদ্গুরু ভরসা" "দয়াময় সহায়" "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" "ঈশ্বর ভরসা"। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন প্রকার শব্দ মনে আলোচনা করিলে, সেই শব্দের মধ্যে এমন উত্তাপের সামগ্রী আছে, যাহাতে শীতলতা বারণ হয়। নামসংস্পর্শে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। জীবনপথে উত্তাপের সামগ্রী সহ সংস্পর্শ হওয়া উচিত। কার্য্যের মধ্যেও ইহা সম্ভব। ভিতরে প্রাণের মধ্যে যেখানে বসিয়া আছি, সেখানে এইরূপ দুই একটি শব্দ মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত হইলে মন স্থির থাকে এবং ভিতরে গভীর ভাব রক্ষা পায়। ইহাতে মনের সমভাব হয়, একেবারে শীতল হইতে দেয় না। ইহাতে আমোদের মধ্যেও গাম্ভীর্য্য আনয়ন করে। সুতরাং এইরূপে মনকে সমাহিত এবং সংযত করা উচিত।

যে বিধির উল্লেখ হইল, অনেক সাধক ইহাকে উপকারের হেতু বলিয়া জানিয়াছেন। উপাসনান্তে যে মনটুকু ফাঁক থাকে, তাহাতে

মন অন্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। তন্নিবারণার্থ মনকে উত্তপ্ত করিবার জন্য ঐগুলিকে মন্ত্ররূপ করিয়া লইবে।

৩য়, নির্জ্জনসাধন।—নির্জ্জনসাধনসম্বন্ধে নিয়ম রাখা উচিত। নির্জ্জন ভাল না লাগিলে সজনে যাওয়া, সজন ভাল না লাগিলে নির্জ্জনে যাওয়া, ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা হয়, সৎসঙ্গের প্রতি বিরক্তি উপস্থিত হয়। নির্জ্জনে এক প্রকার, সজনে অন্য প্রকার ভাব স্থির রাখা উচিত। যে অবস্থায় হউক না কেন, মন সাম্যাবস্থায় থাকিবে, ইহা আবশ্যক। নির্জ্জন সজন, ধ্যান আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ্ বিপদ্, একাকী বা সকলের সঙ্গে, সমুদায় অবস্থাতে একটি ভাব স্থির থাকিবে, এইরূপ সাধন আবশ্যক।

স্থান, আসন, শরীর ও মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মনকে একদিকে আনয়ন কর। যে সকল উপকরণ ছাড়িয়া দিতে হয়, ছাড়িয়া দাও। সকল বিষয়ে আতিশয্য পরিত্যাগ কর। স্থির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সাধন করিতে থাক। যে প্রণালী ধরিবে, সেই প্রণালী স্থির রাখিতে হইবে। অবস্থার দাস হইলে চলিবে না। উৎসাহ সহকারে সংযত মনে উপাসনা করিবে। মনের স্থিরতা সমস্ত দিন রাখা সহজ নহে। মন এরূপ সমাহিত হওয়া কঠিন। অতএব মন যাহাতে সমস্ত দিন সমাহিত থাকে, এজন্য যত্ন আবশ্যক। পূর্ব্বজীবনের ঘটনার দ্বারা সমস্ত স্থির করিয়া রাখা উচিত। জীবন এক প্রকারে চলে, এজন্য নিয়ম অবলম্বনীয়। আহার ব্যবহার বস্ত্র এসকল একপ্রকার অবস্থায় যাহাতে থাকে, তাহা করা প্রয়োজন। এ সকলে স্থিরতা না হইলে ধর্ম্মসাধনে অনুকূল অবস্থা ঘটে না। অবস্থাকে জয় করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে সাধন করিবে।

চিত্তের স্থিরতা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ম, অন্য

প্রকারের চিন্তা বিদায় করিয়া দেওয়া; ২য়, ইন্দ্রিয়াদিদমনে শান্ত ভাব এবং দান্ত ভাব। অন্য চিন্তা বিদায় করিয়া দিয়া এক চিন্তাতে মন নিয়োগ করা যেমন কর্ত্তব্য, প্রবল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার প্রতিবিধান করাও তেমনি কর্ত্তব্য। কামক্রোধাদি রিপু প্রলোভনে উত্তেজিত হয়, প্রলোভন বিনা নিদ্রিত থাকে, প্রলোভনে জাগ্রৎ হয়। বারংবার উত্তেজিত হইয়া পরিশেষে এমনি হয় যে, প্রলোভন উপস্থিত না হইলেও চিত্ত দ্বারা, কল্পনা দ্বারা উহারা উত্তেজিত হয়। দুর্ব্বলদিগের প্রতিবিধি—প্রলোভনের নিকট না যাওয়া। প্রলোভন নিকটে রাখিয়া সাধন মহাবীরের কার্য্য। মন দুর্ব্বল জানিলে জ্ঞাতসারে উত্তেজনার নিকট যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, জয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র। এ কথার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিবে না। জীবনকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখা উচিত।

বাহ্যিক কারণে রিপুর উত্তেজনা হয়। উহা সমুদায়ে দুই শ্রেণী। ১ম, নিজের পরিবার, চলিত ভাষায় সংসার। স্ত্রী পুত্র সাংসারিক ভাব উত্তেজিত করে এবং সেই কারণে মন অস্থির হয়। ২য়, অন্যান্য লোক, জগৎ, সাধারণ জনসমাজ। একটী গৃহ সম্বন্ধীয়, অপরটী সাধারণ; একটি পারিবারিক, অপরটি সামাজিক। এই দ্বিবিধ কারণে মন প্রলুব্ধ হয়। যাহার সংসার নাই, তাহার তৎসম্বন্ধে বিরক্ত হইবার কারণ নাই; যাহার সংসার আছে, তাহার বিরক্ত হইবার কারণ আছে। এই কারণ হইতে দূরে থাকা সমুচিত। জনসমাজের সঙ্গে অল্প সংস্রব রাখিয়া প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এই দুই প্রকারের উত্তেজনা জানিয়া শুনিয়া রাখিবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিবারের ভিতরে থাকা, জনসমাজের মধ্যে থাকা। কিন্তু যেখানে নিশ্চিত মরণ সম্মুখে, সেখানে সাধনের জন্য সাবধান হইতে হইবে। যে যে কার্য্যে যোগ-

ভঙ্গ, ধ্যানভঙ্গ, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য হয়, যতদূর সম্ভব, যতদূর সঙ্গত, তাহা হইতে দূরে থাকা উচিত। পারিবারিক চিন্তায় মন চঞ্চল করে। যাঁহারা ব্রত-পরায়ণ হইবেন, তাঁহাদিগের তৎপূর্ব্বে সংসারের এমন একটি বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন যে, তজ্জন্য মন অস্থির হইয়া সাধন বন্ধ না হয়। যে যে কারণে মন অস্থির হয়, তাহা বন্ধ করিতে হইবে। বিশেষ আয়োজন, বিশেষ প্রতিবিধান না করিলে যোগভঙ্গ হইবে। নিশ্চিন্ত যতদূর হইতে পারা যায়, হওয়া উচিত। যাঁহারা একটি বিষয় সাধন করেন, তাঁহাদের অন্ততঃ তৎকালের জন্য সমুদায় স্থির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তোমাদের সংসারের এমন একটি বন্দোবস্ত চাই, যাহাতে নিশ্চিত হইয়া সাধন করিতে পার। চিন্তার দ্বার খুলিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে না। কিছুদিনের জন্য স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতে হইলে, যাহারা অন্ন বস্ত্র সম্বন্ধে অধীন, তাহাদিগের গতি করিয়া যাইতে হইবে। কিছুদিনের জন্য বিদেশ যাইতে হইলে লোকে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যায়, তোমাদের সেইরূপ অবস্থা। বিদেশ যাওয়ার ন্যায় সাধনের দেশে যাইবে, সেখানে থাকিয়া এখানকার সংবাদ লইতে পারিবে না। সমুদায় বিষযে এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা উচিত যে, যাত্রার সময়ে সাক্ষী করিয়া বলিতে পার, নিশ্চিন্ত হইবার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করা হইল। জানিয়া শুনিয়া যেন কোন কণ্টক না রাখা হয়। প্রত্যেক সাধকের প্রতি এই অনুজ্ঞা। নির্ব্বিঘ্ন সাধনে অবিলম্বে অনেক উন্নতি। বিঘ্ন বাধা স্থলে উপাসনা সাধন করিবে। অক্ষমতা সত্ত্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করা কষ্ট পাওয়া। সাধন আরম্ভের পূর্ব্বে এমন নিশ্চিতরূপে সংসার ও পরিবার সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলা করা উচিত যে, সাধনে বিঘ্ন জন্মিতে না পারে। অবশ্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা গণনীয় নহে। ফলতঃ এমন করিয়া যাইবে,

যাহাতে চিন্তার ডোর ছিন্ন হয়। নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির কারণ ছেদন করিয়া যাইবে। যে দিনের জন্য যাইবে, সেই দিন কাটিয়া যাইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্ন। নির্ব্বিঘ্ন না করিলে, বিঘ্ন কলঙ্ক কল্পিত ধর্ম্ম বা সংসারে পতন সম্ভাবনা। সামাজিক বিঘ্নের বিষয় পরে বলা যাইবে।

১। যে যে কারণে সংসারে অবিশুদ্ধ চিন্তা, যোগভঙ্গ, সাধন তপস্যার বিঘ্ন আইসে, সে সকল নিবারণ করিয়া নিশ্চিন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে।

২। পরিবারদিগের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবে। যাহাতে প্রাণ-নাশ না হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা গুরু কর্ত্তব্য। ঔষধ, অন্ন, বস্ত্র এ সকলের জন্য চিরদায়ী। এ সম্বন্ধের অপরাধের মোচন নাই।

রিপুবলাবল-নির্ণয়।

কলুটোলা, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

বিপদ্‌কে লঘু মনে করা উচিত নয়। গুরু বিপদ্ জানিলে জয় করা সহজ হয়, সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয় দমন না হইলে যোগের ব্যাঘাত হয়, ভক্তির ব্যাঘাত হয়। সমাহিতচিত্ত এবং দান্ত হওয়া সকলশাস্ত্র-সম্মত। শান্ত সমাহিত না হইলে কখন শান্তি হয় না। ইন্দ্রিয় জয় করা সহজ মনে করিয়া বিপদ্‌কে লঘু মনে করা উচিত নয়। সত্যকে সাক্ষী করিয়া যাহা ঠিক যেমন, তাহাকে ঠিক সেই প্রকারে দেখা উচিত। ইন্দ্রিয়দমন সহজ, কঠিন, দুইই। যে সকল ইন্দ্রিয় প্রবল নয়, সে সকলকে সহজে দমন করা স্বভাবসঙ্গত। অভ্যাস, স্বভাব, রীতি,

অবস্থা, শিক্ষা, রুচি এইগুলি কোন কোন রিপুদমন সম্বন্ধে অনুকূল হয়। যেখানে এরূপ অনুকূলতা আছে, সেখানে দমন সহজ এবং সম্ভব। যাহার হৃদয় কোমল, ক্ষমাশীল, দয়ার্দ্র, পরোপকারে ইচ্ছুক, তাহার রাগ করা সম্ভব নয়। যদি রাগ হয়, শীঘ্র রাগ বিদায় করা সম্ভব। যাহার সংসারে বিলাস নাই, দীনভাব অভ্যাস দ্বারা সুখাসক্তি কম হইয়াছে, তাহাতে লোভের আতিশয্য সম্ভবে না। এইরূপ কামাদি সমুদায় রিপুর জয় স্থলবিশেষে, অবস্থাবিশেষে, লোকবিশেষে সহজ। যে হৃদয়ে যে ব্যক্তিতে শিক্ষা রুচি অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বদ্ধমূল হইয়াছে, সে হৃদয়ে সে ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়জয় কঠিন, অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব। সুতরাং যে বিপদ যত বড়, কম করা নয়, বৃদ্ধি করা নয়, অত্যুক্তিতে গ্রহণ করা নয়, স্বরূপতঃ গ্রহণ করা উচিত। ইন্দ্রিয় এবং আসক্তির বিষয়-গুলিকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে। দশটি আসক্তিকে জয় করিতে পার, একটি হয়তো চিরজীবন অপরাজিত থাকিবে। একটিকে হয়তো বৃদ্ধকালে জয় করিতে পার, যৌবনে নহে; এক অবস্থায় পার, অন্য অবস্থায় নহে। স্বভাব ও অভ্যাস দ্বারা আসক্তি প্রবল হয়। মুক্ত হওয়া—স্বভাবকে অভ্যাসকে জয় করা, দমন করা। আসক্তি দমন সহজ নহে। উত্তেজনায় যোগভঙ্গ করিবে না, কামাদি রিপু প্রবল হইয়া উপাসনার ব্যাঘাত করিবে না, এরূপ দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত। একজনের চল্লিশ বা সত্তর বৎসরের পরও পতনের সম্ভাবনা। রিপুগণের বাহ্যিক অত্যাচার দমন সম্ভব, কিন্তু হৃদয় হইতে দূর করা সহজ নহে। বাহ্যে নিয়মিত, হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রিপু দ্বারা পতনের সম্ভাবনা। রিপু সংযত হইলেও পুনরায় দেখা দিয়া থাকে। অনেক বয়স জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাটাইলেও প্রলোভনে পড়িয়া পতন সম্ভব।

রাগ—ধর্ম্মরাজ্যেও রাগের অনেক কারণ আছে। এখানে কাম-রিপুর উত্তেজনা অপেক্ষায় ক্রোধ রিপুর উত্তেজনা বেশি। বাহ্যিক কার্য্যে না থাকিলেও মনে ক্রোধ আইসে। কথা বলা সংযত করিলে, তথাপি সংযত ক্রোধের নারকীয় উত্তাপ অনুভূত হইবে। কার্য্যে অত্যাচার করিলে না, কিন্তু মনে করা হইল। প্রেমসাধন দ্বারা রাগ নির্জ্জিত হইলেও আবার পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। একজন বৈরাগী হইলেও রাগী হইতে দেখা যায়। ভিক্ষা করিতে আসিয়া ভিক্ষা না পাইলে রাগিয়া যায়। স্বার্থপরতা এবং আপনার বলে ও জ্ঞানে আমিত্বদর্শন—ধর্ম্মবিধিপরায়ণতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা রোধ করিলেও—টানিবে। প্রেম হইলেও উহারা ফিরিয়া আইসে। অহঙ্কার প্রায় ছাড়ে না, ভিন্ন ভিন্ন আকারে সঙ্গে থাকে। অহঙ্কার অভিমান খর্ব্ব করিলেও—বিনয়ী শান্ত হইলেও—আবার আইসে। কার মনে কোন্ রিপু্ প্রবল তিনি জানেন, এ বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন নাই। সত্যের প্রদীপ লইয়া লজ্জা না করিয়া রিপুর মুখে ধরিবে, চিরজীবন বিশ্বাস করিয়া থাকিবে এইটি প্রবল। কাম, ক্রোধ, হিংসা, নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির যিটি অত্যন্ত প্রবল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ জানিতে হইবে। বরং জীবন যাইতে পারে, এ পাপ নাও যাইতে পারে। অত্যন্ত সাধন ভজনে রিপুর মাথা হেঁট হইয়া থাকে, একেবারে সংহার কঠিন। অসম্ভব জানিলে প্রায় নিরাশা হয়। নিরাশা হয় বলিয়া সত্যকে অসত্য বলিতে পার না। আমি আছি যেমন সত্য, আমার রিপু্ আছে তেমনি সত্য। যে রিপুতে মনকে বিক্ষিপ্ত করে, স্থির হইতে দেয় না, যাহাকে এ জীবনে দূর করা সম্ভব নয়, সে রিপুসম্বন্ধে এমন কঠিন সাধন করিবে যে, সে মাথা তুলিতে না পারে। যাহা সহজে মনকে ধ্যানচ্যুত করিতে

পারে, মলিন করিতে পারে, দশ দিনের অর্জ্জিত বল আধ ঘণ্টার মধ্যে টানিয়া লইতে পারে, সে রিপু অপেক্ষা প্রবল সাধনের প্রয়োজন। রিপুকে কখন বন্ধু বলিও না, যে রিপু যেমন, সে রিপু চিরদিন তেমনই। সর্ব্বদা রিপু অপেক্ষা প্রবল সাধন গ্রহণ করিবে। এমন সাধন অবলম্বন করিবে, যাহা অব্যর্থসন্ধান। সেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়া উহাকে বিনাশ করিবে। যেমন রিপু প্রবল, তেমনি সাধন প্রবল চাই। জয় করিবই করিব, এই বিশ্বাস থাকিলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ হইবে। কোন্ রিপু প্রবল, আত্মানুসন্ধান দ্বারা জান। অনেক যোগী, অনেক ভক্তের ইন্দ্রিয়গত দোষ ছিল জানিয়া, ক্ষুদ্র জানিয়াও এমন সাধন লইবে, যাহা রিপু অপেক্ষা প্রবল। রিপুজয় হইবে, এই বিশ্বাসে সাধনের পথে প্রবৃত্ত হইবে। সাধনপ্রভাবে রিপু বিষদন্তভগ্ন সর্পের ন্যায় থাকিবে, কখন বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না।

মনকে স্থির করিবার সাধনসম্বন্ধে দুই প্রকার বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে; ১ম, স্ত্রী পরিবার, ২য়, সাধারণ বা সামাজিক। পরিবার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে দায়িত্ব। তৎসম্বন্ধে চিন্তা যোগভক্তির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়। সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া যোগভক্তির পথে যাওয়া উচিত; কেন না, বন্দোবস্ত করিয়া গেলে কোন প্রকার উদ্বেগ অস্থিরতা উপস্থিত হইবে না। লোকে কোন তীর্থে যাইবার সময় যেমন পরিবারের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তীর্থে গমন করে, এখানে তদ্রূপ। সাধক বিবাহ করিলে, স্ত্রী পুত্রের ভার থাকিলে, তজ্জন্য চিরদিন ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সেই ঈশ্বর আবার ধর্ম্মসাধনের জন্য নিয়োগ করিলে, উভয়বিধ কর্ত্তব্যপালন সাধনের পূর্ব্বে প্রয়োজন। যিনি আপনি দুই বিধি দেন, তিনিই শরণাগত সাধককে উভয় দিক রক্ষার যোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

জনসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা উচিত। গিরিগহ্বরে, দূরস্থ অরণ্যে লুক্কায়িত হইয়া দিন যাপন করিতে হইবে এরূপ নহে। মনুষ্যসমাজে থাকিতে গেলে, সময়ে সময়ে নিজ ধর্ম্ম এবং অন্য ধর্ম্মের বিষয়ের সঙ্গে মিলিতে হইবে, কার্য্যের অনুরোধে লোকসমাজে যাওয়া উচিত হইবে, নৌকা এবং গাড়ী ইত্যাদিতে অন্য লোকের সঙ্গে একত্র হইতে হইবে। এই তো গেল প্রথম। দ্বিতীয়—কর্ত্তব্যানুরোধে। দেশের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান উচিত। সেই সকল কার্য্য করিতে গেলে নিজ ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়া যেমন উচিত, তেমনি অপর ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়া আবশ্যক। এখানে অমুক সাধু, অমুক অসাধু ইহা বলিয়া বিচ্ছিন্ন থাকিবার উপায় নাই। কেন না, কখন ঈশ্বরের কি আদেশ হইবে, কে জানে? জনসমাজে উভয় সংসর্গ অনিবার্য্য। যদি বল, সাধনে সাধুসঙ্গেরই প্রয়োজন, অসাধু-সংসর্গে প্রয়োজন নাই, একথা বলিতে পার না; কেন না, যদি ঈশ্বর আদেশ করেন, অসাধুর নিকটও গমন করিতে হইবে। তোমার ইচ্ছামত সংসারে অবস্থিতি হইবে, এরূপ বলিতে পার না। যোগী বলিয়া তুমি পাপী বিষয়ী ইত্যাদির সঙ্গে থাকিবে না, এরূপ মনে করা উচিত নয়। অবস্থা অনুকূল ঘটনা বশতঃ হইবে।

পরিবারের সম্বন্ধে যেমন, তেমনি জনসমাজের সকলের সঙ্গে নিয়ম করা উচিত। কি কি কাজ করিতে হইবে, অগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। বিষয়ীর সঙ্গে দেখা হইলে মন যদি অস্থির হয়, সাধন হইবে না। কিরূপে কথা কহিলে উপাসনার ব্যাঘাত হয় না, স্থির করা উচিত। ধ্যানের পর হয় তো একজন অধার্ম্মিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে। অগ্রে কথা ও ব্যবহার স্থির না থাকিলে, মনের ভাল ভাব বিনষ্ট হইতে পারে। বিষয়-কার্য্য করিতে হইলে বিষয়ীরা

ধর্ম্মের প্রতি অবমাননাসূচক কথা বলিতে পারে, রাগ ও অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে। কত ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত, জানা আবশ্যক। পরিশ্রম করিব না, পার্থিব কার্য্য করিব না, এ অসম্ভব আশা। মন স্থির করিয়া নিয়মে বাঁধা উচিত। উপাসনা যোগ ভক্তি এ সকলের নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। যেখানে গেলে মন বিচলিত হইবে, সেখানে না যাওয়া ভাল। যদি যাইতে হয়, এই ভাবে যাইতে হইবে, এই ভাবে কথা কহিতে হইবে, অগ্রে স্থির রাখা উচিত। যে অবস্থায় মন ক্রমান্বয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, ধ্যান চিন্তায় মন সংগ্রহ করিতে কষ্ট হয়, সে অবস্থা হইতে দূরে থাকা শ্রেয়ঃ। দুই মাস ছয় মাস ছাড়িয়া যাওয়া আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কর্ত্তব্য বোধ হইলে তৎ-ক্ষণাৎ সাধনের জন্য পাহাড়ে নির্জ্জনে গিয়া মন ভাল করা উচিত। আত্মার বিনাশ হইবে জানিয়া সমাজে থাকিতে হইবে না। মন বিক্ষিপ্ত, উহার কোমলতা যাইবে, এ অবস্থায় থাকিবে না। যাহার শক্তি নাই, তাহার নির্জ্জনে যাওয়া উচিত। একেবারে চিরকাল নির্জ্জনে থাকিব ইহা দুরাশা, অবৈধ সঙ্কল্প, ঈশ্বরের বিধিসঙ্গত নয়। এ অভিলাষ ঈশ্বর পূর্ণ করেন না। চেষ্টা দ্বারা করিলেও ইহা হয় না। অবিষয়ীর সঙ্গে থাকিলেও বিষয়ের আলাপ হইবে; সেই আলোচনায় অস্থিরতা থাকিবে। ঘরের ভিতরেও ব্যাঘাত থাকিবে, বাহিরেও থাকিবে। বিধি স্থির থাকিবে। পার্থিব কাজ এতটা করিব, এইরূপে মনকে সংযত রাখিব। কথায় রাগ উদ্দীপন হইলে মুখ বন্ধ করিব, কি অন্য স্থানে চলিয়া যাইব। ধর্ম্মবিরোধস্থলে মনকে এইরূপে প্রতি-রোধ করিব বা চলিয়া যাইব। অন্যায় আমোদে সময় নষ্ট করিব না, মুখভঙ্গী দ্বারা অমত জানাইব। গতায়াতে নৌকাদিতে কোন লোকের সঙ্গে যোগ দিলেও মনকে এইরূপে সংযত রাখিব। এরূপ কর্ম্ম করিব

না, এরূপ আমোদ করিব না। এই এই আমোদ সঙ্গত, এই এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারি, এই এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারি না। আলোচনা তর্ক বিতর্কে মন বিচলিত বা উত্তেজিত হইলে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দশ মিনিট একাকী মন স্থির করিব, পরে দূরে থাকিব। প্রথমে বিধি স্থির করিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। পরিবার ও সমাজ সকল সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলে ভয়শূন্য হইবে। বিঘ্ন সর্ব্বত্রই আছে, ইহা জানিয়া চিরকালের জন্য পলায়ন করিতে যত্ন করিবে না। ইহাতে আর কিছু ফল নাই, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন।

যোগের গতি।

কলুটোলা, ২৮শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; ১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থিন্, ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ কি, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দুই পদার্থের সংযোগ; দুই পদার্থ বিভিন্ন, ক্রমে পরস্পরের নিকটস্থ হইয়া অবশেষে যোগ; সেই মিলনের অবস্থা যোগ। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই বিষয়ে ভিন্নতা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকৃতিগত ক্ষুদ্রতা, ইহা কোন প্রকারে যাইবে না। অনন্তের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা অনিবার্য্য। পরিমিত ভাবে যাহা আছে, তাহার বৃদ্ধি আছে, যেমন সদ্ভাবের বৃদ্ধি; কিন্তু ক্ষুদ্রতার সীমা ক্ষুদ্রতা। দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছাগত। ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিয়া আমরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হই; জ্ঞানে, ভাবে, কার্য্যে বিরোধী হই। বিরোধ বিনাশ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমে জ্ঞানাদিতে মিলন যোগ।

তুমি ইহার পথ জিজ্ঞাসা করিতে পার। যোগের পথ কোন্ দিকে? যোগের পথ অবলম্বন করিয়া অন্তরের দিকে গতি হয়।

বাহিরে জড়, মধ্যে জড় শরীর, ভিতরে চেতন। মধ্যের পথ সেতু। সেই সেতু দিয়া জড় হইতে মনে পৌছিতে পারা যায়। যোগীর গতি পৃথিবী ছাড়িয়া শরীরের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে। এইটি গমনের প্রথম পথ। দ্বিতীয় পথে বিপরীত গতি, মনের ভিতর দিয়া জগতে আশা। গমন প্রত্যাগমন, প্রবেশ এবং বাহির হওয়া, এ গতি অতিক্রম করিবে না। দেখিও যেন এ পথের ব্যতিক্রম না হয়। প্রথম বাহির হইতে ভিতরে গতি। যোগের রক্ত বাহির হইতে ভিতরে যাইবে। সেখানে পরিষ্কৃত হইলে বাহিরে আসিবে। যোগের গাঢ়তা গভীরতা ভিতরে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগনিবন্ধন ভিতরের দিকে। ভিতরে যাইতে বাহিরের জ্ঞান অবরোধ করে, স্বতরাং নয়ননিমীলন। ধ্যান নেত্র নিমীলন করিয়া, উপাসনা চক্ষু বন্ধ করিয়া, সমাধি অভ্যাস নয়ন মুদ্রিত করিয়া। ঈশ্বরে মগ্ন হইলে চক্ষু নিমীলিত হয়। সংযম ও চিত্তনিগ্রহের গূঢ় অর্থ এই ;—বাহিরের ব্যাপার হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া ভিতরে যাওয়া। বিষয়ী মনের ইচ্ছা বাহিরে থাকা, ভিতর হইতে বাহিরে আসা।

সংসারী মন সর্ব্বদা বাহিরে আইসে। বাহিরে আসিয়া নানা কার্য্য করে, মন নিয়ত বাহিরের বিষয়ে থাকে। যোগ আরম্ভ হইবা-মাত্র সংসারের দিকে অবস্থিত মুখ অন্তর্মুখ হয়। সংসারী ভিতরের দিকে পরাঙ্মুখ, যোগানুরাগী সাধক বাহিরের দিকে পরাঙ্মুখ। যোগা-রম্ভে চক্ষু নিমীলন করিয়া সমস্ত লইয়া ভিতরের দিকে গমন। পথিক পথে চলিতেছে। গম্যস্থান এ দিকে নহে জানিবামাত্র সে যেমন মুখ ফিরায়, তেমনি অজ্ঞানতা বশতঃ মনুষ্য ক্রমে সংসারের দিকে চলে, উপদেষ্টার কথা, জ্ঞানের কথা শুনিবামাত্র ভিতরের দিকে চাহিতে আরম্ভ করে। ধ্যানে চক্ষু নিমীলিত হয়, সমাধিতে চক্ষু নিমীলিত হয়, ভাবিতেই নয়ন নিমীলিত হয়। ইহাতে বিঘ্ন কম। ঈশ্বরের

সত্তা ভিতরে, বাহিরে বিষয় আক্রমণ করে। কোথায় বসিয়া যোগ করিবে? হৃদয়স্থানে, বাহিরে নহে। বাহিরের যাহা কিছু সমুদায় এক একটি করিয়া বিদায় করিতে হইবে।

চক্ষু নিমীলন করিলে হৃদয়ে ছিদ্র করিয়া মন-চোর বাহিরে আইসে, সে চুরি করিয়া সংসার সাধন করে। দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, চিন্তা করিতে লাগিলে, ঈশ্বর এবং পরকালের বিষয় ভাবিতে লাগিলে; ইতি মধ্যে পূর্ব্ব অভ্যাস এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে, মন ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিল। যে মানুষ সর্ব্বদা মাঠে বেড়ায়, সুপ্রশস্ত সুন্দর আকাশ সর্ব্বদা যাহার মস্তকের উপরে, দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতরে রাখিলে তাহার প্রাণ হাঁপ হাঁপ করে, সে দৌড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা পায়, বাহিরে আসিলে তৃপ্ত হয়। সেইরূপ সংসারের মাঠে অনেক স্থানে বিচরণ করিয়া হৃদয়ঘরে চক্ষু বন্ধ, নিশ্বাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে, মন চক্ষু খুলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, পলায়ন করিবে। যদি তাহাও না পারে, ভিতরে এদিক ওদিক দিয়া গর্ত্ত করিয়া বাহিরে আসিবে। বদ্ধ থাকিয়া সে বাহিরের বিষয় ভাবিতে লাগিল, ছিদ্র দিয়া বাহিরের জগতে আসিয়া পড়িল। সকলে ভাবিতেছে মন ভিতরে আছে, ওদিকে সে বাহিরে গিয়াছে। সংসার-ভাবনায় তাহার লালসা, সুতরাং তাহাকে শাসন করিতে হইবে। সমুদায় শাসন নিপীড়ন ত্যাগ করিয়া সে বাহিরে আসিতে চায়, এইজন্য ভিতরে রাখা কঠিন। মন অনেকক্ষণ ভিতরে থাকিতে পারে না, চিন্তাতে কল্পনাতে বিষয় ভাবে। সাধন ও অভ্যাস দ্বারা মনকে ভিতরে টানিয়া আন, সমুদায় ছিদ্র বন্ধ কর। এইরূপে ক্রমে শাসন দ্বারা বাধ্য করিয়া যাহাতে উহাকে ভিতরে রাখিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্ন যোগীর প্রথম কর্ত্তব্য। ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া কি, পরে

বলা যাইবে। ভিতরে যাইবার সময় একটি বিষয় বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। যেমন বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে চলিলে, সেখানেও তেমনি বস্তু আছে, সৎপদার্থ আছে। যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে যাইতে হইবে, সেখানে সব পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমুদায় শোণিত সমুদায় নিশ্বাস ভিতরে টান। প্রকৃত যোগশাস্ত্রের অর্থ সাধনের দ্বারা মনের গতিকে, জীবনের গতিকে ফিরাইয়া ভিতরে লইয়া যাওয়া, চক্ষু কর্ণাদির ভিতরে গতি। পথ ভিতরে, সেখানে ভিতরে শব্দ শুনিবে এই যোগশাস্ত্র। সেখানে মনোরূপ সরোবরে ব্রহ্মচন্দ্র দেখা যায়; অস্থির করে নিশ্বাসবায়ু, তাই তাহার প্রতিভা পড়ে না। বায়ু রুদ্ধ হইলে মন স্থির হইবে। এ শ্বাস বিষয়ের উচ্ছ্বাস। বিষয়ের উচ্ছ্বাস অবরোধ করিলে মন স্থির হয়, বাহিরের শ্বাসাবরোধ নহে। সিদ্ধি স্বাভাবিক পথে।

ভক্তির মূল।

কলুটোলা, ২৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক; ১১ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিধর্ম্মার্থী ব্রাহ্ম, ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ ভক্তির লক্ষণ কি। হৃদয়ের কোমল অনুরাগই ভক্তি। সত্যং শিবং সুন্দরং ভক্তির বীজ মন্ত্র। ঈশ্বরের স্বভাবের এই তিন ভাব ক্রমান্বয়ে আত্মাতে তিনটি অনুরূপ ভাব উত্তেজিত করে। জীবাত্মার সেই তিন ভাব দ্বারা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপ ধৃত হয়। যথা;—

শ্রদ্ধা দ্বারা সত্যম্;

প্রীতি দ্বারা শিবম্;

প্রগল্‌ভা বা উন্মত্ত ভক্তি দ্বারা সুন্দরং ধৃত হয়।

"তুমি আছ" শ্রদ্ধার সহিত, বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলি।
"তুমি ভাল" প্রেম কিম্বা প্রীতির সহিত এই কথা বলি।
"তুমি সুন্দর" ভক্তির সহিত এই কথা বলিয়া মত্ত হই।

যথার্থ ভক্তির সাধন শিবং এবং সুন্দরং এই দুইয়ের মধ্যে। ঈশ্বরের এই দুই স্বরূপ ভক্তিসাধনের পত্তনভূমি। এই দুই স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। প্রীতি কিম্বা প্রেম ভক্তির আদি অবস্থা, প্রমত্ততা ভক্তির পরিপক্কাবস্থা। প্রেম বীজ, মত্ততা ফল। প্রেম শৈশব, মত্ততা যৌবন। প্রেমেতে জন্ম, মত্ততাতে পরিত্রাণ। ইহার মধ্যে পুণ্য কৈ? ভক্তিশাস্ত্রে পুণ্য কৈ? যে ভূমিতে পাপ পুণ্য, সে ভূমিতে ভক্তি নাই। পাপ পুণ্যের অতীত যে স্থান, সে স্থানে ভক্তি। ভক্ত কি পাপ করিতে পারে? না। ভক্তির সঙ্গে পুণ্যের কোন সংস্রব আছে? না। ভক্তিই কি পুণ্য? তাহাও নহে। তবে ভক্ত কি পাপী হইতে পারে? না। তবে ভক্ত কি পুণ্যবান্? নিশ্চয়ই ইহা কেবল দ্বিরুক্তি। গূঢ়তত্ত্ব এই, নীতির ভূমি স্বতন্ত্র। পুণ্য স্থাপন হইলে তবে ভক্তি আরম্ভ হয়। যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ হইল। মনুষ্য সচ্চরিত্র না হইলে ভক্তির প্রশ্নই আসিতে পারে না। কিন্তু মানুষ দুই ভাবে সচ্চরিত্র হইতে পারে। এক কঠিন ভাব, আর এক কোমল কিম্বা মধুর ভাব। কোন কোন পুণ্যের অবস্থা কঠোর ব্রত পালন, কোন কোন পুণ্যের অবস্থা অতীব মধুর এবং কোমল। এই শেষোক্ত মধুর অবস্থা, যাহার আরম্ভেও আনন্দ, ইহাই ভক্তির অবস্থা। প্রকৃত ভক্তি কোথায় হয়? পুণ্যভূমির উপরে। ভক্তি এসে রং দেয়, সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। ছবি ঠিক হইতে পারে, অথচ তাহা বর্ণবিহীন শুষ্ক দৃশ্য, দেখিতে মনোহর নহে। সেই ছবিতে রং দাও, তাহা মনোহর হইয়া উঠিবে। সেইরূপ

এক ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইতে পারে, তাহার চিত্তভূমি নির্ম্মল হইতে পারে; অথচ তাহার মধ্যে ভক্তিসৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে। ভক্তি এসে সেই ভূমিকে অনুরঞ্জিত করে। ভক্তি হবে কি না, ইহার অর্থ কি ? স্থির হয়ে শুন। যাহার প্রকৃতি পুণ্যের অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাকে প্রেম, অনুরাগ, শান্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত করা, অথবা সুপ্রসন্ন করা ভক্তির কার্য্য। শুদ্ধ নীতিপরায়ণ হইলেই মনুষ্য ভক্ত হয় না। এক ব্যক্তি সত্য কথা কহিতে পারে, পরোপকার করিতে পারে, কর্ত্তব্যানুরোধে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে, সমুদায় পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারে, অথচ ভক্তিশূন্য হইতে পারে ; কিন্তু অসচ্চরিত্র ব্যক্তি কখন ভক্ত হইতে পারে না। এই কথা বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। ভয়ানক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ভক্ত হইয়াও মানুষ পাপ করিতে পারে! পাপ রয়েছে যেখানে, সেখানে ভক্তি আসিতে পারে না। মন পূর্ব্বেই পবিত্র হয়ে রয়েছে, ভক্তি এসে কেবল তাহাকে অনুরঞ্জিত করে। ভক্ত হইয়া মানুষ পাপ করিতে পারে যাহারা এ কথা বলে, ভক্তিশাস্ত্রের আদি উৎপত্তি কোথায়, তাহারা জানে না। শেষে পরিশুদ্ধ হইব, ইহা ভক্তের লক্ষ্য নহে। পাপ ছাড়, পুণ্য গ্রহণ কর, ইহাতেই যদি পরিত্রাণের শাস্ত্র সমাপ্ত হইত, তবে আর এই নূতন ভক্তিশাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না। যদি বল ভক্তিশাস্ত্র কেন আরম্ভ হইল ? ব্যাকুলতা ইহার মূল। ব্যাকুলতাসূত্রে ভক্তিশাস্ত্রের সূত্রপাত। ঈশ্বরে বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, পরোপকার করিতেছি, তথাপি হৃদয় হঠাৎ বলিল, “আমার ভাল লাগ্ছে না”। এই ব্যাকুলতা হইতেই সুন্দর নূতন ভক্তিশাস্ত্রের আরম্ভ হইল। বিশ্বাসী কঠোর সাধন করিয়া পুণ্যের অবস্থা লাভ করিতেছে, রীতি, নীতি, সুশৃঙ্খলামতে পারিবারিক এবং সামাজিক ধর্ম্ম পালন

করিতেছে, এ সব জ্ঞানচক্ষে দেখিলে সমুদায় পরিষ্কার এবং অবশ্য সন্তোষকর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু হৃদয় বলে চিৎকার করিয়া, "ভাল লাগে না"। তখন শাস্ত্রকার ঈশ্বরের আর এক শাস্ত্র দেওয়া আবশ্যক হইল। ঈশ্বর বলেন, কেন আমার সন্তান এখনও কাঁদে? কেন বলিতেছে, "ভাল লাগে না"। সন্তানের হৃদয়ের এই গভীর বেদনা, এই ব্যাকুলতা, "ভাল লাগে না" ইহা দেখিয়া ঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। অন্য হেতু নাই, অন্য হেতু হইতে পারে না, কেবল এক হেতু, ভাল লাগে না অর্থাৎ সুখ হল না। কি চাই? সুখ চাই, আনন্দ চাই। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গসাধনের প্রথমে এই ব্যাকুলতা। আমি যতদূর ঈশ্বরকে দেখ্‌ছি, ইহাতে ভাল লাগে না। মন কতক্ষণ কাঁদে, যতক্ষণ না অস্থিরতা এবং মনের জ্বালা যায়। ভক্তিশাস্ত্রে ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম নাই, যথার্থ অযথার্থ নাই, কেবল ভাল লাগা আর না লাগাই এই শাস্ত্রের কারণ। তোমার ভক্তি হইয়াছে, এই প্রশ্নের অর্থ এই, তোমার কি ভাল লাগে? ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্ম, নীতি, এ সকল কি তোমার ভাল লাগে? যদি ভাল না লাগে, তাহা হইলে ভক্ত নহ। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত, পাঁচ জনের সঙ্গে থাকা কি তোমার ভাল লাগে? ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে শরীর পুলকিত হয়। যিনি পুলকিত, তিনিই ভক্ত। পুলকবিহীন যে, সে অভক্ত। যত আহ্লাদ, যত দুঃখ কম, তত ভক্ত। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন ব্যাকুলতা হয়? ইহার হেতু নাই। ব্যাকুল ভক্ত বলেন, আমি আর কোন রূপ দেখিতে চাই। কেন চাই? হেতু নাই। আমার প্রাণ কাঁদছে। এই জন্য ভক্তি অহৈতুকী। ইহার কোন হেতু নাই। ভাল লাগে না, কেন ভাল লাগে না? এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঈশ্বরকে ভাল লাগছে কেন? ভাল লাগছে; হেতুর হেতু সেই হেতু কেবলই

চক্রের মধ্যে ঘুরিতেছে। ইহার পর হেতু নাই। যখন ছট্‌ফটানি এল, তখন তোমাকে পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্ম দিলেও বাঁচ্‌বে না। এই বেশ ছিল, আর পলকের মধ্যে গেলাম গেলাম বলিয়া ঈশ্বরের সন্তান চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার শরীর যেন খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। ভয়ানক মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষাও তাহার যন্ত্রণা অধিক হইল। এই অবস্থা হইল, এর কেন নাই, এর হেতু নাই। যদি কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার, তবে কেবল এই বলিতে পার, আত্মা বিকল হয়েছে। সেই লোক কাঁদছে, কেন কাঁদছে তার হেতু নাই। তিনি অনভিজ্ঞের ন্যায় বলিলেন, কেন আমি জানি না, ক্রন্দনে হৃদয় বিদারণ হইল, আবার দশ মিনিটের পর শান্তির অবস্থা আসিল! কেন হাসিল, কেন কাঁদিল, সে তাহা জানে না। কান্না ভক্তির পথ আরম্ভ করিয়া দিল, হাসি তার পর আসিল। যদি না কাঁদ, তুমি ভক্ত নহ। যত পরিমাণে ব্যাকুলতা হবে, আর ঈশ্বরকে না দেখে থাক্‌তে পারি না, এইভাব আলিঙ্গন করিবে, তত এই ব্যাকুলতা ভাব দ্বারা প্রেমময়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবে। আজ অহেতুকী ভক্তির কথা বলিলাম, সাধন দ্বারা ভক্তি কিরূপে হয় পরে বলিব।

অন্তরে বাহিরে ভ্রমণ।

কলুটোলা, ১লা চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, তুমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ, যোগ শিক্ষা করিতে হইলে গতি কোন্ দিকে, কোন্ পথ দিয়া চলিতে হইবে। প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতর দিকে। হাত দুটি, পা দুটি, চক্ষু

দুটি; কাণ দুটি বাহির হইতে ভিতরে যাইবে। দুটি হস্তে আর জড় বস্তু ধরিবার জন্য বাঞ্ছা থাকিবে না; কিন্তু দুটি হাত যোড় করিয়া ভিতরের বস্তু ধরিতে ইচ্ছা হইবে। যে পা সংসারের দিকে চলিতেছিল; তাহার বিপরীত দিকে গতি হইবে। যে দিকে রাস্তা ছিল না মনে করিতে, সেই দিকে রাস্তা খুলিবে। চক্ষু দুটি উল্টাইয়া গেল ভিতরে। কর্ণ দুটির আর বাহিরের সুললিত বাক্য ভাল লাগিবে না, ভিতরে ব্রহ্মবাণী শুনিবার জন্য ফিরিবে, সেই আকাশবাণী শুনিবার জন্য ভিতরে যাইবে। সেই মানুষটি ক্রমাগত ভিতরের দিকে চলিল। এক দিন যায়, এক মাস যায়, ছয় মাস যায়, এক বৎসর যায়; ভিতরের পথ আর ফুরায় না। বাহিরে যেমন অনেক দীর্ঘ পথ, ভিতরের পথও তেমনি অনেক দূর। ভিতরের দিকে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্থান আছে। উপাসনা করিতে হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, ধ্যান করিতে হইলে কাণ বন্ধ করিতে হয়, পূজা করিতে হইলে হাত দুটি যোড় করিতে হয়, পা দুটি সঙ্কুচিত করিতে হয়। যতবার উপাসনা করিবে, ততবারই এ সকল ইন্দ্রিয়কে বাহির হইতে ভিতরে লইয়া যাইতে হইবে। বাহিরে যেখানে গোল, সে স্থান হইতে দূরে গিয়া ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। যোগের প্রথম অবস্থা, প্রথম গতি এই। আরাধনা, ধ্যান, চিন্তা, সঙ্গীত, সমুদায় ভিতরে। এইরূপে ভিতরের দিকে গিয়া সাধন করিতে করিতে জীবন খুব আধ্যাত্মিক হয়, হস্তপদাদিকে সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিয়া ভিতরের দিকে যাইতে আমোদ হয়। যোগশিক্ষার্থী, এখানে কি যোগ শেষ হইল? তুমি বলিবে, না। পথিক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গিয়াছিল। আবার সে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিল। প্রথমে বাহির হইতে ভিতরে,

সাকার হইতে নিরাকারে যাইতে হয়। সেখানে অদৃশ্য দৃষ্ট হইল, অশব্দ শ্রুত হইল। তাহার পর ঈশ্বর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যোগী, তোমারত ঘরের কাজ হইয়াছে। ভিতরে যাওয়া ভিতরে থাকিবার জন্য নহে; এখন তুমি আবার বাহিরে যাও।" আবার দেখি যোগী সংসারে গেল, হাত পা ছড়াইল। "ওকি, হাত ধরিতে যায়! ওকি, পা চলে যে! ওকি, চক্ষু বাহিরের বস্তু দেখে যে! ওকি, যোগীর কাণ বাহিরের কথা শুনে কেন? তবে বুঝি যোগ ভাঙ্গিয়াছে," স্থূলদর্শী এই কথা বলে। সূক্ষ্মদর্শী বলে, যোগ জমিয়াছে, অথবা যোগীর জীবন জমাট হইয়াছে। চক্ষু মুদিত করিয়া নিশ্চিতরূপে অন্তর্জগৎ দেখা হইল, পরেও যদি চক্ষু মুদিত রাখা হয়, সে নিকৃষ্ট যোগী। পা চলুক, তুমিও চল; চক্ষু দেখুক, তুমিও দেখ। যখন ভিতরে ছিলে, তখন নিরাকারে নিরাকার দেখিয়াছ, এখন সাকারে নিরাকার দেখ। প্রথমাবস্থায় বাহ্য জগৎ হইতে তোমার সমুদায় শক্তি প্রত্যাহার করিয়া ভিতরের দিকে বিস্তার করিয়াছিলে; এখন বাহ্য জগতে বসিয়া নিরাকারের ধ্যান, আরাধনা, দর্শন প্রভৃতি সমুদায় আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন কর। প্রথমে চক্ষু খোলা যেমন দোষ, পরে চক্ষু বোজাও তেমনই দোষ। তখন ভিতরে থাকা দুর্ব্বলতার পরিচয়। যে কেবল পশ্চিমে গেল, পূর্ব্বে ফিরিল না, তার অর্দ্ধেক যোগ হইল। দাঁড়াও, গোলাকার পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গেলে, যদি ক্রমাগত চল, তোমাকে আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতেই হইবে। এ যে ভিতরের দিক্ দিয়াই আসা, এ তো পতনের ন্যায় ফিরিয়া আসা হইল না। যোগী সর্ব্বদা অগ্রগামী, যোগীর পক্ষে ঈশ্বর সর্ব্বদাই সম্মুখে, পশ্চাতে নহেন। দেবতা সমক্ষে। যোগশাস্ত্রত তবে প্রলাপের কথা বলিল, যদি ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া যোগীকে সংসারে ফিরিতে হয়। যথার্থ

যোগসাধনের জন্য বাহির হইতে ভিতরে গেলে ; ভিতরেই যাও, কিন্তু দেখিবে, দেখিতে দেখিতে তুমি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছ। কেন না, গোল পথ। প্রথমাবস্থায় স্ত্রী পুত্রকে নিরাকার করিয়া লইতে হয়, তখন বাহিরে আসিলেই যোগ ভঙ্গ হয়। তখন যদি হাত বাহিরের একটি বস্তু ধরিল, অমনি আর ভিতরের বস্তু স্পর্শ করিতে পারিল না। যাই কাণ বাহিরের বাদ্য শুনিল, অমনি ভিতরের ব্রহ্মবাণী শুনা বন্ধ হইল, এই প্রথমাবস্থার ঠিক কথা। প্রথমে সমুদায় নিরাকার, সাকার দেখিতে হইবে না।

তার পর যখন সময় হইল, তখন সাকারে নিরাকার দেখিতে হইবে। তুমি মুখ ফিরাও নাই, যেমন দৃষ্টান্ত দিলাম পৃথিবী গোল। তুমি সংসার ছাড়িয়া ভিতরে গেলে, তার পর আবার চলিতে চলিতে সংসারে আসিলে। যে ভিতর দিয়া না গিয়াছে, সে দেখে সাকারে সাকার ; আর যে নিরাকারের ভিতর দিয়া আসিল, সে জড়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাব দেখে, স্ত্রীর ভিতরে স্ত্রীর ভাব, মাতার ভিতরে মাতার ভাব, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সেই জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না, বজ্রাঘাতে শক্তির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, চক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মধ্যে তিনি প্রাণ। যখন ভিতরে যোগ করিয়া বাহিরে আসিলে, তখন ধর জড় ; কিন্তু ধরছ নিরাকার। শুনছ, দেখ্‌ছ জড় ; কিন্তু তাহা নহে, সকলই নিরাকার। বসেছ জড়ের উপর ; কিন্তু তাহা নহে, নিরাকার। মায়াবাদীর মতের এখানে অর্থ। এ সব ছাড়া যে যোগী, সে নিকৃষ্ট যোগী। সেই যোগী ভিতরে গেল, কিন্তু সে পথে বসিয়া পড়িল, চলিল না, চলিত যদি, পুনরায় এই নিকৃষ্ট জগতে আসিত। এই সকল লোকদের সঙ্গে অগ্রগামী যোগীর দেখা হইবে। এরা সাকারে

সাকার দেখে, তিনি সাকারে নিরাকার দেখেন। তাঁহার চক্ষে সকলই ব্রহ্মময়, আকাশময় ব্রহ্ম, জ্যোতির ভিতরে ব্রহ্ম। ভিতর থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে ভিতরে; একবার যাওয়া, আবার আসা, আবার যাওয়া, আবার আসা—কি নির্ম্মাণ হইল? যোগচক্র। যোগীর পরিপক্কাবস্থায় দুই এক হইবে। যোগীর পক্ষে একটা উপাসনার অবস্থা, একটা পৃথিবীর ব্যাপার, তাহা নহে; সকলই ব্রহ্মের ব্যাপার। বাহিরে ব্রহ্ম, ভিতরেও ব্রহ্ম; কিন্তু জগৎ ব্রহ্ম নহে, মনও ব্রহ্ম নহে। ভিতরে হাত দিলে কি হয়? মনের ভিতর ব্রহ্ম। বাহিরে হাত দিলে কি হয়? জগতেও ব্রহ্ম। এইরূপে যোগী ভিতরে গেল, বাহিরে এল, ভিতরে গেল, বাহিরে এল; ক্রমাগত যোগচক্র এত ঘুরতে লাগ্‌ল যে, আর ভিতর বাহির দেখা যায় না। সেই চক্র যখন এত অধিক দ্রুতবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল যে, আর গতি দেখা যায় না, তখন যোগসিদ্ধি হইল। সেই অবস্থায় স্ত্রী পরিবারের প্রতিপালন করিতে আর ভয় নাই, ব্রহ্মময় সমুদায় স্থান। এইরূপে যখন ভিতর বাহিরে দুই রাস্তা এক হইয়া যায়, তখন সাধক যোগেতে সিদ্ধ হন।

পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক।

কলুটোলা, ২রা চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, তুমি শুনিয়াছ যে, ভক্তির ভূমি স্বতন্ত্র; যেখানে পাপ পুণ্য আছে, তাহা ভক্তির ভূমি নহে। যেখানে পাপ পুণ্যের কথা নাই, পাপ পুণ্যের কথা নিষ্পত্তি হয়েছে, অর্থাৎ অন্তর পবিত্র হয়েছে, সেই পবিত্রতাকে অনুরঞ্জিত করিবার জন্য, সেই পবিত্র

ভূমিকে স্বর্গের বর্ণে বিভূষিত করিবার জন্য ভক্তির আবির্ভাব হয়। গৃহ প্রস্তুত হইল, রং দেওয়ার জন্য ভক্তির প্রয়োজন; সমুদায় নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, অট্টালিকা প্রস্তুত, ভক্তি এসে কেবল তাহাকে স্বর্গীয় বর্ণে সুশোভিত করে। শুদ্ধ হইয়াছ, শুদ্ধ হওয়ার পর এই প্রশ্ন আসিল,—শুদ্ধ হয়ে কেবল কি শুদ্ধ থাক্‌বে, না শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সুখী হবে? যে বলে, আমি কেবল শুদ্ধ থাক্‌ব, সে ধর্ম্মের পথে রইল, ভক্তির পথে গেল না।

এতৎসম্বন্ধে আর এক কথা আছে। ভক্তির ভূমি যদিও সাধারণ পাপ পুণ্যের অতীত, কিন্তু ভক্তি আপনার পাপ পুণ্যের একটি নূতন শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে। সেই উচ্চ ভূমিতে ভক্তির নূতন প্রকার অভিধানে সে সকল পাপ পুণ্য লিখিত হয়। নিম্ন ভূমির অধর্ম্ম কি? ক্রোধ, লোভ, পরদ্বেষ ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ইত্যাদি। নিম্নভূমির পুণ্য কি? ইন্দ্রিয়দমন, পরোপকার, সত্যকথন ইত্যাদি। ভক্তিরাজ্যে এ সমুদায় পাপ পুণ্যের কথাই নাই। ভক্তির অভিধানে পাপ আছে, ভক্তির মধ্যেও আবার বিধি নিষেধ আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আছে, ন্যায় অন্যায় আছে। ভক্তিরাজ্যের পাপ কি? শুষ্কতা। ভক্তিরাজ্যের পুণ্য কি? প্রেমের উচ্ছ্বাস। যার মনে শুষ্কতা এবং নিরাশা আসে, যার মনে জগতের প্রতি প্রধাবিত প্রেমের ভাব নাই, যে ভাই ভগ্নীর অনুরাগ অনুভব করিতে পারে না, সেই নিরাশ শুষ্কহৃদয় ব্যক্তিকে ভক্তেরা আপনাদের মধ্যে রাখিতে কুণ্ঠিত হন। নিম্নভূমিতে নরহত্যা যেমন মহাপাপ, ভক্তিরাজ্যে একেবারে শুষ্কতা তেমনই মহাপাপ। ভক্তিরাজ্যে পাপ এই—সত্য কথা কহিলে, অথচ সুখ হইল না, উপাসনা করে গেলে অনেকক্ষণ, অথচ প্রেম উথলিত হইল না; ভাই ভগ্নীদের অধীন হয়ে অনেক কাজ করিলে, কিন্তু ভাই বলিবামাত্র যে

মত্ততা হয়, তাহা হইল না। ভক্ত প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করেন, আমার মন ভক্তিসম্বন্ধে আজ কি কোন পাপ করেছে? মন যদি বলে, আমার প্রাণ দুই ঘণ্টা প্রেমবিহীন ছিল, তৎক্ষণাৎ কি সর্ব্বনাশ করেছি বলে ভক্ত অনুতাপ করেন। এতক্ষণ আমার প্রাণ থাক্ হয়েছিল! এখনও আমার প্রাণের ভিতরে এমন গভীর পাপ আছে, এই বলিয়া ভক্ত ক্রন্দন করেন। একবার যদি মন নিরাশ হয়, যথার্থ ভক্তের প্রাণ চিৎকার করিয়া উঠে। কি, আমি কি তবে দয়াল নাম মানি না? এইরূপ অতি সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় পাপ সকল দেখিয়া ভক্ত ভীত হন; এবং এইজন্য সর্ব্বদা ভক্তিপথে সাবধান হইয়া চলিতে হয়।

ভক্তিরাজ্যের স্বর্গ কি? সর্ব্বদা প্রেমসরোবরে বাস করা। ভক্তি রাজ্যের নরক কি? একটি শুষ্ক মরুভূমি পাথরের ন্যায় স্থান, যাহাতে এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না। নরক ত্যাগ কর, স্বর্গ গ্রহণ কর। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্যাকুলতা ভক্তির আরম্ভ; প্রেম, শান্তি ভক্তির ফল। প্রথম সেই শুষ্ক বালুকারাশি, সেই কঠিন পাথররূপ নরক দেখিয়া অনুতাপের ক্রন্দন; শেষে সেই পাথর বিগলিত হইল দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ, আনন্দ জলরাশি। পাথরকে কর্‌তে হবে জল, কঠিনকে কর্‌তে হবে মধু। পাথরকে সরোবর কর্‌তে হলে, জলের প্রয়োজন; এই জল প্রথমে অনুতাপের ক্রন্দন হইতে উৎপন্ন কর। এক্ষণে চক্ষু সহায়, কেন না চক্ষু জলদাতা। এইজন্য চক্ষু কেঁদে ভক্তি আরম্ভ করে। কি জন্য কাঁদে? ভক্ত জ্ঞানী নহে, সুতরাং তাহার কারণ জানে না। আমার গায়ে সমস্ত দিন কেন সূঁচ ফুট্‌ছে? এখন জ্বর হল কেন? রাত্রিতে নিদ্রা হয় না কেন? এবম্বিধ চিন্তা দ্বারা ভক্ত আপনাকে অস্থির করে ফেলেন। ভাল লাগে না, অত্যন্ত দুঃখ, অত্যন্ত কষ্ট যন্ত্রণা; যার মনে এটি নাই, সেখানে ভক্তি নাই।

এত বেলা হল, এখনও তাঁহার সঙ্গে দেখা হল না! এই বলিয়া ভক্ত কাঁদিয়া উঠিলেন। এই সুখে ছিলেন, হঠাৎ আবার এ সকল দুঃখের কথা। এই বিলাপধ্বনিতে জল পড়ে। এইটি ধর্ম্মরাজ্যের কৌশলে সাধন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এত,—কিছু পায়নি বলে ক্রন্দন,—অভক্তিও পরিত্রাণের পক্ষে সহায় হয়। ভক্তি হলেত আহ্লাদ হবেই। যখন বল্‌ছে আমার মন পাথরের মত, তখনই অনুতাপের অশ্রু পড়িয়া সেই কঠিন মন গলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের কি আশ্চর্য্য কৌশল! খুব ঘন কাল মেঘের ন্যায় বিষাদের তীব্র অশ্রুজলে সেই পাথর গলে যাচ্ছে। আমার পাথর কেন গলিল না, আমার কঠিনতা কেন ঘুচ্‌ল না, ভক্তি পাওয়া হইল না, এই ভেবে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমার বাড়াতে প্রেমময় নাই, ইহা ভাবাই প্রেমময়কে ডাকা। না পাওয়াই পাওয়ার মূল। এই জল সাধনের আরম্ভ। তার পর ক্রমে সেই জলের আকার পরিবর্ত্তন হয়। দুঃখের জল সুখের জলে পরিণত হয়। প্রথমে শক্ত মনকে নরম করিতে, অহঙ্কারী মনকে বিনয়ী করিতে, কঠিন মনকে কোমল করিতে, অনুতাপের তীব্র অশ্রু পড়িতে লাগিল; কিন্তু যে জলে পাথর গলে, সে জলে উদ্যানের ফুল ফুটে না; বিষাদের জল পড়িলে উদ্যান কাল হইয়া নষ্ট হয়। এই জন্য ঈশ্বরের এমনই কৌশল, অনুতাপের পর সহজেই ভক্তের হৃদয়ে আনন্দবারি বর্ষণ হয়। সেই আনন্দবারিতে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিতে লাগিল, ভক্তের হৃদয়-উদ্যানকে আরও মনোহর করিল। জল প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। সাধনের আরম্ভে ব্যাকুলতার জল, সাধনের শেষে শান্তির জল। গেলাম রে! মলাম রে! এ সকল কথা ভক্তির আরম্ভে, আঃ! পেয়েছি, বাঁচলাম; এ সকল কথা ভক্তির শেষ অবস্থায়। যে সুখ পেতে চাও, সেই সুখের জন্য কি

কাঁদ্‌ছ? যদি না কাঁদিতে থাক, তবে বাহিরে যাও, এখনও আরম্ভের সময় হয় নাই। ভক্তি কি তুমি চাও? প্রাণ কি তোমার কাঁদে? ভয়ানক জ্বরের জ্বালার ন্যায় কি মন অস্থির হইয়াছে? ব্যাকুলতার যে কি কষ্ট, কে জানে এ পথের পথিক বিনা। তোমরা মনে কর, শীঘ্র শীঘ্র পথিক হইব; কিন্তু ব্যাকুলতা কৈ? তোমরা বল, আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু ভক্তিরাজ্যের উপদেশ এ কথা মানিবে না। তোমার চক্ষের জলে প্রাণ ভাসে কি না? উপাসনা ভাল হয় না বলিয়া তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হও কি না? ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসিতে পার না বলিয়া তুমি অনুতাপে অস্থির হও কি না? বলিতে হইবে না, তোমার মুখের চেহারা দেখে বুঝা যায়, সময় আসে নাই। তোমার মুখে এখনও আরামের চিহ্ন রহিয়াছে। তুমি বলিতেছ, কেমন করিয়া কাঁদিব, ঈশ্বর না কাঁদাইলে? তবে তুমি হেতুবাদী। কে কাঁদাইবে, কবে কাঁদাইবে, কি ভাবে কাঁদাইবে, কিছুই জানা যায় না; অথচ না কাঁদিলে ভক্তি আরম্ভ হয় না। যদি বল একটু একটু কাঁদি, ভক্তিরাজ্যে সে প্রকার আরামপ্রিয় লোকের কাজ নাই। ভক্তির অভাব সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, কত কত ভক্ত আপনার শরীরকে কত ভয়ানক কষ্ট যন্ত্রণা দিলেন। অভক্ত কি সেই যন্ত্রণা বুঝিতে পারে? ধন্য ঈশ্বর, যে তিনি এই প্রকার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, ভক্তি কি অমূল্য বস্তু! ক্রন্দনে ভক্তির আরম্ভ, হাসি ভক্তির চিরলক্ষণ। যিনি হাসেন, তিনি ভক্ত। ভক্তি—হাসি, চিরপ্রসন্নতা, সদা প্রফুল্ল ভাব, পূর্ণ ভক্তি। ভক্তির অভাব কি? কঠিনতা; সে অবস্থায় ক্রন্দনও নাই, হাসিও নাই। পাথর হাসেও না, কাঁদেও না। ভক্তির আরম্ভে ব্যাকুলতার যন্ত্রণায় হৃদয় পুড়িয়া যায়, ভক্তির শেষে প্রেম শান্তি আনন্দে হৃদয় চিরপ্রসন্ন।

ভক্তির পথ বড়, না যোগ-পথ বড়, এ বিচারে প্রয়োজন কি? যোগ-পথে এখান থেকে ওখানে যাওয়ার একটি নিয়ম আছে; কিন্তু ভক্ত কেন কাঁদেন, কেন হাসেন, তার হেতু নাই। কান্না ভক্তির প্রথমাবস্থা, হাসি ভক্তির পূর্ণাবস্থা। পাথর গলিল অনুতাপ-জলে, সেই জল শেষে আনন্দজলে পরিণত হইল। কাল সমুদ্র সাদা সমুদ্র হইল। সেই আনন্দের জল নিত্য ভক্তের হৃদয়ে পড়িতেছে। আনন্দ দর্শন, আনন্দ শ্রবণ, আনন্দ স্পর্শন, আনন্দে নিমগ্ন থাকা, এই ভক্তির পূর্ণাবস্থা।

অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন।

কলুটোলা, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, তুমি যোগের দুই পথ শ্রবণ করিয়াছ। যোগের প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে, দ্বিতীয় পথ ভিতর হইতে বাহিরে। দুই শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতে হয়; এক শ্রেণীতে ভিতরে গিয়া, আর এক শ্রেণীতে বাহিরে আসিয়া। বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্তু ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে হইবে; এই যোগসাধনের গূঢ় অর্থ। সংসারে থাকিয়া যোগী হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে সংসারের ভিতর থাকিয়া। আমি এক দিকে, ঈশ্বর এক দিকে, মধ্যে সংসার। এই কথাতে বুঝিতে পার, সংসার কেন ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক। আমি এক দিকে, ঈশ্বর আর এক দিকে, মধ্যে সংসার, ইহাতে এক প্রকার জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গ্রহণ হয়। যেমন সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, তেমনই ব্রহ্মগ্রহণ। সংসার যদি মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে আসে, তাহা সত্যসূর্য্যের কতক অংশ গ্রাস

করিবেই, ঈশ্বরের মুখ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে দিবে না। প্রকাণ্ড আকার সংসার মধ্যস্থলে থাকিলে ব্রহ্মের মুখ জীবাত্মা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইবে না, কারণ মধ্যপথে প্রতিবন্ধক। সংসার যোগের ব্যাঘাত করে। তবে এই সংসারকে কি করিতে হইবে, যদি ইহা বারম্বার আমাদের ধর্ম্মপথে উপস্থিত হইয়া আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়? এক শ্রেণীর লোক সংসারকে টানিয়া ফেলিয়া দেন, স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, একাকী নির্জ্জন বনে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে বসিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করেন। এক যুক্তিতে ইহা ঠিক বোধ হয়, কেন না, ইহাতে মধ্যে তৃতীয় পদার্থ পৃথিবী রহিল না। ঈশ্বর এবং তাঁহার সঙ্গে যোগশিক্ষার্থীর মধ্যে যাহা কিছু ব্যবধান ছিল, সেইটি স্থানান্তরিত হইল। মধ্যে যাহা কিছু ব্যবধান, সেইটি স্থানান্তরিত করিয়া দুই পদার্থের মিলনই যোগ, আর কিছুই যোগ নহে। সেই সংসার কি, যাহা আমাদের যোগের প্রতিবন্ধক? বাহিরে যে সকল ব্যাপার দেখি, এবং যাহারা আমাদের মনে সকল ইন্দ্রিয় ও স্বার্থ উত্তেজিত করে, তাহা লইয়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, পাপাসক্তি মনের ভিতরে একটি প্রকাণ্ড সংসার নির্ম্মাণ করে। এ সমুদায় যোগের প্রতিবন্ধক, সুতরাং এ সমুদায়ের নাম সংসার। সমুদায়ের সমষ্টি সেই সংসার একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া আমাদের যোগ ভঙ্গ করে। এক শ্রেণীর মত এই, সংসারকে বিদায় করিয়া দিলে আত্মা পরমাত্মার সন্নিকর্ষ লাভ করে, অথবা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই দুই ভিন্ন পদার্থের মিলন হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধন কি? সংসারের সমুদায় ব্যাপার এবং ইহার মধ্যে যত রিপুর উত্তেজনার কারণ, সমুদায়কে মনের ভিতর নিয়ে যেতে হবে; তার পর যখন তাহারা ভিতর হইতে বাহিরে আসিবে, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে সমুদায় মিশ্রিত হয়ে যাবে।

পূর্ব্বে সে সমস্ত ব্যাপার ব্রহ্মবিহীন ছিল, তখন সে সমুদায় স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিবে। এখন যাহা মেঘের ন্যায় ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে, সেই মেঘকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আবার বাহিরে আসিতে দিলে, তাহাই স্বচ্ছ কাচের ন্যায় ব্রহ্মদর্শনের অনুকূল হইবে। অভ্যাসেতে এ সকল এমন সহজ হইয়া যায় যে, যোগী যখন নিরাকার জগৎ হইতে পুনর্ব্বার বাহিরে আসেন, তখন তিনি সংসারের ভিতর যে ঈশ্বর বাস করেন, বাহ্য তাবৎ পদার্থে কেবল তাঁহাকেই দর্শন করেন।

ইহা শুনিতে কঠিন, কিন্তু প্রকৃত যোগীর পক্ষে ইহা সহজ। সংসারীর পক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, লতা, এ সমুদায় বাহ্য পদার্থ; এ সমুদায় পদার্থে ঈশ্বর অপ্রকাশ; এ সকল জড় বস্তু আবরণস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু যখন আমরা অন্তরে এ সকলকে লইয়া গিয়া সাধন করি, তখন এ সকলের ভিতরে যিনি আছেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। যখন পরিপক্ক হয়ে বাহিরে আসি, তখন সাকারেও নিরাকার দর্শন হয়। ভিতরে সাধন করিয়া যখন বাহিরে আসিবে, তখন যে ফুল হাতে লইবে, যে জল স্পর্শ করিবে, প্রত্যেক জড় বস্তু সেই নিরাকার অন্তরাত্মাকে দেখাইয়া দিবে। তখন চোক খুলে ধ্যান করা, কাণ খোলা রেখে ভিতরের দৈববাণী শ্রবণ করা সহজ হইবে। বাহিরে কোকিল ডাকিতেছে, জল কল্‌কল্‌ করিতেছে, তার মধ্যে যোগী ব্রহ্মনাম-গান শ্রবণ করেন। যোগী বাহিরের সমস্ত পদার্থ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তখন ব্রহ্মগ্রহণ হইল না, অর্থাৎ বাহ্য পদার্থরূপ সংসার ব্রহ্মকে ঢাকিতে পারিল না; কিন্তু আত্মা সহজে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিল। যোগের প্রথমাবস্থায় বাহিরের বস্তু সকল বলে, যোগী, আমাদের সঙ্গে থাকিলে তুমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, তুমি বাহির হইতে ভিতরে

যাও; কিন্তু ভিতরে সাধন করিয়া যখন যোগী বাহিরে আসেন, সে সমুদায় পদার্থই আবার স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। এই প্রকৃত যোগধর্ম্ম। সংসার ছেড়ে যাওয়া অন্যায়, পাপ। কর্‌তে হবে কি? সংসারকে বুকের ভিতর নিয়ে স্বচ্ছ করে আন্‌তে হবে। সংসারের ভিতর দিয়া কেবল অন্তর্জগৎ দেখ্‌তে হবে। এই যেমন ঈশ্বর সমক্ষে, মধ্যে সংসার, তার পর আমি। যতবার ঈশ্বরকে ভাব্‌তে যাই, সংসার প্রতিবন্ধক হয়, সংসার বিঘ্ন দেয়। অতএব চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতাদি ভিতরে ভাবিব। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে ভাবিব। ক্রমাগত উন্নত পবিত্র চিন্তা দ্বারা সেই সংসার স্বচ্ছ হইয়া আসিবে, অর্থাৎ সূর্য্যের ভিতর দিয়া, চন্দ্রের ভিতর দিয়া বেশ দেখা যাইবে, ঐ সূর্য্যের সূর্য্য, চন্দ্রের চন্দ্র ঐ দিকে বসে আছেন। সংসারীর পক্ষে সংসার প্রাচীর, যোগীর পক্ষে সংসার স্বচ্ছ কাচ। যোগীর নিকট বাহ্য বস্তু অন্তরাল বা আবরণ বলিয়া বোধ হয় না। যোগী সৃষ্টির মধ্যে তাঁহাকে দেখেন, যিনি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য এ সকল করিয়াছিলেন। যোগী যাহা দেখেন, তাহারই মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। সংসারীর পক্ষে সংসারের নানা প্রকার কার্য্য নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যোগীর পক্ষে সমুদায়ই ব্রহ্মের ব্যাপার। সমুদায়ই ঈশ্বরের হস্তরচিত, সকল স্থান ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ।

এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিয়া যোগীর ইচ্ছা সফল হয়। এই সূত্রে ভ্রম, মায়াবাদ উৎপন্ন হয়। মায়াবাদীরা বলে, যদি সর্ব্বস্থান ব্রহ্মময় হইল, জগৎ তবে ছায়া, জগৎ তবে কিছুই নহে। প্রকৃত যোগী ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে, আমি আছি, এই তিনিই সত্য। আর তিনি এও বলেন, যোগবল দ্বারা কেবল এই বাহ্য জগৎকে স্বচ্ছ করিয়া লইতে হইবে। মূর্খ বলে,

সংসার ঈশ্বর ছাড়া; যোগী বলেন, সংসারও সেইরূপ ঈশ্বরের সংসার, যেমন আমার মন ঈশ্বররচিত। সংসারেও ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, কেবল সংসারীর নিকট তিনি অপ্রকাশ। আমার ভিতর ঈশ্বর আছেন, এখানে তাঁহাকে শীঘ্র দেখা যায়; আর বাহিরে না কি অনেক স্থূল আকার, অত্যন্ত কোলাহলরূপ সংসার, অনেক আবরণ, এইজন্য সহজে তাঁহাকে দেখা যায় না। ঐ ঢাকা, ঐ আবরণটি তাড়াইয়া দাও, সেখানেও ঈশ্বরকে দেখিবে। প্রকৃত যোগ সংসারকে বিদায় করিয়া দিল না; কিন্তু সংসারের উপর যে মলিন আবরণ ছিল, তাহা দূর করিল। সংসার কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতে লাগিল। অতএব সংসার আমাদের শত্রু নহে। অতএব মনের ভিতর গিয়া এমন সাধন কর যে, বাহিরে আসিলেও কোন জড় পদার্থ ঈশ্বরকে ভুলাইয়া দিতে পারিবে না। বাহিরে আসিলেও দেখিবে, সেই অন্তরস্থ নিরাকার ঈশ্বর সাম্‌নে আছেন, সংসার মধ্যে বেড়াচ্ছেন, কাজ কর্‌ছেন। এইরূপে সংসারের সমুদায় ব্যাপারের ভিতর থেকেও যোগী ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করেন।

কৃপা ও সাধন।

কলুটোলা, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

যোগশাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র, হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, এই দুয়ের মধ্যে কেমন প্রভেদ জানিবে, যেমন স্থলে ভ্রমণ ও জলে ভ্রমণ। যোগের পথ স্থলে ভ্রমণ, কারণ ইহার প্রায় সমুদায় ব্যাপারের হেতু দেখা যায়; এই পথে কোন্ কারণ হইতে কি কার্য্য হইল, অনেক পরিমাণে তাহা জানা যায়। কিন্তু ভক্তির পথ এরূপ নহে, ভক্তির

পথ জলে ভ্রমণ। ভক্তিকে অহৈতুকী বলার কারণ কি? কারণ ভক্তিব্যাপারের হেতু জানা যায় না। ঈশ্বরের হস্ত আমাদের অজ্ঞাত এবং অলক্ষিতভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল করে, আমরা তাহার হেতু জানিতে পারি না। যেমন জলের উপর পথ একবার পরিচিত হইলেও তাহা অপরিচিত থাকে. সেইরূপ ভক্তির পথ। স্থলপথ নির্দ্ধারিত, একবার পরিচিত হইলে আর অপরিচিত থাকে না। ভক্তিবারির উপর সাধন করা এইজন্য অনেকটা অহৈতুকী মুক্তির উপর জীবন স্থাপন করা। অতএব ভক্তিরাজ্যে কি কারণে কি হয়, তাহা বলা শক্ত। কিন্তু তথাপি ইহা বলা উচিত, ভক্তির ভিতরে ঈশ্বরের কার্য্য এবং মনুষ্যের কার্য্য দুই আছে। যাহা ঈশ্বরের দিক হইতে হয়, তাহা দৈবাৎ, তাহার কোন হেতু নাই; দৈব ঘটনা হঠাৎ হইল, কোন হেতু জানা নাই। কেন করিলেন, কি ভাবে করিলেন, কিছুই হেতু নাই। ঈশ্বরের দিক হইতে বায়ু কোন্ দিক থেকে, কোন্ শাস্ত্রানুসারে, কেন আসে, কিছু জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি না, এইজন্য কি বাস্তবিক অহৈতুকী? কখন না, মানুষ বলিতে পারে না, এইজন্য অহৈতুকী। ভক্তি কি কেবল দৈব ব্যাপার? না, ইহা এক দিকে যেমন দৈবাৎ, মানুষের দিক হইতে আবার তেমনি সাধনের ব্যাপার। ভক্তিতে সাধন উপাসনাও আছে, আবার দৈবযোগে প্রসাদপ্রাপ্তিও আছে। যিনি অত্যন্ত ভক্ত, তাঁহার জীবনও সাধনবিহীন নহে; আর যিনি অত্যন্ত সাধক ভক্ত, তাঁহার জীবনে ঈশ্বরপ্রসাদেরও অভাব দেখা যায় না। প্রত্যেকের জীবনে দুইই দেখা যায়। তবে কি না, কাহারও সাধনপ্রবলা ভক্তি, কাহারও দেবপ্রসাদপ্রবলা ভক্তি। কেবল পরিমাণে অধিক। শ্রেণী-বদ্ধ করিতে হইলে ভক্তদিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে

হইবে। তুমি শুনিয়াছ, কেহ পৈতৃক ধন, কেহ বা নিজ পরিশ্রমজাত সম্পত্তির অধিকারী হয়। দেবদত্ত ভক্তি পৈতৃক ধন, যাঁহার সেই ভক্তি আছে, তিনি জন্মাবধি সেই ধনসম্পত্তির অধিকারী। আর এক জন অনেক সাধন এবং অনেক চেষ্টা দ্বারা ভক্তি উপার্জ্জন করেন, তাহা সাধনের ভক্তি। এক জন দেবদত্ত ভক্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সাধন এবং আয়াসের প্রয়োজন। যাঁহারা অত্যন্ত আয়াসের সহিত ঈশ্বরদত্ত ভক্তি রক্ষা করেন, তাঁহারা যেমন ভক্তির মূল্য জানেন, তেমন আর কেহই জানেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভক্তি আসিল; কিন্তু তাহা রাখিবার জন্য যদি উপযুক্তরূপে সাধন করা না হয়, যদি সাধুসঙ্গ না করা হয়, যদি যথারীতি চিত্তশুদ্ধি না রাখা হয়, যদি রিপু প্রবল হয়, তবে সেই ভক্তি আবার পলায়ন করিতে পারে। উপর হইতে জল অনেক পড়িল; কিন্তু চারিদিকে বাঁধ চাই। ঈশ্বরের কৃপাবারি অনেক আসিল, কিন্তু সেই কৃপাবারি রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই। আর যাহারা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর এবং বিশ্বাস আবশ্যক। তাহা না হইলে অহঙ্কার আসিয়া তাঁহাদের ভক্তির মূল পর্য্যন্ত বিনাশ করিবে। উপর হইতে দেবপ্রসাদ যত আসিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধন করিলে সেগুলি আরও সবল হয়। ঈশ্বর হইতে দেবপ্রসাদ আসিল, আরও প্রসাদ আসিবে, ভক্ত যদি এরূপ আশা না করেন, তাঁহার ভক্তি শুকাইয়া যাইবে। সাধনপ্রবল ভক্ত দেবপ্রসাদ অস্বীকার করিতে পারেন না, দেবপ্রসাদ ভিন্ন তাঁহার কিছুই সিদ্ধ হয় না। তিনি বীজ বপন করেন, বৃদ্ধি হওয়া, ফল দেওয়া ঈশ্বরের হাত। আবার দেবপ্রসাদপ্রবল ভক্তেরাও সাধক। যতবার ঈশ্বর দিবেন, ততবার সে সমুদায় রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন

চাই; যে যে পথ বলিয়া দিবেন, সেই সকল অবলম্বন করিবার জন্য সাধন চাই। পাইবার বেলা, লাভের বেলা হেতু নাই। ঈশ্বর কেন দিলেন, হেতু নাই; কিন্তু যত সাধন করিবে, তাহার হেতু আছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে কবে সুবাতাস আসিবে, কবে তিনি ফল দিবেন, তুমি কিছুই জান না। আমি সাধন করিয়াছি, অতএব, হে ঈশ্বর, তোমাকে ফল দিতেই হইবে, ঈশ্বরকে এই কথা বলিতে পার না। শীতের সময় হয়ত শীত হইল না, গ্রীষ্ম হইল, গ্রীষ্মের সময় হয়ত শীত হইল। এ সকল ব্যাপারের হেতু নাই। ঈশ্বরসম্বন্ধে যে বিভাগ, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ের হেতু কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না; যদি করেন, অবিশ্বাসী হইবেন। তাঁহার কাছে সাধন করিয়া পড়িয়া থাকিবে। যখন ফল দিবার হয় তিনি দিবেন, তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে।

সার আকর্ষণ।

কলুটোলা, ৫ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, একটি পাত্রে কোন বস্তু ছিল, তাহা নিক্ষেপ কর, পাত্র শূন্য হইল; আর একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী তাহার মধ্যে রাখ, আবার সেই পাত্র পূর্ণ হইল। এইরূপ জানিবে, সংসারের প্রতি যোগীর দুই প্রকার ব্যবহার। প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে, দ্বিতীয় পথ ভিতর হইতে বাহিরে। প্রথম পথ কঠিন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, বাহিরের সংসার হইতে অদৃশ্য জগতে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? বাহিরের জগৎকেই যথার্থ পদার্থ বলিয়া জানি, তাহা ছাড়িয়া যোগের অনুরোধে কিরূপে অন্ধকারে যাওয়া যায়? বস্তু ছেড়ে অবস্তুতে,

আলোক ছেড়ে অন্ধকারে, পরিচিত দেশ ছেড়ে অপরিচিত দেশে যাবে কেমন করে? অনেক লোক ছেড়ে নির্জ্জনে যাবে কিরূপে? তারাই বা যেতে দেবে কেন? যদি হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত কর, সংসার ছাড়্বে বলে, দেখ্‌বে, সেই মুদিত নয়নের ভিতরেও সংসার আস্‌বে; কেন না, সংসার একটি বহুকালের পরিচিত বস্তু, আর যেখানে যাওয়া হইবে, সেখানে ঘোর অন্ধকার। সুতরাং বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া অনুকূল নহে। এই গতি প্রতিকূল স্রোতে। বাল্যকাল হইতে যে সকল সংস্কার, রুচি, রীতি, চরিত্র হইয়াছে, তাহার বিপরীত দিকে যাইতে হইবে। যাহাকে বহুকাল সার পদার্থ বলিয়া মান্য করা হইয়াছে, তাহাকে ছায়া, অসার, অপদাথ জানিয়া, যাহাকে অন্ধকার, শূন্য বলিয়া মনে হইত, তাহার মধ্যেই যথার্থ পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। একটি উপায় শাস্ত্রেতে কথিত আছে এবং তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জড়ের পাত্রটি শূন্য কর, মন্ত্রের বলে জড়ের গুরুত্ব বিলোপ কর। জড়কে যতদিন পদার্থ, সারবস্তু বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, ততদিন সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিবে না। যতই কেন ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বল না, যদি জড়ের অসারতা বুঝিতে না পার, তবে বাহির হইতে ভিতরে গেলেও দেখিবে, সেই জড়ের উজ্জ্বলতা এবং গুরুত্ব তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব যোগশিক্ষার্থী প্রথমেই স্বতন্ত্র জগৎকে ছায়ার ন্যায় অসার অপদার্থ বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহারই জন্য উপদেশ আছে, যে পরিমাণে বাহিরে অসারতা অনুভব করা হইবে, সেই পরিমাণে ভিতরের বস্তু সৎ এবং সার বলিয়া গৃহীত হইবে। যে পরিমাণে বাহিরের নদী খালি হইবে, সেই পরিমাণে ভিতরের বিশ্বাসনদীতে জল ঢালা হইবে। যাঁহার পক্ষে বাহিরের জগৎ পূর্ণ, তাঁহার পক্ষে ভিতরের জগৎ শূন্য।

যিনি বাহিরে জগৎকে সার বলিয়া জানেন, তিনি অতি কষ্টে ঈশ্বরকে সৎ, সৎ, সৎ, বলিয়া চিন্তা করেন। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন এবং ঈশ্বরকে ভোগ করা অতি কঠিন ব্যাপার। ঘট থেকে জল ঢেলে ফেল, তবে আর তার আদর থাকিবে না। দেহ থেকে প্রাণ হরণ কর, সেই দেহের আকর্ষণ থাকিবে না। খাঁচা থেকে পাখী উড়াইয়া দাও, সেই খাঁচা আর সুন্দর রহিল না। ফল থেকে শাঁস বাহির করে লও, খালি খোসার আর আদর থাকিবে না। সেইরূপ যোগী যখন বিশ্বাসের হাত দিয়া জড় জগৎ হইতে তাহার গুরুত্ব হরণ করিলেন, তখন এত বড় প্রকাণ্ড জগৎ শূন্য খোসার ন্যায় পড়িয়া রহিল। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, জন্তু, নগর, গ্রাম, সব খোসা, সব অসার; কিন্তু যাহা হারাবে বাহিরে, তাহা পাবে ভিতরে। বাহিরের সব অসার হইল, এ দিকে ভিতরের সব জেগে উঠিল। এইরূপে অন্ধকারের ভিতরে বস্তু দেখা ক্রমে হবে, এক দিনে নহে। যাহা বলিলাম, তাহা সিদ্ধির অবস্থা। এইটি মনে রাখিবে, সাকার আসল বস্তু নহে, নকল বস্তু। যেমন মনে কর, একজন ধার করে বড় মানুষ হয়েছিল; সোণার মুকুট মাথায়, লোক জন লইয়া মহা-সমারোহ করিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় যাহা হইতে ধার লইয়াছিল, সে এসে বিলখানি দেখাইল, তার সোণার মুকুট, গাড়ি, বহুমূল্য অলঙ্কার ইত্যাদি সমুদায় কাড়িয়া লইল, তার আর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। এ গল্প স্পষ্ট জগৎ সম্পর্কে সত্য। পৃথিবীর ভাল গান, ভাল দৃশ্য, সমুদায় নিরাকারের কাছ থেকে ধার করা। নিরাকার হইতে ধার করিয়া এই সাকার পৃথিবীর বড়মানুষি। ইহার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বল শক্তি ধার করা। যাঁর ধন, তিনি গ্রহণ করিলেন, আর নির্ধন নেড়া জগৎ পড়ে রহিল। এ দিকে সাকারের

দরিদ্রতা, দুর্দ্দশা হইল, ও দিকে নিরাকার গিয়ে জেগে উঠ্‌লেন। সাকার গেলেন অসার হয়ে, নিরাকারের নিজের সম্পত্তি ভিতরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এত দিন কেহ জান্‌ত না, কিরূপে নিরাকারকে বস্তু করা যায়। হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি বিশ্বাস কর, তেমনই বস্তু ভিতরে দেখা যায়, যেমন বাহিরের বস্তু সংসারীরা দেখিতেছে। কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে নহে, কিন্তু যেগুলি বাহির হইতে গেল, সমুদায় ভিতরে ধরা যাইবে। শুন নাই কি, পৃথিবীর এক দিকে রাত্রি হয়, অন্য দিকে দিন হয়? আবার ঘুরাইয়া লও, গোলাকার পৃথিবীতে যে দিকে দিন ছিল, সেই দিকেই রাত্রি হইল। সে দিন যেমন গোলাকার পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি, যে পথিক পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে চলিতে লাগিল, সে আবার বিমুখ না হইয়া সেই পূর্ব্ব দিকে আসিল। পৃথিবী গোল না হইলে ইহা হইতে পারিত না। এই দৃষ্টান্তে এক দিকে সব অন্ধকার, আর এক দিকে সূর্য্য। এক দিকে দ্বিপ্রহরা রজনী, অন্য দিকে দ্বিপ্রহর দিবা। সংসারী বলে, বাহিরের এমন দুই প্রহরের উজ্জ্বল আলো ছেড়ে কে অন্ধকারে যাবে? যোগী বলেন, ভিতরের এমন বস্তু ছেড়ে কে বাহিরের ছায়া ধরিতে যাবে? যোগীর চক্ষে জগৎ একখানা প্রকাণ্ড খোসা। প্রকাণ্ড পাথরের পর্ব্বত কাগজের একখানা খেল্‌নার মত। এই জগৎ দেখ্‌তে ঝক্ ঝক্ সোণা, সোণা নয়, সোণালি কাগজের মত উপরে মোড়া। ধার করে তারা সৎ, নিজের কিছুই নাই। যথার্থ পদার্থ ভিতরে। এক দুই তিন চার গুণিতে গুণিতে যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভিতরের বস্তু দেখিতে দেখিতে নিরাকারের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইবে। চর্ম্মচক্ষের পক্ষে পৃথিবী যেমন সৎ পদার্থ, ভিতরের চক্ষের পক্ষে তেমনি নিরাকার হইবে। ঘট খালি কর, ঘট পূর্ণ হবে। আজ বাহিরের পাত্রকে

খালি করিতে হইবে, কেবল এই কথা বলিলাম; ঘট কেমন করে পূর্ণ করিবে, তাহা পরে বলিব।

(পুঃ) বাহিরের সমুদায় অসার ভস্মরাশি, ইহা জেনে ভিতরে গেলে আর ভয় নাই। বাহিরে ধনরাশি রহিল, ইহা জেনে ভিতরে গেলে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।

সাধন ও করুণার ঐক্য।

কলুটোলা, ৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই এক গভীর প্রশ্ন, যাহা ভক্তিশিক্ষার্থী হইলে মনে উত্থিত হইবেই। ভক্তি যদি দেবদত্ত অথবা অহৈতুকী হয়, নিয়মের অধীন নহে, তবে সাধনের প্রয়োজন কি? ভক্তির সমুদায় ব্যাপার যদি দৈবাৎ হয়, তবে মানুষের কি রহিল? নামশ্রবণ, নামসাধন এবং সাধুসঙ্গ ইত্যাদির তবে অর্থ কি? ষোল আনা সাধন করিতেই হইবে, ষোল আনা মূল্য দিতেই হইবে, একটি পয়সা রাখা হইবে না। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বদা বলিতেছেন, সমুদায় দিলেই যে আমি দিব, তাহা নহে। দিতে হইবে, যাহা কিছু আছে, শক্তি সামর্থ্য সমুদায় দিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, উপাসনা এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় উপায় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু সমস্ত দিন সাধন করা হইল, অথচ এমন হইতে পারে, কিছুই ভক্তির উদয় হইল না। ঈশ্বর চান, যে ভক্ত হইবে, সে বিনয়ী হইবে; মূল্য দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবে না; অথচ পাছে অলস হয়, এই জন্য ভক্তকে প্রাণপণে সাধন করিতে হইবে,

এই বিধি করিয়াছেন। সাধন করিবে, অথচ অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে, ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের এই মধুর বিধি। কোন্ দিক্ হইতে, কি উপায়ে ঈশ্বরের বায়ু আসিবে, কেহই জানে না; অতএব সকল দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে। সাধনের সমুদায় অঙ্গই গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, ভক্ত বিনয় এবং ধৈর্য্য শিক্ষা করিবে। সকল অবস্থার মধ্যে তাঁর উপর একান্ত-মনে নির্ভর করিয়া থাকিবে। আমাদের দিক্ থেকে সমুদায় দিলাম; কিন্তু তাঁহা হইতে কখন প্রসাদ আসিবে, জানি না; সুতরাং আশা করিয়া বিনীতভাবে ধৈর্য্য শিক্ষা করিব তাঁহার দিক্ হইতে শুভ বায়ু যদি দুদিন না আসে, তাহাতে আমার দিক্ হইতে যাহা দিয়াছিলাম, তাহা ফিরাইয়া লইবার যো নাই। সাধন মূল্য দিতেছি বলিয়া যে উপর হইতে বায়ু পাইতেছি, তাহা নহে। তুমি দাঁড় ফেল; কিন্তু দাঁড় ফেলিতেছ বলিয়া যে বায়ু পাইতেছ, তাহা নহে। এক দিন একটি ছোট গান গাইয়াছিলে, তাহাতেই সমস্ত দিন তোমার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ ছিল; আর এক দিন অনেক গান করিলে, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তির উদয় হইল না। এক দিন কম দিয়ে অনেক পাইলে, আর এক দিন অনেক দিয়াও কিছুই পাইলে না; এ সকল বিষয়ের গূঢ় হেতু কেহ জানে না। কিন্তু একটি পথ আছে, সেই পথে না গেলে ভক্তিবাতাস আসে না, দেবপ্রসাদ পাওয়া যায় না, সেই পথে যাওয়ার নাম সাধন। ভক্তি লাভ করিবার অন্য পথ নাই। সেই পথে গিয়া থাকিতে হইবে, তার পর একটি বায়ু আসিবে, তাহা কোন্ বাগানে লইয়া ফেলিবে, কেহ জানে না। তখন সমুদায় কেশাকর্ষণের ব্যাপার হইবে। তোমাকে আর দাঁড় ফেলিতে হইবে না, সেই বাতাসে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবে। সেই জায়গা কেহ জানে না।

আশ্চর্য্য দেখ, দুইবার চারিবার প্রায় সকলেই সেই জায়গায় গিয়া বসিয়াছে; কিন্তু কেহই তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। স্থলের পথ নহে, জলের পথ, সুতরাং এক শত বার সেই দিক্ দিয়া নৌকা গেলেও পথ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। কোন দিন "প্রেমময়" ইহার প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতে না করিতে প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, আর এক দিন "প্রেমময়, প্রেমময়" সত্তর বার বলিলেও প্রেম হয় না। এক দিন মৃদঙ্গ ধরিবামাত্র ভক্তি উথলিয়া উঠিল, আর এক দিন খুব মৃদঙ্গ বাজাইলে, কিন্তু কিছুতেই ভক্তি হইল না। কিন্তু প্রেম ভক্তি হউক না হউক, যেখান হইতে এক বার প্রেম ভক্তি হইয়াছিল, যেখান থেকে এক বার ঈশ্বর তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া সাধন করিতেই হইবে। তুমি আমি সর্ব্বদাই অকিঞ্চন হইয়া থাকিব। ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইব, এই প্রকার অণুমাত্র আশা করা ভক্তিপথের শত্রু। আমি এত দিয়াছি, অতএব প্রেম এস, এই অহঙ্কারে প্রেম আসিবে না। যে সাধন না করিয়া শুইয়াছিল, তাহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কাজ করিয়া অহঙ্কার করিল, তাহার পক্ষেও তেমনই দরজা বন্ধ। যে খুব সাধন করিয়া বলিল, আমিত কোন মূল্য দিতে পারি না, শুভক্ষণে তাহার জন্য ভক্তিদ্বার খুলিল। সেই শুভ লগ্ন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ কাহার জন্য কখন আসিবে, তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জানেন। তুমি ভূমি খনন কর, বীজ বপন কর, কিন্তু বৃষ্টি তোমার হাতে নয়। তুমি পরিশ্রম করিয়াছ বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি আসিবে ঠিক শুভক্ষণ হইলেই, যাহাতে বীজ মারা না যায়, এমন বৃষ্টি হইবে। যদি বল, অনেক দিন পরে বৃষ্টি আসিলে বীজ পচিয়া যাইবে, তা হবে না। চাষা না জানিল, তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, চাষাকে জানিতে

দিবেন না। বৃষ্টি কখনও দুই প্রহর বেলায়, কখনও বা রাত্রে হয়। কখনও বা হুড়্ হুড়্ করিয়া হয়, কখনও হয় না। এই বৃষ্টি হইতেছে, আবার এই কিছুই নাই, এ সকলের হেতু কেহ জানে না। হৃদয়ের ভূমি কর্ষণ পক্ষেও এইরূপ। আমি এত কর্ষণ করিলাম, অতএব বৃষ্টি হইবে, এখানে এ প্রকার কার্য্যকারণ নাই। তুমি টাকা দিয়া কিনিতে চাও? ঘুষ দিতেছ? আমি কর্ষণ করিয়াছি বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি হইবেই। দাম দিবে না, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যাহা বলা হবে, সমুদায় করিবে। কোন্ দিন কি সূত্রে ভক্তি আসিবে, কেহ জানে না। কোন দিন গান করিয়া হইল না, কোন চিন্তা করিয়া হইল না, কোন দিন গানের প্রথম অক্ষর বলিতেই হুড়্ হুড় করিয়া প্রেম আসিয়া হৃদয় ভাসাইয়া দিল। কোন দিন সজনে হইল না, নির্জ্জনে হইল। এ সকল পরীক্ষায় কথা, হইয়াছে, হইবে। ভক্তির হেতু নাই, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে। ষোল আনা না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে, তাহা নহে। দিলে এই হইবে, যাহারা পাওয়ার অধিকারী, তাহাদের মধ্যে গণিত হইবে। সেই পথে চলিতে চলিতে অবশেষে সেই পিছল জায়গায় গিয়া পড়িবে, সেখান হইতে সহজে ভক্তির সাগরে ডুবিয়া যাইবে। আমি যাহা করিলাম, তাঁহারই আদেশানুসারে, তাঁহারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া, তাহারই সাহায্যে; কেন না, দাড় তিনিই করিয়া দিয়াছেন, আর তিনিই হঠাৎ বায়ু পাঠাইলে পাল তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকি। সাধন করিতেও তিনি শিখাইয়া দেন, আর স্বর্গের বৃষ্টিও তিনিই প্রেরণ করেন। দুইয়ের মধ্যে তবে ভেদাভেদ এই যে, একটি দ্বারা তিনি পরামর্শ দিয়া আমাদের দ্বারা করাইয়া লন, আর একটি তিনি আমাদিগকে কিছু না বলিয়া নিজে করেন। যদি ভক্তি আসিতে দেরি হয়, তাহা না

আসাতে এত ব্যাকুলতা হয় যে, ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। আমি এমন দুঃখী, আমার কাছে তিনি আসিলেন না, এই কথা বলিতে বলিতে তাহার ব্যাকুলতা, বিনয় এবং ভক্তি গাঢ় হইতে থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে নিরাশা মহাশত্রু। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইবে না, খুব ব্যাকুল হইবে। এত ব্যাকুল হৃদয় যখন, তখন ভক্তি আসিবেই। তবে ভক্তি হওয়াতেও লাভ, না হওয়াতেও লাভ। যখন না আসে, তার অর্থ এই যে, অত্যন্ত আসিবে। অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়াছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তথাপি পড়িয়া আছি। কাঁদিয়া অস্থির হইলে, তবে প্রেম আসিবে। যত ব্যাকুল হইবে, তত গাঢ় মাত্রাতে ভক্তি বাড়িবে। তোমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিবে। তুমি বলিবে, এই যে সাতটা বাজিল, কৈ ঠাকুর দেখা দিলেন না? এই দশটা বাজিল, কৈ ঠাকুর আসিলেন না? এই ছয়টা বাজিল, ঠাকুর কোথায় রহিলেন? তুমি এইরূপে কেবল তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে। তোমার যাহা করিবার তুমি কর, তাঁহার সময়ে তিনি আসিবেন। সাধনের কি কি রীতি প্রণালী পরে বলিব।

বাহিরে আগমন।

কলুটোলা, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, মৃতসঞ্জীবনী শক্তির কথা অবশ্য শুনিয়াছ; মৃতকে আবার প্রাণ দেওয়া যায়, এটি কল্পনা নয়, বাস্তবিক ব্যাপার। যখন যোগধর্ম্মশিক্ষার্থী শিষ্য সংসার ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্মশানে একটি মৃত দেহ রাখিয়া গেলেন। এই বাহ্য জগৎ সেই মৃত দেহ। তাঁহার সম্পর্কে এই বিশ্ব মৃত, অসার, অসৎ হইয়া পড়িয়া

রহিল। ভিতরে সারদর্শন, সারচিন্তা, সারের প্রতি অনুধাবন তাঁহার একমাত্র সাধন হইল। এইরূপে বহু বৎসরে বহু চিন্তা দ্বারা, সংসার-চিন্তা হইতে নিবৃত্তি, জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া, কেবল যাহা নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, সেই বস্তুকে দর্শন, শ্রবণ এবং স্পর্শ করাই তাঁহার কার্য্য হইল। এইরূপে যখন যোগশিক্ষার্থীর চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ সমস্ত ভিতরে গেল, তখন অধ্যাপক ছাত্রকে বলিলেন, তুমি এতকাল কঠোর সাধনের পর শাস্ত্রার্দ্ধ পাঠ করিলে, নিরাকারে নিরাকারকে প্রত্যক্ষ দেখিতে শিখিলে; কিন্তু অপরার্দ্ধ এখনও বাকি আছে। পথিক, যে স্থান হইতে আসিয়াছ, আবার সেই স্থানে যাও। কুমন্ত্রানুগামী এই স্থানেই বাস করে। সে বলে, অসার ছাড়িয়া নিরাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এইত যোগ; কিন্তু যাঁহারা সুমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা এই অর্দ্ধপথে বসিয়া থাকেন না। তাঁহারা জানেন, আবার পর্য্যটন করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় বারে ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে হইবে। এতকাল দ্বার বন্ধ করে সংসার হইতে পলাইয়া, এক প্রকার বনমধ্যে অমিশ্রিত নিরাকার সাধন হয়েছে, এখন সেই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ঘট শূন্য করা, খোসা হইতে শস্য খুলিয়া নেওয়া, ধার করে বড় হয়েছিল যে জগৎ, সেই ধার কেড়ে নেওয়া, দেহ হইতে প্রাণ বাহির করে নেওয়া, সংসারকে শ্মশান করা, ঘর ছেড়ে দেওয়া, প্রথম সাধন। আবার ব্রহ্মরূপ বারি দ্বারা সেই ঘট পূর্ণ করা, ভিতর থেকে সেই নিরেট নিরাকার বস্তুকে এনে, তাহা দ্বারা সেই শূন্য খোসা পূর্ণ করা, আবার কর্জ্জ দিয়া পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য মহিমা বৃদ্ধি করা, আবার সেই মৃত দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা, আবার গৃহে প্রত্যাগমন করা, যোগের দ্বিতীয় সাধন। প্রথমে যে বস্তু স্পর্শ করা হইত তাহা শীতল, মৃতদেহের উপর হস্ত স্থাপন, কিন্তু

যোগশিক্ষার্থী যখন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই মৃতদেহ পুনর্জীবিত এবং উত্তপ্ত হইয়া জীবনকে অনুভব করাইয়া দিতে লাগিল। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী তৃণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, জীবন্ত ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান এই তৃণ মধ্যে। প্রথমাবস্থায় সাধকের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অসার, অসার, অসার, মৃত্যুর ছায়া, অপবিত্র, ঘৃণিত, দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু সার, কেন না প্রত্যেক বস্তু সেই সারাৎসার নিরাকার ঈশ্বরের বাসস্থান। জগতের কোন রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয় নাই, কিন্তু যোগীর অন্তরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় বাহির হইতে ভিতরে গিয়া নিরাকার সাধন আবশ্যক, তখন বাহিরের ভয়ানক কোলাহল মধ্যে ব্রহ্মের শব্দ শুনা যায় না; কিন্তু একবার ভিতরে গিয়া ব্রহ্মের কথা শুনিয়া আসিলে পরে বাহিরের কোলাহল মধ্যেও ঈশ্বরের কথা শুনা যায়। প্রথমে জড়কে অসার, অসৎ বলিয়া ভিতরে চলিয়া যাইতে হয়; কিন্তু ভিতরে নিরাকার বস্তুকে ধারণ করিয়া আসিলে, আবার নিজের আত্মা, পরমাত্মা এবং জড় এই তিনই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তখন পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়, ঈশ্বর একমাত্র পূর্ণ সত্য, তাঁহার অধিষ্ঠানে জীবাত্মা সত্য এবং জড়ও সত্য। জড় অসার নয়, কখনও অসার হয় নাই, কখনও অসার হইবে না। অসার বলি কখন, যখন আমরা তন্মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতে পাই না। যখন যোগবলে দেখিবে যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তেজস্বী ঈশ্বর বর্ত্তমান, তখন ব্রহ্মাশ্রিত সমুদায় বস্তু ব্রহ্মজীবনে সঞ্জীবিত। তখন চক্ষু কর্ণ খোলা থাকুক সমস্ত দিন, কিছু ভয় নাই। তখন জগৎ স্বচ্ছ, তখন জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়া যোগীর চক্ষু জগতের কর্ত্তাকে দেখিতেছে, জগৎ আর শত্রু নহে, মিত্র। জগৎ

বস্তু কি অবস্তু, প্রকৃত যোগশাস্ত্রে এই প্রশ্নই আসিতে পারে না। জড় আছে কি নাই, সেখানে এ বিবাদ নাই। এ সমুদয় নিষ্পত্তির পর যে উচ্চ ভূমিতে আসা যায়, তাহার উপরে যোগশাস্ত্র নির্ম্মিত হয়। যোগভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে,—আমি, জড় এবং ঈশ্বর,—এ তিনই সত্য। যোগশাস্ত্রের এই সুন্দর প্রশ্ন, জগৎ স্বচ্ছ, না অস্বচ্ছ? প্রত্যেক জড় ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় কি না? প্রথমে মন্দির পরিষ্কার করা হইল, আবার সেই মন্দিরে ব্রহ্মকে স্থাপন করা হইল। এখন তোমার চক্ষু খুলিতে ভয় কি? যে ঘর শূন্য ছিল, তাহার মধ্যে আবার ঠাকুর আসিয়াছেন। বাহিরের জড়াকাশে, ভিতরের সেই চিদাকাশে, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, নরনারী সকলের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব। স্মরণ রেখো, জড়াকাশে চিদাকাশে, দুই আকাশ এক হয়ে গেল। হয়। কেবল মতে নাই, জ্ঞানে জ্ঞানী লক্ষ লোক; কিন্তু যোগে যোগী একজন। একটি শস্য হাতে লও, যদি তাহার মধ্যে ব্রহ্মকে না দেখ, শস্যকে অসার, অসৎ বলিয়া ফেলিয়া দাও; সেই শস্যও জঘন্য, তুমিও জঘন্য, দুইই জঘন্য। আবার যোগ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই শস্য হাতে লও, দেখিবে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম বসিয়া আছেন; সেই ক্ষুদ্র শস্য ব্রহ্মের মন্দির, সেই শস্যকে গড়াইয়া দাও, ব্রহ্মমন্দির গড়াইয়া যায়। বায়ুকে গাত্র স্পর্শ করিতে দাও, পুষ্পের সৌরভকে তোমার নাসিকাকে আমোদিত করিতে দাও। শরীর যদি আঃ! বলে, যোগীর মন তাহার মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শ এবং ব্রহ্মের সৌরভ পাইয়া কতবার আঃ! বলিবে। তাহা নহে, তাহা নহে, তাহা নহে, যোগশিক্ষার্থী, এ শূন্য, শুষ্ক, বিফল জ্ঞান নহে। যেমন এতকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিরাকারে নিরাকারকে দর্শন করিলে, তেমনি চক্ষু খুলিয়া সাকারে নিরাকার

দর্শন কর। যেখানে একটি জড়ও নাই, সেখানে নিরাকারকে দেখা সহজ, অন্ধকার দেখা সহজ, অন্ধকারে অন্ধকার দেখা সুলভ; কিন্তু জ্যোতিতে অন্ধকার দেখাই কঠিন। যোগসাধনের প্রথমাবস্থায় সাধক তৃণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তৃণ! তুমি কে? তৃণ বলিল, আমি তৃণ; তাহা আমি জানি। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় পরিপক্ব যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তৃণ, তুমি কে? তন্মধ্যে ব্রহ্ম বলিলেন, "আমি আছি তৃণ মধ্যে"। তৃণ কি কথা কহে? যোগবল এমনই বল, সাকারকে ভেদ করে অতীন্দ্রিয় নিরাকার বস্তু উদ্ভাবন করে। ইহা অদ্বৈতবাদ কিম্বা পৌত্তলিকতা নহে। যোগের পথে প্রথমাবস্থায় জড়ের প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি; কিন্তু পরিপক্বাবস্থায় জড়ের মধ্যে ব্রহ্মের সুনির্ম্মল মধুময় আবির্ভাব। মূঢ়ের কাছে জড়ের নাম স্বপ্রকাশ, ঈশ্বরের নাম অপ্রকাশ। যোগীর নিকটে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, জড় অপ্রকাশ। এই যে যোগের প্রথম গতি এবং শেষ গতি, এই দুয়ের মিল হয়। প্রথমে দেখিয়াছিলে জগতের সমুদায় ঘট শূন্য, এখন দেখিতেছ ব্রহ্মজলরাশিতে সমুদায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। যদি বুঝিতে পার, এর ভিতরেও কিছু জড় আছে, বস্তু ছাঁকিতে জান, আবার ছাঁকিয়া লও, আবার বাহিরের জগৎকে অসার জানিয়া ভিতরে যাও। বুঝেছ? যে পর্য্যন্ত ভূলোক, দ্যুলোক, শীত, গ্রীষ্ম, নর নারী সমুদায় বস্তু ব্রহ্মের উদ্বোধক না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভিতরে বাহিরে যাতায়াত কর। যাবতীয় বস্তুতে ব্রহ্মের গাঢ় ঘন আবির্ভাব দেখিতে হইবে। তৃণও বাদ যাবে না, সূর্য্যও বাদ যাবে না; এক বিন্দু জলও বাদ যাবে না, আবার সমুদ্রও বাদ যাবে না। এইরূপে সমস্ত জগৎ যথন ব্রহ্মের আবাস স্থান হইবে, তখনও যোগশিক্ষার শেষ হইবে না, কেন না যোগের উন্নতির শেষ নাই। যোগশিক্ষার্থী, তুমি যোগের

আদর্শ পেলে। যোগ কি, যোগের পথ কয়টি, যোগের আদর্শ কি, এ সকল জানিলে; অতঃপর যে সকল সাধনে এই আদর্শ লাভ হইবে, তাহা কথিত হইবে।

যোগের পথ দুইটি, যথা, (১ম) বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া এবং (২য়) ভিতর হইতে বাহিরে আসা।

কিন্তু সাধন তিন প্রকার যথা;—

(১ম) জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ, (২য়) অন্তরে নিরাকার পরম পদার্থকে অনুভব করা এবং (৩য়) সেই অসার জগতের মধ্যে পুনর্ব্বার সার পরম বস্তুকে বর্ত্তমান দেখা।

স্মৃতি।

কলুটোলা, ১০ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২২শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম, অদ্য সাধনরীতি-বিষয়ক প্রসঙ্গ হবে। ভক্তি কি, এবং ভক্তি-লাভের জন্য দেবপ্রসাদ মনুষ্যের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন, এ সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ, এখন সাধনপ্রকরণ-বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি কি স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ? স্মৃতি-শাস্ত্র কি? স্মরণমূলক জ্ঞান। একটু স্থির হও। ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে, "সত্যং শিবং সুন্দরম্" ভক্তির বীজ-মন্ত্র। কিন্তু ভক্তির ভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই সাধক শ্রদ্ধার দ্বারা "সত্যম্‌কে" ধারণ করেন। বাস্তবিক "শিবম্" এই স্বরূপ হইতেই ভক্তিশাস্ত্র আরম্ভ হয়। শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলময় প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রেম দ্বারা ধারণ করাই ভক্তির আরম্ভ। এই প্রেম দ্বারা যে "শিবম্‌কে" ধারণ করা, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। শ্রবণ কর, স্মৃতিশাস্ত্র

প্রেমতত্ত্বসম্বন্ধে কি বলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, যখন এই জ্ঞানোদয় হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সাধারণরূপে এবং বিশেষরূপে যে সমুদায় ঘটনাতে তাঁহার দয়ার প্রকাশ দেখিয়াছ, সেই সমস্ত স্মরণ করিতে হইবে। বিধাতা নানা প্রকার সুখদ ও মঙ্গলকর বস্তু সকল সৃজন করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা আমাদের ঐহিক ও মানসিক সুখ হইবে; ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল, রোগের সময় ঔষধ লাভ করিব। বারম্বার এ সকল বিষয় অনুধাবন ও সমালোচনা করিয়া "শিবম্" যে ঈশ্বর, তাঁহাকে মনের কাছে প্রতিপন্ন করিবে। প্রথমতঃ সাধারণ রক্ষণপ্রণালী দ্বারা ঈশ্বর জীবের অর্থাৎ তোমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিশেষ ঘটনা দ্বারা তিনি তোমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সে সকল স্মরণ করিবে। আমি অত্যন্ত ভয়ানক দুর্বিপাকে পড়িয়াছিলাম, সেই সময় কেমন অত্যাশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আমাকে রক্ষা করিল; আমি মরিতেছিলাম, তখন কেমন চমৎকার কার্য্য দ্বারা তিনি আমাকে বাঁচাইলেন; এবম্বিধ বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী স্মরণ করা স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ। জীবনের এই সকল বিশেষ ঘটনা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু তাহাদিগকে স্মৃতির পথে আনিতে হইবে। বিস্মৃতি এখানে পাপ, ঈশ্বরের সাধারণ এবং বিশেষ দয়া বিস্মরণ ভক্তিশাস্ত্রমতে অতি দূষণীয় ব্যাপার; অতএব যদি বিস্মৃত হয়ে থাক, বারম্বার আলোচনা দ্বারা সেগুলি সমালোচনা কর। জীবনের ইতিবৃত্ত মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা—সেই আমি অসহায় ছিলাম, কে আমার হস্ত ধারণ করিলেন; সেই যখন দুই পথের সন্ধিস্থলে পড়িয়া কোন পথে যাইব বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তখন কে জ্ঞান দিলেন; কাহার কৃপাতে সংসারাসক্তি হইতে রক্ষা পাইলাম? একা ছিলাম, একাকী ব্রহ্মের দুর্গম পথে চলা অসম্ভব

হইত, কোন্ সূত্রে একটি একটি ধর্ম্মবন্ধু এনে দিলেন, কোন্ সূত্রে এই দীক্ষার ব্যাপার হইল,—এ সমুদায় ঘটনা স্মরণ করিবে। আমার ঈশ্বর অমুক সময় বিপদভঞ্জন হইয়া আমাকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, অমুক সময় পতিতপাবন হইয়া আমার গূঢ় পাপ হরণ করিলেন, অমুক সময় গুরু হইয়া আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এই ভাবে স্মরণ করিবে; বলো না মনে নাই। ভক্তিশিক্ষার্থী যখন হয়েছ, তখন মনে রাখিতেই হইবে। স্মৃতিশাস্ত্র সামান্য শাস্ত্র নহে। স্মরণ করে শিক্ষা, শুনে শিক্ষা অপেক্ষা অত্যন্ত উপকারী। ধর্ম্মজীবনের অনেক দুরবস্থা হয় কেবল বিস্মরণ বশতঃ। কি উপায়ে হৃদয়ের প্রেমকে সজীব রাখা যায়, ঈশ্বর সেই বিষয়ে সঙ্কেত বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভুলিয়া যাওয়াতে অন্তরের প্রেম শুকাইয়া গেল। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের উদয় হয়। অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় নব জীবনের সঞ্চার হয়। যাহারা স্মৃতি-শাস্ত্রকে লঘু মনে করিয়া তাহার অবমাননা করে, তাহাদের অনেক দুর্গতি। বিপদও স্মরণে রাখিবে, উদ্ধারও স্মরণ করিবে, অন্ধকারও স্মরণ করিবে, জ্যোতিও স্মরণ করিবে। যতই স্মরণ করিবে, ততই প্রেমে হৃদয় কোমল হইবে, কঠোর চক্ষু বিগলিত হইবে। অনেক লোক কিছুকাল ধর্ম্মপথে চলিয়াও আবার বিষয়ী, সংসারী এবং অধার্ম্মিক হয়, কেবল স্মরণ করে না বলিয়া। স্মরণ কর, সেই ঈশ্বর জননী হইয়া তোমাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া কতবার কত সুধা দিলেন। জ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিতে বলিতেছি না; সর্ব্ব প্রথমে অতি সহজ কথা এই বলিতেছি, স্মরণ কর, ভুলো না। এই শাস্ত্র অতি সামান্য, অতি সহজ। মূঢ় মন, স্মরণ কর। কিন্তু মনুষ্যের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, অতি সহজ বলেই স্মরণশাস্ত্র আদৃত হয় না।

মূঢ় অভক্ত অতি সামান্য নিকৃষ্ট শাস্ত্র মনে করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রকে অবহেলা করে। ঈশ্বর কেমন অমুক দিন এই করিলেন, আর একদিন এই করিলেন, এ সমুদায় স্মরণ করিবে। জীবনের বিশেষ ঘটনা সকল লিখো। ঈশ্বরের দয়ার আশ্চর্য্য ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। দেখাও ঈশ্বরকে তোমার স্মৃতিশক্তির সৌন্দর্য্য, যিনি সেই শক্তির নির্ম্মাতা। প্রেমময়ের মঙ্গল ঘটনা সকল স্মরণ কর, ভক্তিরাজ্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর। ঐ মাসে কি হইয়াছিল, ঐ বৎসর কি হইয়াছিল, এইরূপে ক্রমাগত একটির পর আর একটি স্মরণে আসিবে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সকল ঘটনা, যাহাতে ঈশ্বরের দয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে, অতি আদরের সহিত সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবে। আজ এই স্মৃতিশাস্ত্র বলা হইল, দ্বিতীয় বিভাগ দর্শনশাস্ত্র পরে বর্ণিত হইবে।

বৈরাগ্য

কলুটোলা, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, এক বার সংসার ছাড়িতেই হইবে। সংসারে থাকিয়া যদি যোগী হইবে, সংসার ছাড়িয়া যোগ শিক্ষা করিতে হইবে। যোগীর যে প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া যাওয়া, এইটির নাম বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী যে অন্তরের মধ্যে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন, শ্রবণ এবং সম্ভোগ করেন, তাহার নাম নিরাকার সাধন। তৃতীয় অবস্থায় সেই নিরাকারকে বহির্জ্জগতে প্রতিষ্ঠা করা, তাহার নাম সাকারে নিরাকার সাধন। প্রথম বৈরাগ্যকে বন-গমন অথবা মনোগমন বলা যায়। প্রকৃত যোগীর পক্ষে মনোগমনই

যথার্থ কথা। বন কি? যেখানে সংসার নাই, সংসারের অতীত, সংসার হইতে বহু দূরে যে স্থান, তাহাই বন; সেই স্থান বাহ্য বন নহে, মনে। সংসারী বিষয়ীরা সেখানে যাইতে পারে না। ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি লইয়া প্রিয় সংসারকে অসার বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে দিন আরম্ভ হয়, সেই দিন সন্ন্যাসাশ্রম, বৈরাগ্যজীবন, অথবা যোগশাস্ত্রপাঠের প্রথম পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অসার স্থানে থাকিব না, অসার খাওয়া খাইব না, অসার সুখ ভোগ করিব না, সার জগতে যাইব, সার বস্তু দেখিব, সার পদার্থ ভোগ করিব, এই সংকল্পে বৈরাগ্যের আরম্ভ হয়। যোগগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই প্রকার। এক জ্ঞানগর্ভ, এক ভাবগত। কে সন্ন্যাসী হইল? বনে যায় কে? আধ্যাত্মিক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে কে? তাহার নাম কি? ধর তাহাকে। দেখিবে দুই জন। কিন্তু দুই জনে আবার এক জন। এক মন, আর এক হৃদয়; এক বুদ্ধি, এক ভাব; এক সংস্কার, এক অনাসক্তি; এক অসার জ্ঞান, এক তিক্ত জ্ঞান। যে লোক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার এক বুদ্ধি, এক ভাব; অর্থাৎ বৈরাগী দুই প্রকার। জ্ঞানবৈরাগী এবং ভাববৈরাগী। জ্ঞানবৈরাগী কে? যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন, এ সংসার অসার। এ সোণা নহে গিল্‌টি করা। এই যে পৃথিবীর মান সম্পদ্ সমুদায় গিল্‌টি করা। বুদ্ধি-বন্ধু অনুসন্ধান এবং আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এই সংসারের যত কিছু দেখিতেছি, সকলই অসার জিনিস। একটি উৎকৃষ্ট কষ্টি পাথর আছে বুদ্ধির হাতে, তাহার নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কেহ সঙ্গে যায় না। যাই দেহত্যাগ, অমনই সর্ব্বত্যাগ। সেই কষ্টি পাথরে জগৎকে ঘষ, জানিতে

পারিবে, এ সংসার অসার গিল্‌টি। বৈরাগ্যজ্ঞানে জানিতে পারিবে, এই যে সংসারের এত সুখ, এ কিছুই নহে। এইত মায়া প্রবঞ্চনা, মৃত্যু হইলেই ত এরা তোমাকে ছাড়িয়া দেয়। একটি প্রশ্ন দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে। মৃত্যুর পর তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? সংসার বলিবে, না। তুমি বলিবে, সংসার, তবে তুমি আমার নহ। সংসারের বাহিরে এত চাক্‌চিক্য, কিন্তু ভিতরে ভূয়ো। এক কষ্টি পাথর চক্ষু নিমীলিত করা। চক্ষু বুজিলেতো কিছুই কিছু নহে। এত যে টাকা, এত যে মান সম্ভ্রম, কিছুই নহে। আর এক কষ্টি পাথর মৃত্যু। মৃত্যু-চিন্তাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিছুই কিছু নহে। এইরূপে সাধক, তুমি বুদ্ধিগত বৈরাগ্য সাধন কর। কোথায় বসিয়া আছি? ছায়ার উপরে। কি দেখিতেছি? কি করিতেছি? ছায়া, সকলই ছায়া, সকলই অসার। এখন ঈশ্বরকে ইহার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে না, অসার সংসার খোসার ন্যায় পড়িয়া আছে, সংসার এই আছে এই নাই। জ্ঞানগত বৈরাগ্য নিশ্চিত বৈরাগ্য; কিন্তু কিছু কঠোর, কেবলই বুদ্ধি জ্ঞান চিন্তা দ্বারা জানিতে হয়, এই সংসারে পরমার্থ নাই, সকলই অপদার্থ। দ্বিতীয় বৈরাগ্য কি? ভাবগত বৈরাগ্য। হৃদয়ে বৈরাগ্য হবে। হবে কিরূপে? মন বলিল, ওরে সংসারে যে সকল দেখিতেছ, এরা সব অসার, প্রবঞ্চনা, মায়া; হৃদয় বলিল, যাহা হউক, আমার ভাল লাগিতেছে না, এ সব তিক্ত। মন বলিল, এরা যতক্ষণ থাকে, কেবল জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মন এবং হৃদয়, বুদ্ধি এবং ভাব দুইই সংসার ছাড়িয়া বাহির হইল। সুমিষ্টরসস্পৃহা হৃদয়ের পক্ষে স্বাভাবিক, সে তিক্ত রস পান করিয়া কেমন করিয়া চরিতার্থ হইবে? অসার সংসারে অনেক ধন মান সম্ভ্রম প্রচুররূপে উপার্জ্জিত হইল; কিন্তু উদর খেয়ে খেয়ে, ভোগ করে করে বলিল, ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়

চরিতার্থ করা আর তার পক্ষে সুখ হল না। তুমি যদি বৈরাগ্য সাধন কর, দেখিবে দুইই হইল কি না। জ্ঞানগত বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত সহজ, ভাবগত বৈরাগ্য সকলের হয় না। এই সংসার অসার, অতএব ইহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত। ভাববৈরাগী, ভাব-সন্ন্যাসী যাঁরা, তাঁরা এই "অতএব" গ্রাহ্য করেন না। উচিত বোধে ভাল জিনিস না খাওয়া, আর ভাল জিনিসে রুচি না থাকা, এ দুই স্বতন্ত্র। অধিক টাকা উপার্জ্জনে কি ফল, এই প্রকার উচিত মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে না; কিন্তু অনেক টাকা পেলে কি তোমার বিতৃষ্ণা হয়? আজ তুমি পর্ণকুটীরবাসী; কিন্তু কাল যদি অট্টালিকা পাও, তাহাতে কি তোমার আসক্তি হবে না? ভাববৈরাগীকে সংসারের সুখ কামড়ায়, দংশন করে, বিষের ন্যায় জ্বালাতন করে। এই বৈরাগ্য এখনও বহুদূর। সুখে সুখী নয়, সুখের সংস্পর্শে জ্বালা। খুব ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সংসারের উচ্চ অবস্থা সূচের ন্যায় তাহাকে বিদ্ধ করে। সুখের জ্বালায় অস্থির হইয়া মন আপনি বনের দিকে গমন করে। এই যে হৃদয়ের ভিতরে সুখের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা অনাসক্তি, এই ভাব প্রকৃত বৈরাগ্য মধ্যে অবশ্য স্থান পায়। জ্ঞান-বৈরাগ্য বলিয়া দিল, ছায়া ছাড়, মায়া ছাড়; আর হৃদয়বৈরাগ্য বলিতেছে, এই মায়া দংশন করিতেছে, সূচের মত বিদ্ধ করিতেছে, গেলাম রে! মলাম রে! খুব ভাল খাদ্য নিকটে প্রস্তুত, খুব ভাল পরিচ্ছদ নিকটে উপস্থিত, হৃদয়বৈরাগী বলিল, যন্ত্রণা, জ্বালা এসেছে, ভাল খাদ্য, ভাল পরিচ্ছদের বেশ ধরে। সাধনের প্রথম পরিচ্ছেদ এই বনে গমন,—অরণ্যে বাস নহে,—হৃদয়কাননের ভিতর কিছুকাল সাধন করা। ইহার পক্ষে সহায় জ্ঞানবৈরাগ্য এবং হৃদয়বৈরাগ্য।

সংসারে যে পুনরায় আসিবার কথা হয়েছিল, তাহাও এই বৈরাগ্যের

সঙ্গে মিলিবে। ভিতর হইতে উন্নত বৈরাগী হইয়া আসিয়া কেমন করিয়া সংসারে কার্য্য করা যায়, তাহা পরে শুনিবে।

এখন এই দুইটি সাধন করিবে ;—সংসারের সুখকে যাহাতে অসার জ্ঞান হয়, আর যাহাতে ভাল না লাগে। যদি ভাল জায়গায় থাকিতে হয়, ভাল খাদ্য খাইতে হয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে করিবে।

দর্শন।

কলুটোলা, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ; ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, প্রেমতত্ত্বের দুই বিভাগ ইতিপূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছ। "শিবম্" যিনি, তাঁহাকে প্রেম দিতে হয়। শিবম্ প্রেম ভক্তির প্রথমাবস্থা। মুগ্ধ হওয়া পরিপক্কাবস্থা। সেই যে শিবম্, তৎসম্বন্ধে দুই শাস্ত্র ; এক স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। যে সকল দয়াব্যঞ্জক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করিয়াছেন, সে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সমুদায় পাঠ করিলে কৃতজ্ঞতা, প্রেম এবং ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সে সকল ঘটনা যত বিস্মৃত হবে, তত তোমার প্রেম, কৃতজ্ঞতা দুর্ব্বল হবে। সে সমস্ত পুনরাবৃত্তি অথবা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয়। ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি মানুষকে কখন ভালবেসেছ? তাহা হইলে শিবের প্রতি কিরূপে প্রেম স্থাপিত করিবে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষা সহজে লাভ করিতে পারিবে। দুইয়েরই নিয়মের সাদৃশ্য আছে। কাহার কতকগুলি হিতকর কার্য্য দ্বারা উপকৃত হইবার পূর্ব্বে, কোন মানুষকে তুমি কখন ভালবাস নাই। একদিন তোমার ঘরে অন্ন ছিল না, সে ব্যক্তি অন্ন দিলেন ; অন্য দিন বস্ত্র ছিল না, তিনি বস্ত্র দিলেন ; আর এক দিন রোগে কাতর হইয়া-

ছিলে, তিনি ঔষধ দিলেন; অপর এক দিবস, শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া সান্ত্বনাহীন অধীর হইয়াছিলে, তিনি আসিয়া বন্ধুভাবে তোমার হিতসাধন করিলেন; এই চারিটি দয়ার কার্য্য বারংবার ক্রমাগত স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি তোমার মনে ভালবাসা হইল। যতবার সেই সকল কথা স্মরণ হয়, ততবার তোমার কৃতজ্ঞতা প্রেম উজ্জ্বলতর হয়। কিন্তু যে কাজ, সেই কি মানুষ? সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়েছে যে লোক থেকে, সেই লোকের উপরেই ভালবাসা যায়। এক ব্যক্তি তোমার অজ্ঞাত এবং তোমা হইতে দূরে থাকিয়া তোমার উপকার করিলেন, সেই দূরস্থ অলক্ষিত ব্যক্তির প্রতিও প্রেম হয়। উপকৃত হইলেই উপকারী বন্ধুকে ভালবাসা দিতে পার। কার্য্য হইতে প্রেম সমুদিত হয়, কার্য্যকারী ব্যক্তিতে তাহা নিবদ্ধ হয়। কাজেতে জন্ম হইল, বসিল কিন্তু সেই লোকেতে। কেন হইল? মনোবিজ্ঞানের নিয়মে। ভালবাসাই ভালবাসাকে জন্মায়। হাত ভাল বাসে না, কাজগুলি একটি ভাবের বাহ্য নিদর্শন। আমাদের ভালবাসা, সেই কাজে প্রকাশিত ভালবাসার উৎস যেখানে, সেখানেই যায়। যেখানে দেখি ভালবাসার সহিত কাজ করা হয়েছে, সেখানেই প্রেমের উদয় হয়। একটি ব্যক্তিতে সেই ভালবাসা আছে জেনে তাঁহাকেই ভালবাসা দেওয়া হয়। সেই লোকটির কাছে অমুক দিন এই উপকার পেয়েছি, অমুক অবস্থায় এই উপকার পেয়েছি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার প্রতি প্রেম হয়। যদি মানুষকে ভালবেসে থাক, ইহার সাক্ষী হতে পারিবে। যখন একবার তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিলে, আর যদি তিনি কাজ নাও করেন, তথাপি তাঁহাকে ভালবাসিবে। যদি আরও কাজ করেন, আরও ভালবাসা বাড়িতে পারে; কিন্তু যে ভালবাসা হয়েছে, তাহার আর বিনাশ নাই। তিনি কাজ করুন না

করুন, তাঁহাকে কাছে দেখিলেই তোমার প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত প্রেমের আনন্দ হইবে। আগে কাজের প্রমাণেতে তাঁহ যখন তার প্রতি প্রেম নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি যে তোমাকে ভালবাসেন, তাহার আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। এইটি সংলগ্ন কর ঈশ্বরেতে। ঈশ্বর কেন আকাশে চন্দ্র সৃজন করিলেন? কেন পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিলেন? কেন পর্ব্বত, সমুদ্র রচনা করিলেন? কেন পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব দিলেন? যিনিই হউন, যোগী হউন, ঋষি হউন, ভক্ত হউন, প্রথমে এ সকল প্রশ্ন করিয়া, দয়ার এ সকল বাহ্য ক্রিয়া দেখিয়া, ঈশ্বরের দয়া সাব্যস্ত করিতে হয়। আকাশে, জলে, স্থলে, জীবনে, বন্ধুতায়, এ সকল দয়ার লক্ষণ দেখিয়া বিশ্বাসী ভক্ত বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বর আমাকে ভালবাসেন। এ সকল ঘটনা সঞ্চয় করে কি স্থির হল? যিনি এতগুলি ব্যাপার করেছেন, তিনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রেমিক। এই সমুদায় প্রমাণ নিয়ে যখন স্থিরসিদ্ধান্ত হল, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, আমার প্রতি তাঁহার প্রেম আছে, তখন সহজেই আমার ভালবাসা তাঁহাতে গিয়া পড়ে, আর কাজ দেখিতে হয় না। তখন আর স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা তাঁহার দয়া আলোচনা করিতে হয় না, তখন দর্শন আরম্ভ হয়। আর "অতএব" প্রণালী দিয়া ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিতে হয় না। এখন মন নিশ্চয় জানিয়াছে যে, তিনি দয়াময়। এখন দয়ার ঠাকুর কাছে এলেই হইল। তারপর, জগৎপতি, জগৎপিতা ভক্তের কাছে এলেন। এ সমুদায়ত ইনি করেছেন? ইনিইত বিপদ দেখ্‌লে উদ্ধার করেন? এই বল্‌তে বল্‌তে অমনি প্রাণ বল্‌লে, "নাথ, তুমি অত্যন্ত প্রেমময়, তুমি শিব।" এতদিন স্মৃতিশাস্ত্রমতে 'শিবম্' তিনি এই তৃতীয়ব্যক্তিবাচক ছিলেন, এবং চিন্তা ও স্মরণের

বস্তু ছিলেন; এখন দর্শনশাস্ত্রমতে, শিবম্ দ্বিতীয়ব্যক্তিবাচক নিকটস্থ 'তুমি' হইলেন। দর্শনের সময় ভক্ত তাঁহার অন্য কোন দয়ার কার্য্য দেখিতে চান না, তাঁহার আর কিছুরই দরকার হয় না, তিনি বলেন, আমি কেবল তোমার দর্শন চাই। যিনি আগে এত দয়ার কার্য্য করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে এখন অকারণে ভালবাসা, দর্শনের আরম্ভ। পূর্ব্বে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, ইনি আমাকে ভালবাসেন, সেই প্রমাণিত দয়ার জন্য এই উপস্থিত ব্যক্তিকে ভালবাসা। দর্শনশাস্ত্রে প্রেম কি? কেবল দেখিবামাত্র প্রেমের উচ্ছ্বাস। সেই তিনি আমার সাম্‌নে এসেছেন, এই বল্‌তে না বল্‌তেই প্রেমে মূর্চ্ছা! তিনি কবে কি করেছেন, ভাব্‌তে হয় না। চিন্তা করে প্রীতি দেওয়া স্মৃতিশাস্ত্র, দেখে প্রেম দেওয়া দর্শনশাস্ত্র। পৃথিবীতে যেমন মায়ের প্রতি ভক্তি হওয়ার পর মাকে দেখ্‌লেই মন পবিত্র, ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বর কেবল ভক্তের সমক্ষে এসে বসেছেন, আর ভক্ত ক্রমাগত দেখ্‌ছেন আর ভালবাসছেন। কেবল দেখা, আর কোন প্রমাণ নাই। সেই মুখের ভাব ভঙ্গীতে প্রেমের লক্ষণগুলি ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, আর ভক্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। শিশুকালে দেখ্‌লাম, মার হাতটি নড়িল, আর ভাত মুখে তুলে দিলেন, এইজন্য মাকে ভক্তি দিলাম; কিন্তু তার পর মা মুখে ভাত তুলিয়া না দিলেও, কেবল তাঁহাকে দেখিয়া ভালবাসিতে লাগিলাম। সেইরূপ যখন ঈশ্বরদর্শন লাভ হইল, তখন এতগুলি দয়ার কাজ, অথবা অনন্তকাল দয়ার কাজ দেখিলে যে প্রেম হবে, কেবল একবার সেই প্রেমমুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রেম হবে। সেই প্রেমমুখের ভিতরে, সেই প্রেমনয়নের মধ্যে যখন দৃষ্টি প্রবেশ করিল, তখন কেবল একবার দেখা আর প্রেমে মোহিত হওয়া, কাজের জন্য অপেক্ষা কর্‌তে হয়

না। যখনই তাকাইলে, তখনই প্রেম। কাজ হল প্রেমের প্রকাশ, যাহা স্মৃতিশাস্ত্রের অবলম্বন। দর্শনশাস্ত্রে প্রেমের কাজ নহে; কিন্তু প্রেমই দেখ্‌চ, যিনি কাজ করেন, তাঁহাকেই দেখচ। এই দর্শনটি সাধন কর্‌তে হবে। যখন প্রাণ শুষ্ক হইবে, তৎক্ষণাৎ অন্তরে একবার প্রেমনয়নে সেই প্রেমময়ের প্রতি দৃষ্টি করিবে, এই দর্শন সমস্ত মরু-ভূমিকে প্রেমে প্লাবিত করিবে। এই দর্শনের সময় ঈশ্বরকে ভক্ত বলেন, তুমি বস, আর আমি বসি, তুমি তাকাও, আর আমি তাকাই। তাঁহার দৃষ্টি আমার দৃষ্টির উপরে, আমার দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির উপরে। খুব ঠাউরে দেখ্‌বে। যথার্থই এই মুখে প্রেম আছে, এই চক্ষে প্রেম আছে। আমাকে পাপী জেনেও, এমন করে আমার প্রতি দিন রাত তাকাইয়া আছেন। স্নেহভরে চেয়েই আছেন, তবে আমি আরও তাঁহাকে দেখি, আরও ঐ নয়ন দেখি। এইভাবে বারম্বার দেখিতে দেখিতে প্রাণ মন একেবারে প্রেমে বিগলিত হইয়া যাইবে।

বৈরাগ্য।

কলুটোলা, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্য শিক্ষা কর। প্রকৃতরূপে বৈরাগ্য শিক্ষা না করিয়া যদি ভিতরে যাও, আবার সংসারে প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। এখানকার বিষয় সকল সংযত করিয়া না গেলে আবার ইহারা তোমাকে সংসারে টানিয়া আনিবে। সোলা কি জান? ইহার অত্যন্ত বড় এক খণ্ড নিয়ে অনেক দূর জলের নীচে যাও, সেই সামগ্রী এত হাল্কা যে, তাহা ভাসিয়া উঠিবে। মনকে সেইরূপ তুমি ভিতরে মগ্ন কর, যদি লঘুত্ব থাকে, আবার ইহা ভাসিয়া উঠিবে। সংসারী বিষয়ী মন এত

লঘু যে, যতবার ইহাকে ভিতরে লইয়া যাইবে, ততবার ইহা আবার ভাসিয়া উঠিবে। গরু বাঁধা আছে দড়িতে, সেই গরু কি ঘুরিতে পারে না, দৌড়িতে পারে না? ঘুরে, দৌড়ে, অথচ একটি সীমার ওদিকে বেরোতে পারে না। মনরূপ গরুকে সংসার বেঁধেছে, কিন্তু ভ্রান্তচিত্ত লোকে মনে করে, আমিত নিজের ইচ্ছামত দৌড়িতে পারি। অথচ একটু ধর্ম্মের প্রগাঢ়তা যদি হয়, অমনি জানিতে পারে যে, একটি সীমার মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। এইজন্য বাহিরের রজ্জু কাট, যদি ভিতরে অনেক দূর যাবে। বৈরাগ্য নিতান্ত আবশ্যক। তোমার রাজ্য যদি সুশাসিত না হয়, ইন্দ্রিয়সকল যদি দমন না কর, সংসার যদি জিত না হয়, এ সকল দুর্জ্জয় রিপু তোমাকে আক্রমণ করিবেই; তুমি ভিতরে স্থির হয়ে শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না। আগে এ সকল বিদ্রোহী প্রজাদিগকে জয় করিয়া পরে ভিতরে গিয়া সাধন করিবে। বুদ্ধিগত যে বৈরাগ্য, তাহাও বিশেষরূপে সাধন কর। চক্ষু নিমীলনরূপ কষ্টি-পাথরের দ্বারা সংসারকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাকাও, আর চক্ষু নিমীলিত কর, বল এই আছে, এই নাই; বার বার বল, সেই বস্তু আছে আর নাই, ভেল্কী, যাদু। বস্তুভেদী জ্ঞান এক প্রকার আছে, উহা বস্তু ভেদ করে ভিতরে যায়। স্থূলদর্শী জ্ঞান বাহিরে বেড়ায়। তোমার জ্ঞান সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী হউক। তোমার জ্ঞান বস্তুর ভিতরে ব্রহ্মকে দেখুক। তীব্র জ্ঞানদৃষ্টিতে সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, অগ্নির অগ্নিত্ব দেখিয়া বাহ্য বস্তুর অসারতা প্রতিপন্ন করিবে। এই বিষয়ে ক্রমোন্নতি বিশ্বাস করিবে, একদিনে হয় না। যেমন ব্রহ্মদর্শন ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ সাধন দ্বারা জগতের অসারতা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারিবে। সহস্র লোক বলিবে, জগৎ অসার; কিন্তু সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন লোকে দেখে, জগৎ অসার।

তুমি অসার দেখিতে চেষ্টা কর। বুদ্ধিগত বৈরাগ্য দ্বারা এমনি নিশ্চিতরূপে জগৎকে অসার শ্মশান বলিয়া চলিয়া যাও যে, আর যেন এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয়, এবং হৃদয়গত বৈরাগ্য দ্বারা সংসারের প্রতি অনুরাগবিহীন হও এবং অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব কর। প্রথমতঃ ধনে, মানে, আহারে, পরিচ্ছেদে, কোন্ কোন্ স্থানে আসক্ত আছ, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহা দূর কর। যে সকল বস্তুতে অত্যন্ত সুখ বোধ হয়, সেই সুখের লোভ পরিত্যাগ কর। এই হৃদ্গত বৈরাগ্য সাধনের সময় একটি বিষয়ে মনোযোগ রাখিবে। অপক্কাবস্থায় উদারতা উচিত নহে। যেখানে সেখানে থাকি না কেন, যাহা তাহা পরি না কেন, কিছুতেই আমার যোগভঙ্গ হইবে না; প্রথমাবস্থায় কদাচ এই উদারতা উচিত নহে। আবাব চিরকালই যে এখানে থাকিব না, ঐ দ্রব্য খাব না, ঐ বস্ত্র পরিব না, ইহা করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ এই এই দ্রব্য খাইব, এই এই স্থানে থাকিব, এই এই লোকের সঙ্গ করিব, এ সকল নিয়ম আবশ্যক; কিন্তু চিরজীবন কঠোর তপস্যা-রজ্জুতে বদ্ধ থাকা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। প্রকৃত বৈরাগ্য একবার কঠোর সংযম দ্বারা সংসারবিতৃষ্ণা জন্মাইয়া, পরে ব্রহ্মের আদেশে, (সুখের ইচ্ছাতে নহে) সংসারের কর্ত্তব্যসকল পালন করে। প্রথমাবস্থায় দুঃখ তোমার গুরু, সুখ তোমার শত্রু; দুঃখ তোমার স্বর্গ, সুখ তোমার নরক; এই মূল নিয়মটি হৃদয়ে লিখে রাখ। লোভের বস্তু সমুদায় পরাজয় কর। খুব ভাল খাওয়ায় কাজ কি? খুব ভাল শয্যায় শোয়া কাজ কি? মান, অপমান কিছু নাই। এগুলি হবে অনেক বৎসর সাধনের পর। যাহাতে সুখ হয়, তাহাতে তিক্ত রস মিশ্রিত কর। সে ক্ষমতা ঈশ্বর দেন, যাতে সংসারের সুধার সঙ্গে তিক্তরস মিশ্রিত করা যায়। ধনমানেব প্রতি বিতৃষ্ণা চাই।

নাই ভাল আহার হইল, অসন্তোষ নাই; নাই ভাল বস্ত্র হইল, নাই ভাল শয্যা হইল, অসন্তোষ নাই। বৈরাগ্যের বিশেষ সাধন এই, লোকে যাতে বৈরাগ্যের ব্যাপার খুব কম দেখিতে পায়। দৃষ্ট বাহ্য বৈরাগ্য অপেক্ষা অদৃষ্ট আন্তরিক বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ; তুমি এই শেষোক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ কর। সেই বিতৃষ্ণাটি আনিবে, কিছুই ভাল লাগ্ছে না, আমি পলাইয়া ভিতরে যাই। এদের যন্ত্রণায় জ্বলে এমনি হবে যে, ভিতরে না গিয়া আর বাহিরে থাকিতে পারিবে না। যদি অধিক কথাতে সুখ হয়, অল্প কথা কহ; যদি অধিক খাওয়াতে সুখ হয়, অল্প আহার কর; এই সমুদায়ের মধ্যে মূল নিয়ম এইটি যে, কিছুতেই মৃত্যুরোগকে আনয়ন করা হবে না। সাধনের দোষে যাহারা রোগ গ্রস্ত বা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তাহারা বৈরাগ্যের মূলমন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রকৃত বৈরাগ্যে শুষ্কতা এবং বিকট ভাব নাই। ইহা শান্তি আর কান্তি। বৈরাগ্য সুন্দর, বৈরাগ্য শান্ত। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে দুঃখ নেবে কেন? দুঃখ নেবে না; কিন্তু দুঃখকে সুখ করে নেবে। সংসারের সুখকে জ্বালিয়ে তাহা হইতে খাদ বাহির করে নেবে। বৈরাগ্য-কড়াতে সংসারের সুখকে জ্বালাইলে তাহা হইতে ইহার অপকৃষ্ট অংশ বাহির হইয়া যাইবে, পরে যাহা থাকিবে—খাঁটি শান্তি। বৈরাগ্যের শেষাবস্থায় তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা দুই গিয়ে শান্তি আসিবে। ইচ্ছা করে এমন কষ্ট নেবে না, যাতে রোগ আসে। যদি লও, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হবে। যদি অসময়ে আহার করিলে রোগ হয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা জীবননাশ, বৈরাগ্যের মূল মন্ত্রের উচ্ছেদ।

অশ্রু।

কলুটোলা, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, প্রকৃত ভক্তি তবে শিব উপাসনাতে। স্মৃতি-শাস্ত্রে তাঁহার দয়া স্মরণ করিয়া এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে যে ভাব হয়, তাহার নাম ভক্তি। এই হইল 'শিবম্' মঙ্গলময়ের পূজা। এই যে প্রেম, এই যে মঙ্গল ভাব, এই ভাব ঘনীভূত হইয়া আছে যে ব্যক্তিতে, সেই মঙ্গলময় ব্যক্তিকে দর্শন করিলে, তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য আর তাঁহার মঙ্গল কার্য্য স্মরণ করা আবশ্যক হয় না। কাজের ভাব কমে যাবে, গুণের ভাব বৃদ্ধি হবে সেই ব্যক্তিতে। তিনি কখন কি করিতেছেন, তাহা দার্শনিক প্রেম দেখিবে না। কোন কার্য্যই ভাবিতে হয় না, কেবল তাঁহাকে দেখিলেই এই প্রেমের উদয় হয়। স্মৃতি দ্বারা প্রেম উদ্দীপন করা নীচ অধিকারীর কার্য্য। আমি ভালবাসিব না?—আমাকে যে খাওয়ালেন,—বাড়ী দিলেন, ধর্ম্ম দিলেন,—দর্শনশাস্ত্র এ সকল হেতু অপেক্ষা করিয়া প্রণয় স্থাপন করে না। উচ্চাধিকার যখন হইল, তখন ভক্ত বলেন, আমি ভাল না বেসে থাক্‌ব কেমন করে? এই অবস্থায় কেবল দর্শনমাত্রই প্রেম হয়। এই যে দেখিবামাত্র একটি ভাব হয়, তাহা শরীর মনকে অধিকার করে। সেই লক্ষণ দ্বারা, সেই ফল দ্বারা জানা যায় যে, অন্তরে দর্শনজনিত প্রেমের উদয় হইয়াছে। যখন সেই অত্যন্ত ভাল ঈশ্বরের প্রেমময় বদন দর্শন হয়, তখন নিশ্চয় যিনি দেখেন, তাঁহার শরীর মনের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কবে তিনি কি করেছেন, তাহা ভাবিতে হয় না, দেখিবামাত্রই শরীর মন

কেমন এক প্রকার হইয়া যায়। অনুরাগের সহিত চন্দ্র দেখ্‌ছ; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করিয়া কি চন্দ্রকে ভালবাস যে, ইহার জ্যোৎস্নায় আমার আনন্দ হয় না? উপকার ভেবে নয়, দর্শনেই প্রেম হয়। তুমি পাঁচটি কি দশটি উপকার করেছ, অতএব উপযুক্ত পরিমাণে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম গ্রহণ কর;—যেখানে সাক্ষাৎ দর্শন হয়, সেখানে আর এই বিনিময়তত্ত্ব নাই। ভালবাসা দেখিলেই ভাল-বাসিতে ইচ্ছা হয়। ভালবাসা একটি অতি সুস্নিগ্ধ এবং সুকোমল জিনিস। চন্দ্র দেখিলে কি হয়? সমস্ত শরীর মনের উপর শান্তিরূপ একটি জ্যোৎস্না আসে; গা কেমন করে এল, প্রাণ কেমন করে এল, একটি প্রশান্ত শীতল ভাব হল, বাক্য সকল সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। পূর্ণিমার চন্দ্র দর্শনে অঙ্গ শীতল হল, প্রাণ স্নিগ্ধ হল, কিন্তু সেই সুস্নিগ্ধ ভাব যে কি, তাহা কিরূপে বাক্যে প্রকাশ করিবে? জ্যোৎস্না আপনার গুণে যে বস্তুর উপরে পড়ে, তাহাকে শীতল করে। তেমনি আমাদের গুণে নহে, আমা-দের চিন্তা কিম্বা স্মরণের গুণে নহে; কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর যখনই অন্তরে প্রকাশিত হন, তখনই প্রেমের উদয় হয়, তখনই অন্তরে একটি সুস্নিগ্ধ মধুময় ভাবের উদয় হয়। প্রেমিক ব্যক্তি সদা স্নিগ্ধ। একটি অপূর্ব্ব শান্তিরস এসে তাঁহার সমস্ত প্রাণকে অভিষিক্ত করে। সুশীতল জ্যোৎস্নার ন্যায় ক্রমাগত ভক্তের চক্ষুর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করে। যদি কোন দিন এই প্রকার না হয়, সেই সেই দিনকার প্রেম স্মৃতিশাস্ত্রের হতে পারে, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের নহে। এই যে স্নিগ্ধ ভাব আরম্ভ হয়, ইহাতে কঠোর ভাব নরম হয়। চক্ষু স্পন্দহীন এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কঠোর চক্ষু আর্দ্র হয় এবং আর একটু বাড়াইলেই জল হয়, তখন অশ্রুর সৃষ্টি।

সেই সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রেমচন্দ্র দেখিতে যে মনের আর্দ্র ভাব হয়, তাহা ক্রমশঃ ঘন হইয়া মেঘ হয়, এবং আরও একটু ঘনতর হইলে, উপযুক্ত সময়ে বায়ুর আঘাতে তাহা হইতে জল পড়ে। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিলে ক্রমে সেই ঘন প্রেম আসে, খুব ঘন হইলেই চক্ষে জল আসে। এই জল পূর্ব্বকৃত পাপের অনুতাপ, কিম্বা শোক দুঃখ জন্য নহে, ইহা কেবল বর্ত্তমানকালে ঐ প্রেম দেখিয়াই হয়। প্রেমচন্দ্র দেখিবামাত্র ভক্তি অবাক্, স্পন্দহীন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আরাম, অথবা একটি স্নিগ্ধ-ভাব আসিল। সেই ঠাণ্ডা আসে কেন? যদি দূরে বৃষ্টি হয়, আমরা এখান থেকে ঠাণ্ডাতে বুঝি, এখানেও বৃষ্টি আসিবে। সেইরূপ যখন প্রাণ স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা হয়, তখন বুঝিতে হইবে, অশ্রুপাতরূপ বৃষ্টি পরে আসিবে। তুমি কি জলবাদী হবে? জল ব্রহ্ম, জল পরিত্রাণ, জল ধন। জলকে এত বাড়াইবে? হাঁ, বাড়াইবে। জল ভিন্ন কি চিত্ত শুদ্ধ হয় না? জল ভিন্ন কি ভক্তি হয় না? হে ভক্ত, এরূপ প্রশ্ন করিবে না। নিশ্চয় জানিও, জল ভিন্ন ভক্তের গতি নাই। যদি বল, না কাঁদিলেও আমার প্রেম হয়, জানিও তাহা অপেক্ষা অধিক প্রেম নাই। ভিতরে ভিতরে গূঢ় নিয়ম এই, মূল সত্য এই, অশ্রুপাত ভিন্ন প্রেম হয় না, প্রেম থাকে না, প্রেম বাড়ে না, অশ্রুপাত সামান্য মনে করিও না। এক ফোঁটা অশ্রুপাতকেও এক সহস্র মুক্তা অপেক্ষা মহামূল্য জ্ঞান করিবে। ভিন্ন প্রকার অশ্রুজলের ভিন্ন ভিন্ন দাম; প্রেমবিজ্ঞানের অধ্যাপক যাহারা, তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন। কোন সোণা বার টাকা এবং কোন সোণা ষোল টাকা দরের। বাস্তবিক চক্ষের প্রেমাশ্রু অত্যন্ত মূল্যবান, স্বর্গের দেবতাদিগের পক্ষে অত্যন্ত আদরণীয়। প্রেম চাও, কিন্তু প্রেম আছে অথচ প্রেমাশ্রু নাই, সে প্রেম চাই না। মেঘ হতে পারে, অথচ বৃষ্টি নাও হতে

পারে; কিন্তু খুব ঘন হল, অথচ বৃষ্টি হল না, এমন হয় না। এজন্য বলি, ঘন প্রেম চাই। প্রেম যদি পাতলা থাকে, জল হবে না। অশ্রুপাত ভক্তিশাস্ত্রে মহামূল্য বস্তু। এক দিন চক্ষু হইতে এক ফোঁটা প্রেমজল পড়িলে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিবে। যত্নের সহিত প্রেমাশ্রু সাধন কর। সেই প্রেমচন্দ্রের স্নিগ্ধ ঘনীভূত ভাব দেখিলেই অশ্রুপাত হইবে।

অন্যের ভক্তিভাব দেখিয়া নিজের ভক্তি না হইলেও যে অশ্রুপাত হয়, তাহাতে সৌভাগ্য মনে করিবে; কারণ, এ অবস্থায় প্রেম শীঘ্র আনা যায়। প্রেমাশ্রু আনন্দাশ্রু শোকাশ্রু সঙ্গে থাকিলে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চার হয়। অশ্রু বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে।

বৈরাগ্য কি?

কলুটোলা, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি অতি যত্নের সহিত বৈরাগ্য সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ এবং সাধন করিবে। বৈরাগ্য ব্যতীত তোমার সকল সিদ্ধ হইবে না। যথার্থ বৈরাগ্য চিনিয়া লইবে। প্রকৃত, অকৃত্রিম বৈরাগ্য বাছিয়া লইবে। পৃথিবীতে অনেক প্রকার কল্পিত বিকৃত মিথ্যা অযথার্থ বৈরাগ্য আছে, সে সকল তুমি গ্রহণ করিবে না। যিনি সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হন, অঙ্গে ভস্ম মাখেন, পরের সঙ্গে কথা কহেন না, তিনিই যে বৈরাগী, তাহা নহে। বাহ্যিক এমন কোন লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা বৈরাগ্যকে জানা যায়। বৈরাগ্য অন্তরের ধন। একজন বাহিরের সম্পদ ছাড়িল, সেই কি বৈরাগী? তুমি বলিবে, না। কেন না, কাহারও পক্ষে সম্পদ্ ছাড়িলেও বৈরাগ্য হয় না,

আর কাহারও সম্পদের মধ্যে থাকিলেও বৈরাগ্য হয়। আন্তরিক বৈরাগ্য প্রতিজনের হৃদয়ে স্বতন্ত্র প্রকারে অবস্থান করে। এক দেশে এক সময়ে এক জনের পক্ষে যাহা বৈরাগ্য, অন্য দেশে অন্য সময়ে আর এক জনের পক্ষে তাহা বৈরাগ্য নহে। এক যুগে যাহা বৈরাগ্য; অন্য যুগে তাহা বৈরাগ্য নহে। একজনের পক্ষে তাহার যৌবনে যাহা বৈরাগ্য, তাহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহা বৈরাগ্য নহে। তবেইত বাহ্যলক্ষণ দ্বারা বৈরাগ্য চেনা কঠিন হইল। বিরাগসম্ভূত ভাবই বৈরাগ্য। পৃথিবীর অসার সুখের প্রতি যে বিরক্ত ভাব, তাহাই বৈরাগ্য। উদাসীনতা প্রথমে, বৈরাগ্য পরে। উদাসীনের অবস্থায় কিছুরই প্রতি মমতা নাই, অনাসক্ত নিরপেক্ষ ভাব, এই সংসার ভালও নহে, মন্দও নহে; কিন্তু এই ভাব যখন পরিপক্ব হয়, তখন অসার বস্তুর প্রতি বিরক্তি হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। কেবল দেখিলাম না, মজিলাম না, তাহা নহে; কিন্তু এই ভাব যখন পরিপক্ব হয়, তখন অসার বস্তুর প্রতি বিরক্তি হয়। তখন সংসার কেবল অসার নহে, কিন্তু বিরক্তিভাজন; এই বিরক্তি হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। কেবল দেখিলাম না, মজিলাম না, তাহা নহে; কিন্তু বিরক্ত। মত্ত হইলাম না ইহা ঔদাসীন্য, ভাল লাগিতেছে না ইহা বৈরাগ্য। অমুক ব্যক্তি বৈরাগী কি না, বাহিরের লক্ষণ দ্বারা জানা যায় না। ভিতরের যে বৈরাগ্য, সে কি? বৈরাগ্যের হেতু কি? মনুষ্য কেন বৈরাগী হয়? এক, অসার ব'লে সংসারকে ভাল না বাসা; আর এক, সংসার ইন্দ্রিয়াসক্তির উত্তেজক, পাপের কারণ, এই জন্য সংসারকে ঘৃণা করা; তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত যদি না হওয়া যায়, তদ্দ্বারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জগতের মঙ্গল করা; এই তিন ভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তৃতীয় প্রকার বৈরাগ্য ভক্তিবিভাগের। প্রথম এবং দ্বিতীয়

প্রকার বৈরাগ্য যোগশাস্ত্রের। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য বৈরাগী হওয়া এইটি ভক্তির ব্যাপার। যোগশাস্ত্রের বৈরাগ্য মিথ্যা এবং আসক্তি পরিত্যাগ। জ্ঞানগত বৈরাগ্য দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইবে। সংসারকে বলিবে, সংসার, যদি তুমি চিরসঙ্গী না হ'লে, তবে কেন তোমাকে নেব? দ্বিতীয়তঃ, হৃদগত বৈরাগ্য দ্বারা পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য, ধর্ম্মতঃ উপকার লাভ করিবার জন্য, সুখের আসক্তি পরাজয় করিবে। তুমি যদি পৃথিবীর সমুদায় সুখের প্রতি বৈরাগ্য অবলম্বন কর, তোমার পাপ অতি অল্প হইবে। তুমি কি মনে কর, ধর্ম্ম এত উদার (উদার শব্দ পার্থিব অর্থে ব্যবহৃত হইল) যে, খাওয়া, পরা এবং অন্যান্য সাংসারিক সুখভোগসম্পর্কে তোমাকে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিবেন? ধর্ম্ম কি ইহার আশ্রিত-দিগের অপর্য্যাপ্তরূপে ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সুখের ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন? না। ধর্ম্ম গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, "অপার ইন্দ্রিয়সুখ আমি কোন সাধককে দিই নাই, দেওয়া উচিত নহে।" যাই একটু ভাল খাওয়া, কিম্বা ভাল জায়গায় থাকা, কিম্বা পারি-বারিক আমোদ পাপের দিকে মনকে ঝোকায়, তখনই মহাবীর বৈরাগ্য আসিয়া হুঙ্কারধ্বনি করিয়া বলিবে, একটি চুলের অপর দিকে যাইতে পারিবে না। মন যদি একটু সুখের দিকে গড়িয়া যায়, সে সময় অত্যন্ত সাবধান হইবে। যখন মন ধর্ম্মের গুরুত্বশূন্য হয়, সেই শিথিলতার সময়, সেই ঘনতর অভাবের সময়, হয়ত ভাল আহার করা, ভাল কাপড় পরা, প্রিয় বন্ধুদিগের সঙ্গ, স্ত্রীপুত্রাদির সেবা, যশ মান ভোগ করা, এবং পাপ করা সমান হইবে। এক সময় যাহা নির্দ্দোষ ছিল, সেই সময় তাহা পাপের কারণ হইল। পাপের কারণ কি? ইন্দ্রিয়সুখ। ইন্দ্রিয়সুখ ত নির্দ্দোষ, তাহাকে ছেদন করিলে

কেন? না, এখন সে নির্দ্দোষ নহে। বৈরাগ্য অতি গম্ভীর, অতি নিষ্ঠুর, বৈরাগ্য আত্মনিগ্রহ। বৈরাগ্যের আদেশে অনেক সময়ে সুখকে ইচ্ছাপূর্ব্বক নাশ করিতে হয়, ভোগেচ্ছাকে কঠোর ভাবে নির্য্যাতন করিতে হয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়সুখ পাপের কারণ নহে, তখন তাহা সেবনীয়। যদি ভাল খাওয়া, ভাল পরার ভিতরে পাপের বীজ না থাকে, তবে ভাল খাও, ভাল পর, তাতে ক্ষতি কি? যে ইন্দ্রিয়সুখ তোমার যোগধর্ম্মের প্রতিকূল, যাহাতে মন বিকৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই পরিত্যাজ্য। কোন সময় হয়ত কালাপেড়ে ধুতি পরা, কিম্বা ভাল তরকারি দিয়া তৃপ্তির সহিত আহার তোমার গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু চির-জীবনের জন্য নহে। সেই সময় অতীত হইলেই অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, এবং আবার নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়সুখের ভূমি বিস্তৃত হইবে। সুখভোগ নিষেধ কখন? যখন তাহা ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, অথবা যখন তাহা সেবন করিলে পতন হয়। অতএব যে শাসন, যে ইন্দ্রিয়সংযম, যে আত্মনিগ্রহ, অথবা যে বিষয়বিরাগ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখকে পাপের কারণ হইতে দেওয়া না হয়, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। বৈরাগ্য কি যেমন জানিলে, বৈরাগ্যের পরিমাণও জানিলে। যে কথাতে বৈরাগ্যের অর্থ প্রকাশ হইল, সেই কথাতেই বৈরাগ্যের পরিমাণ বুঝিলে। কতদূর নির্দ্দোষ সুখ আমোদ ভোগ করা উচিত, তাহা জানিলে। বৈরাগ্য কি জন্য, তাহাও বুঝিলে। অতএব বৈরাগ্যশাস্ত্র যখন পাঠ করিবে, বৈরাগ্যসাধনার্থ সকলের জন্য যে এক বিধি, কদাচ ইহা বিশ্বাস করিও না। বৈরাগ্য আপেক্ষিক, বৈরাগ্য তুলনার ব্যাপার; একজনের পক্ষে যাহা বৈরাগ্য, অন্যের পক্ষে তাহা বৈরাগ্য নহে। যেন তেন প্রকারেণ, যে প্রকার শাসন দ্বারা তুমি ইন্দ্রিয়-

সুখকে পাপের কারণ হইতে না দিতে পার, তাহাই বৈরাগ্য, এবং তাহাই তোমার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। মনকে কখনও শিথিল হইতে দিবে না, সর্ব্বদা জমাট রাখিবে। প্রতিদিন এরূপ করিয়া দেখিবে, নিক্তির ওজনে মন সংসারের দিকে ঝুঁকিতেছে কি না। আত্মাকে কঠোর নিষ্ঠুর ক'রে রাখা, লোহা গরম ক'রে মনকে ছেঁকা দেওয়া, যোগশাস্ত্রের বৈরাগ্য এবম্প্রকার। খুব আগুন দিয়ে মনকে পোড়াবে। যোগশিক্ষার্থী, শিথিলতা, অস্থিরতা, অত্যন্ত সুখাসক্তি তোমার পক্ষে পাপ। অধিক সুখাসক্তিরূপ ভয়ঙ্কর জ্বর এবার আসিবে, আত্ম-চিকিৎসক হইয়া যদি বুঝিতে পার, তবে পূর্ব্বেই অধিক মাত্রায় বৈরাগ্য ঔষধ সেবন করিবে, শরীর মনকে খুব সংযত করিয়া রাখিবে। এদিকে যাব না, ওদিকে যাব না, এ পুস্তক পড়িব না, ওর সঙ্গ করিব না, এই প্রকার ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অপবিত্র সুখের কারণ হইতে আপনাকে রক্ষা করাই প্রকৃত বৈরাগ্য।

ঔদাসীন্য কাহার কাহার স্বভাব-সুলভ, কিন্তু বৈরাগ্য সাধন-সাপেক্ষ। বহুকাল কোন উপাদেয় সামগ্রী ভোগ করিতে করিতে যে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে, সেই আসক্তি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ব্বভুক্ত সুখের প্রতি বিরক্তি এবং ঘৃণা, তাহাই বৈরাগ্য।

বিশেষ কর্ত্তব্য—স্বাস্থ্য এবং প্রাণভূমির সীমার বহির্ভূত স্থানে বৈরাগ্য আরম্ভ হয়। শরীররক্ষার্থে যে সকল নিয়ম পালন করা অত্যাবশ্যক, সেই রাজ্যে বৈরাগ্যের অধিকার নাই। এই স্থানে বৈরাগ্যের কথা যে আনয়ন করে, সে ঈশ্বরের শত্রু। যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহা বৈরাগ্য নহে, তাহা ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘন।

ভক্তির উচ্ছ্বাস।

কলুটোলা, ১৭ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, চন্দ্রদর্শনে অনুরাগ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, ইহার উপমা ভৌতিক জগতে দেখা যায়। চন্দ্রের আকর্ষণে জল স্ফীত হয়, ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে কথিত আছে। সেই জল প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া যেখানে যেখানে পথ পায়, সে সকল স্থান পূর্ণ করে। পূর্ণিমার সময় জোয়ারের অত্যন্ত তেজ হয়। বান ডাকিলে কেহ নিকটে তিষ্ঠিতে পারে না। প্রেমচন্দ্র, ব্রহ্মচন্দ্রের আকর্ষণে নিদ্রিত প্রেমনদীর উচ্ছ্বাস হয়, এবং যখন সেই প্রেমচন্দ্রের পূর্ণিমা হয়, তখন সেই প্রেমনদীর উচ্ছ্বাসের স্রোতের এমনি প্রবল বেগ হয় যে, তাহার নিকট কোন বাধা বিঘ্ন তিষ্ঠিতে পারে না। লজ্জা, ভয়, এ সমুদায় বাধা সেই উচ্ছ্বাসের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার প্রভৃতি পাপরাশি সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। পূর্ণিমার জোয়ার সমস্ত জীবনকে প্লাবিত করে। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, এই বান ডাকৃছিল অল্প স্থানে, দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে এত জল আসিল! এক বিন্দু প্রেম দেখিতে দেখিতে সিন্ধুর মত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ প্রাণে এত ভক্তির ভাব হইত না, কোথা হইতে ভক্তির নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রেমিক ভক্তজন এইরূপে আপনার ভাব দেখিয়া আপনি চমৎকৃত হন। উচ্ছ্বাসের অন্য কোন কারণ নাই, কেবল চন্দ্রের আকর্ষণই ইহার কারণ। কেবল বুদ্ধি, বিবেচনা, কিম্বা ভাবনা দ্বারা তাহা হইবে না। পূর্ণচন্দ্রের আকর্ষণে যখন সমুদ্রে উচ্ছ্বাস হয়, তখন ক্ষেত্রের উপর দিয়া জল যায়,

এবং নদী কূপ ইত্যাদি সমুদায় পূর্ণ করে; পূর্ব্বে যেখানে জল যেত না, সেই উচ্চ স্থানেও জল যায়। কিন্তু যদিও এই উচ্ছ্বাস সর্ব্বদা থাকে না, তথাপি বারম্বার উচ্ছ্বাস দ্বারা ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়, ভবিষ্যতে ফলপ্রসবের পক্ষে প্রচুর ক্ষমতা লাভ করে। সেইরূপ বারম্বার ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় কোমল এবং আর্দ্র হয়, এবং তাহা হইতে শান্তি, আনন্দ, আশা, বিনয় ইত্যাদি ফল প্রসূত হয়। জিজ্ঞাসা করিতে পার, এই যে ভক্তিজোয়ার আসে, এই স্রোত কি মনের সমুদায় পাপ দুঃখ টেনে নিয়ে যেতে পারে? ভাটার অবস্থায় কত মলিনতা জমিয়া থাকে, সমুদায় কি ধৌত করিয়া লইয়া যায়? হাঁ, জলের তোড়ে সমুদায় মলিনতা চলিয়া যায়। কিন্তু উপরিভাগে যে স্রোত চলে, তাহা গভীর জলরাশির নিম্ন স্থানে সে সকল জঞ্জাল মলিনতা থাকে, তাহা ধৌত করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সামান্য প্রেমের উচ্ছ্বাসে যে সকল জঘন্যতার বীজ হৃদয়ের অত্যন্ত নিম্নদেশে আছে, সে সমুদায় যায় না। এ সকল নিম্নতম স্থানের অপবিত্রতাও যায়, যদি নদীর সমস্ত ভাগে স্রোত হয়। যখন প্রেম ও ভক্তির অত্যন্ত প্রাবল্য হয়, তখন ভিতর পর্য্যন্ত মধুময় পুণ্যময় হয়। ভক্তির জল জীবনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া নিম্নতম মন্দভাব সকলও বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে। প্রকৃত ভক্তি পাপকে ভস্ম করিয়া প্রচুর পরিমাণে পুণ্য, সুখ এবং আহ্লাদ আনিয়া দেয়। সেই প্রেমচন্দ্র দেখিতে দেখিতে আনন্দ এত অধিক হয় যে, আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি এত অধিক প্রেম হয় যে, তাহার তরঙ্গে সমুদায় শত্রু ভেসে যায়। সেই চন্দ্রের আকর্ষণে উচ্ছ্বাস হয় আপনি, ব্রহ্মবিরুদ্ধ ভাব যায় আপনি।

যদি দেখ, সেই প্রেমচন্দ্র দেখিতে দেখিতে জল বাড়িল না, তবে

আরও ব্যাকুল হইয়া সেই চন্দ্র দেখিবে। জল বাড়িল কি না, দেখিবে কেমন করে? চক্ষু একটি পুষ্করিণী, প্রেমজলে সেই পুষ্করিণী পূর্ণ হইল কি না, দেখিলেই বুঝিবে। তাহাতে জল দেখিলে বুঝিবে, পূর্ণিমার জোয়ারের জল এসেছে। অল্প পরিমাণে যে জল, তাহাতে পবিত্রতা আনন্দও অল্প। তাহাতে মনের কতকগুলি অংশ থাকিবে, যাহা প্লাবিত হবে না; কিন্তু যতদূর জল, ততদূর শুদ্ধ করিয়া দিবে, মোহিত করিয়া দিবে। সেই প্রেমচন্দ্রের দিকে যত দৃষ্টি পড়িবে, তত জল বাড়িবে। অল্প জল হইলে কখনও স্বীকার ক'রো না যে, ভালরূপে আকৃষ্ট হইয়াছ। যখন জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণটি শুদ্ধ এবং মধুর হইল, তখন বলিবে যে, হাঁ, ইহাতেই প্রাণ তৃপ্ত হয়। এক দিকে প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে ভক্তিসিন্ধু উথলিত হয়, অন্য দিকে মনের ভাব বাষ্প হইয়া উপরে ঘন মেঘাকার ধারণ করিয়া আবার বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এইরূপে ক্রমাগত নিম্নে জল বৃদ্ধি এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ দ্বারা, রাস্তা, বাড়ী, গ্রাম, নগর প্লাবিত হইয়া যায়। পুরাতন জীবন নষ্ট হয়, এবং নূতন ভক্তি, মগ্নভাব এবং জীবনের সঞ্চার হয়। এই প্রকার ভক্তিতে মগ্নভাব এবং জীবনের সঞ্চার হয়। এই প্রকার ভক্তিশাস্ত্রে জলবৃদ্ধি, জলবর্ষণ, প্রেমবারি, ভক্তিসিন্ধুর ব্যাপার। ভক্তিরাজ্যে বান ডাকে, বৃষ্টি হয়। ভক্তিশাস্ত্র জলেব শাস্ত্র।

স্থায়ী বৈরাগ্য।

কলুটোলা, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, পথ কখনও গম্য স্থান হইতে পারে না। পথ অবলম্বন করিয়া গম্য স্থানে যাইতে হয়। বৈরাগ্য পথ, না গম্য স্থান?

বৈরাগী হওয়া উচিত, না বৈরাগী থাকা উচিত? বৈরাগ্য উপায়, না বৈরাগ্য লক্ষ্য? মনোভিনিবেশ করিয়া এই বিষয় চিন্তা কর। বৈরাগ্যের অর্থ যেখানে অসার বস্তুকে অসার বলিয়া জানা, অথবা অসার কখন সার নহে এই যে জ্ঞানগত বৈরাগ্য, ইহা চিরস্থায়ী থাকিবে। ধনমানে মুগ্ধ হইবে না, কেন না এ সকলই অসার। আর এক প্রকার বৈরাগ্য আছে, যাহার অর্থ বস্তুকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করা। ঘৃণা না করিয়াও শুধু ত্যাগ করা যায়। কেবল আদেশের অনুরোধে অথবা উচ্চ লক্ষ্য সাধনের জন্য বিলাস, সুখভোগ অথবা বিষয় ত্যাগ করা যায়। যে ব্যক্তি সংসারকে ঘৃণা করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতঃ বনে চলিয়া যায়, তাহার বিশেষ নাম সন্ন্যাসী অথবা ত্যাগী বৈরাগী। তাহার পক্ষে ত্যাগের জন্যই ত্যাগ। কাহারও কাহারও সংস্কারানুসারে এই বৈরাগ্যকেও চিরস্থায়ী রাখা উচিত; কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যশাস্ত্রে যদিও একবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, চিরকাল সন্ন্যাসী থাকা উচিত নহে। চিত্তশুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য, এবং মৃত্যুভয় বিনাশ করিবার জন্য উপায়স্বরূপ, পথস্বরূপ একবার সন্ন্যাস অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু যে পরিমাণে এবং যত কালের জন্য, এ সকল উচ্চলক্ষ্যসাধনার্থ বিষয়-ত্যাগ অত্যাবশ্যক, সেই পরিমাণে এবং ততকালই বিষয় পরিত্যাজ্য। এই প্রকার যে বৈরাগ্য, অথবা সন্ন্যাস, ইহার নাম তপস্যা। আশু কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শরীরকে কষ্ট দেওয়া, নিষ্ঠুররূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা, চক্ষু শত্রু হইয়াছে, তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত বস্তু না দেখিতে দেওয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে অভিলাষ হইয়াছে, উত্তম বস্ত্র পরিধান না করা, উপাদেয় সামগ্রী আহার করিবার বিলাস বাড়িয়াছে, তিক্ত দ্রব্য আহার করা ইত্যাদি এই যে সকল তপস্যা,

এইগুলি অত্যাবশ্যক; কিন্তু প্রাচীন তপস্যাশাস্ত্রে উপবাস করা, জলপান বন্ধকরা, ঊর্দ্ধবাহু হওয়া, শরীরকে লৌহ দ্বারা বিদ্ধ করা, অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করা, তীক্ষ্ণ বস্তুর উপরে শয়ন করা, তীব্র উত্তাপ এবং শীত বর্ষাদি সহ্য করা ইত্যাদি যতগুলি কঠোর ব্যাপার লিখিত হইয়াছে, এ সমুদায় কি যথার্থ তপস্যা? তপস্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে তোমার স্থির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কতদূর শরীর নিগ্রহ করিতে পার, এবং কোন্ স্থলে শরীরনিগ্রহ প্রকৃত তপস্যাশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা পরিষ্কাররূপে জানিয়া রাখিবে। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ, জীবন এবং স্বাস্থ্যভূমির সীমা মধ্যে বৈরাগ্যের অধিকার নাই। সুস্থতা এবং প্রাণ রক্ষা করিয়া তপস্যা দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিবে। যেমন গম্য স্থানে যাইবার জন্য রথারোহণ, সেইরূপ একাগ্রতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং উচ্চ যোগবল ইত্যাদি অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য তপস্যা অবলম্বন করিবে। যেমন গৃহ নির্ম্মিত হইলে আর বাঁশের ভারার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আব তপস্যার আবশ্যক কি? ক্ষুধা নিবারণ করিয়া শরীরকে পুষ্ট করিবার জন্য লোকে আহার করে। সমস্ত দিনত কেহ আহার করে না। তপস্যার নিয়মাদি সেইরূপ আত্মাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য। সুখে দুঃখে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তপস্যার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম হইবে। তপস্যার মূল অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের আদেশানুসারে বিশেষ বিশেষ ভোগ বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তজ্জনিত কষ্ট দ্বারা মনকে পরিষ্কার করা। অগ্নির ভিতরে সোণাকে চিরকাল রাখে না। যতক্ষণ সোণার খাদ বাহির হইয়া না যায়, ততক্ষণই সোণাকে অগ্নির মধ্যে সংশোধন করে। খাদ মুক্ত হইয়া সোণা নির্ম্মল হইলেই অগ্নি হইতে তুলিয়া তাহা দ্বারা সুন্দর অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করে। সেইরূপ যখন তপস্যারূপ হোমের অগ্নিতে আত্মা নির্ম্মল হইয়া উঠিবে, তখন আব

তপস্যার প্রয়োজন কি? চিত্তশুদ্ধি লক্ষ্য, কষ্ট তপস্যা উপায়। সোণা নির্ম্মল হইলে যেমন অগ্নির আর মূল্য মহিমা নাই, সেইরূপ চিত্ত শুদ্ধ হইলে আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। তপস্যাসাধনে তোমার নেতা কে? তুমি নহ, দেশাচার নহে, কোন মনুষ্য নহে, ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর যদি বলেন, এতক্ষণের জন্য এই বিষয় পরিত্যাগ কর, ঠিক ততক্ষণের জন্য সেই বিষয় পরিত্যাগ করিবে, আপনার রুচিকে কখনও নেতা করিবে না। তপস্যারূপ হোম অগ্নি দ্বারা আপনার আত্মরূপ গৃহ পরিষ্কার হইলে, আর সেই অগ্নি রাখিবে না। জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে বৈরাগ্যের কি কোন চিরস্থায়ী নিয়ম নাই? বৈরাগ্যের চক্র কি চিরকাল ঘুরিবে? কিছুই কি সমস্ত জীবনের নিয়ম নাই? আছে, বৈরাগী জীবন আছে। তাহা সন্ন্যাসী কিম্বা তপস্বী জীবন নহে। তবে স্থায়ী বৈরাগী জীবন কি? নিদ্রা পরিত্যাগ নহে, নিদ্রাধিক্য নহে; আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার পরিত্যাগ নহে, সংসারাসক্তি নহে; লোকসঙ্গ পরিত্যাগ নহে, জনসমাজে আবদ্ধ নহে; শরীরকে খুব সুখ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয়া নহে; মৃত্যুকে অভিলাষ করা নহে, মৃত্যুকে ভয় করা নহে। শুন্‌লে! অত্যন্ত কষ্ট হইলেও মৃত্যু ইচ্ছা করিবে না। মৃত্যু ইচ্ছা মহাপাপ, আবার মৃত্যুভয়ও মহাপাপ। বৈরাগীর মুখ কি সর্ব্বদা সহাস্য? না, তবে বৈরাগীর মুখ-দর্শনে, এই ব্যক্তি বড় সুখী, এ বলিয়া কাহারও হিংসা হয় না; দ্বিতীয়তঃ, তদ্দর্শনে ইনি বড় দুঃখী, এ বলিয়াও কাহারও দয়া হয় না। তবে বৈরাগীর মুখের ভাব কি? ধর্ম্মজনিত এক প্রকার গম্ভীর প্রশান্ত ভাব। গাম্ভীর্য্য এবং শান্তি এই দুই ভাব মিশ্রিত হইলে যে এক প্রকার শ্রী হয়, তাহাই সমাহিত শান্ত-ভাবপ্রধান বৈরাগীর মুখে প্রকাশিত হয়। দীনতা বৈরাগীর আর

একটি প্রধান লক্ষণ। দীনতা কি? গরিব ভাব, বড় হইবার ইচ্ছা নাই, নম্রভাব, অল্পেতে সন্তোষ। দীনতা সন্তোষ বর্দ্ধন করে। সর্ব্ব-ত্যাগ দীনতা নহে। এই সকল বৈরাগ্যের লক্ষণ। আজ এই পর্য্যন্ত।

ত্যাগেতেই ফল নহে, আদেশানুসারে ত্যাগ করিলেই ফল হয়। একজন যদি অসময়ে, অশুভক্ষণে সমস্ত সংসারও ত্যাগ করে, তাহারও শুভফল হইবে না।

ধর্ম্মজনিত দীনতায় দুঃখবোধ নাই, ধর্ম্মার্থ দীন ব্যক্তি অকিঞ্চন হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

মঙ্গলময়ের দর্শনে ফল।

কলুটোলা, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ১লা এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, যদি জল আসিল মরুভূমিতে, তবে সেই মরুভূমি উর্ব্বরা হওয়ারও উপায় হইল। আকাশের জল, নদীর প্লাবনের জল ক্রমাগত দুই দিক থেকে এসে হৃদয়ভূমিকে অভিষিক্ত করিলে হৃদয় ভিজে কোমল এবং নরম হইল, ক্রমে শক্ত ভূমি উর্ব্বরা হওয়ার উপক্রম হইল। হৃদয় প্রেমচন্দ্র দ্বারা অকৃষ্ট হইবামাত্রই ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় নরম হইল। বিনয়, দীনতা এবং দয়া এই কয়েকটি ফুল বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া সেই স্থানকে সুশোভিত করিল। হৃদয় উদ্যানের ন্যায় হইল। চারিদিক্ লতা, বৃক্ষ, পুষ্প, ফলে সুন্দর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে ভূমি পাথরের মত কঠোর, তীব্র এবং নয়নকষ্টকর ছিল, এখন তাহা মনোহর হইল। যত ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, হৃদয় ততই নরম হয়; অহঙ্কার, তেজ অথবা গর্ব্বিত ভাব চলিয়া যায়। অহঙ্কার ভক্তির শত্রু, ভক্তি অহঙ্কারের শত্রু; যেখানে একটি থাকে, সেখানে আর একটি

থাকিতে পারে না। যথার্থ ভক্ত বিনয়ী, দীনাত্মা এবং অকিঞ্চন, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না। তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিজের বল, নিজের জ্ঞান, নিজের ভাব কিছুই নাই। যত ভক্তি বৃদ্ধি হয়, ততই এ সকল ভাব বৃদ্ধি হয়, এবং যত এ সকল ভাব বৃদ্ধি হয়, ততই ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ভক্ত ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হন, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর কিছুই থাকে না, তাঁহার আমিত্ব পর্য্যন্ত জলপ্লাবনে ধৌত হইয়া যায়। কেবল যাহা ঈশ্বরকে ভক্তি এবং সেবা করে, সেইটুকু থাকে। যেমন একটি বাগানের মধ্যে ফকীর বসে আছে, ভক্তির অবস্থা সেইরূপ। যাহা মরুভূমি ছিল, প্রেমচন্দ্রগুণে তাহা বাগান হইল। সেখানে রাজার ঐশ্বর্য্য, বিপুল ধন সম্পত্তি আসিয়া নূতন দৃশ্য সৃজন করিল। যিনি ভক্ত, তিনি তাহার মধ্যে দীন, বৈরাগী, অকিঞ্চন এবং নিঃসম্বল ফকীরের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

প্রেমোদ্যানের মধ্যে ভক্তের এই ছবি। ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত অহঙ্কারী, ধনাভিমানী এবং স্বার্থপর ছিলেন; কিন্তু ভক্তির সমাগমমাত্র তিনি পরপ্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বস্ব পরের জন্য হইল। পূর্ব্বে তাঁহার দান করিবার অনেক সামগ্রী ছিল, কিন্তু সকলই নিজের জন্য ব্যবহার করিতেন, অন্যকে দিতেন না; এখন নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না, সকলই পরের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এই রূপে ভক্তি আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়, দীনতা এবং দয়া আসে। এই তিন ভাবই মূলে এক। ভক্ত যিনি, তিনি কেবল আধার হইলেন, আধেয় রহিল না, শরীর মন রহিল; কিন্তু তাহার ভিতরে যে কর্ত্তা, ভূস্বামী, ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিল, সে আর নাই, সে আধারেতে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ হইল। দয়ার স্বধর্ম্মই এই যে, তাহা চারিদিকে ধাবিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অহঙ্কার, ধনগর্ব্ব, নির্দ্দয়তা এই তিনটি

ভক্তির শত্রু। অহঙ্কার এবং ধনগর্ব্ব থাকিলে পরের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়। যখন অহঙ্কার চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা এবং পরের প্রতি নির্দ্দয়তাও কমিয়া যায়। এ সমুদায়ের মূলে কি বুঝিলে? অহম্ আপনার প্রতি আসক্তি, স্বার্থপরতা। যখন অহম্ পরিত্যক্ত হইল, তখন ঈশ্বর আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জগদ্বাসী লোকসকলও আসিল। জলপ্লাবনে আমিত্বের রাজ্যবিপ্লব হইল। আমিত্ব নির্ব্বাসিত হইয়া যে আধার প্রস্তুত হইল, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাঁহার আপনার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন, ইহার অর্থ যে, ভক্ত বিনয়ী, দীন এবং দয়াবান্ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা ছিল, তত দিন আপনার উপর দয়া ছিল; যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন সেই দয়া অন্তের প্রতি ধাবিত হইল। এক ভক্তি আসিয়া এত দূর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। যত ভক্তি বাড়ে, ক্রমে বিনয়, দীনতা, দয়াফুল আরও প্রস্ফুটিত হয়। প্রেমচন্দ্রপানে তাকাইয়া আছেন যে ভক্ত, তাঁহার হৃদয় হইল উদ্যানের ন্যায়। ভক্ত বিনয়ী, দীন এবং দয়ার্দ্র হইয়া ঈশ্বরের সেবা করেন। ঈশ্বর-দর্শনে এত ফল। স্মৃতিশাস্ত্রে দয়া স্মরণ করিতে করিতে ভক্তি হয়, এখানে ঈশ্বরদর্শনমাত্র হৃদয়ের এ সকল কোমল ভাব প্রস্ফুটিত হয়। ভক্ত বিনয়ী হইয়া আপনাকে ভাল না বেসে পরকে ভালবাসেন। শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ঈশ্বরের মুখ ভক্ত যত দেখেন, ততই তিনি নিরহঙ্কারী, দীন এবং দয়ার্দ্র হন; যত ব্রহ্মকে দেখেন, তত তিনি নিজে ছোট হন। জ্ঞানেতে মানুষ আপনাকে বড় দেখে, ভক্তিতে আপনাকে ছোট দেখে। পৃথিবীতে দুই রকম কাচ আছে। এক রকম কাচ ছোট বস্তুকে বড় দেখায়, আর প্রকার কাচ বড় বস্তুকে ছোট দেখায়। ভক্তির ভিতর দিয়া আপনাকে যত দেখিবে, ততই ছোট দেখিবে। ভক্তের আমিত্ব ত

নাইই, যদিও ভক্তিকাচ দ্বারা কিছু আপনাকে দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত ছোট দেখায়। ক্রমে ভক্তিকাচের গুণ যত বাড়িবে, সেই পরিমাণে আপনাকে আরও ক্ষুদ্র দেখাইবে। শেষে আপনাকে ঈশ্বরের পদধূলি এবং সকলের পদধূলি দেখিবে। যত ধন, মান, সমুদায় কর্পূরের ন্যায় উফে যায়। যতই ভক্তি বাড়ে, ততই দীনাত্মা হন, এবং ভক্তের হৃদয় সমস্ত জগতের বাসস্থান হয়। যদি বল, একটি সর্ষপের ন্যায় মনুষ্যহৃদয়, কোটি কোটি মনুষ্য পৃথিবীতে বাস করে, তবে একটি ক্ষুদ্র হৃদয় কিরূপে এতবড় জগতের বাসস্থান হইবে? হাঁ, ইহা সম্ভব। ভক্তির উদয়ে যখন সেই সর্ষপবৎ আমিত্ব নির্ব্বাসিত হয়, তখন ঈশ্বর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ঈশ্বর আসিলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত জগৎ আসে। যে আমিত্ব ব্যবধান অথবা প্রাচীর ছিল, তাহা দূর হইল। ভক্তের হৃদয় জগতের মঙ্গলের জন্য, জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড আধার হইল। ঈশ্বরের প্রেম ভক্তের ভিতর দিয়া জগতের উপকার করিতে লাগিল। ভক্তিশাস্ত্রের এই বিশেষভাব যে, ঈশ্বর কাজ করেন, ভক্ত গ্রহণ করেন। ঈশ্বর দাতা, ভক্ত ক্রমাগত ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিয়া তাহা আবার জগৎকে দেন। ভক্ত কেবল এই দেখেন, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে চাঁদের আকর্ষণ লাগে। ঈশ্বরই সমুদায় কাজ করেন, ভক্ত কেবল চুপ ক'রে ব'সে দেখেন। শিবম্ দর্শন সম্পর্কে এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল। শিবম্ মঙ্গলময় ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে ভক্ত যখন মোহিত এবং বশীভূত হইয়া সেই সুন্দর ঈশ্বরকে দর্শন করেন, সেই দর্শনজনিত যে একান্ত বশীভূত ভাব, তাহা হইতে তৃতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

সংসারধর্ম্ম।

কলুটোলা, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক ; ৩রা এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্য সংসারে কি প্রকার আকার ধারণ করে, সংসার মধ্যে বৈরাগ্য কি প্রকারে অধিবাস করে, বৈরাগ্যের লক্ষণ কি জানিয়াছ। প্রশান্ত হওয়া, বস্তুর অসারতা জানা, তপস্যা এবং কঠোর ব্রত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বন করা শ্রেয়, চিরসন্ন্যাসী থাকা উচিত নহে। তপস্যা রথের ন্যায় গম্য স্থানে যাইবার জন্য উপায়। কিন্তু যোগী সংসারী হইতে পারেন কি না? যিনি যোগ অবলম্বন করেন, তিনি উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্র পালন করিতে পারেন কি না? এ গভীর প্রশ্ন। নিগূঢ় যোগশিক্ষার পক্ষে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে বর্ত্তমান অবস্থা ভয়ানক প্রতিকূল। যদি বর্ত্তমান সংসার পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চ এবং স্বর্গীয় আকার ধারণ করে, তাহা হইলে সংসার যোগের অনুকূল হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান সংসার যোগের পক্ষে মহাশত্রু, সুতরাং ইহা পরিত্যাজ্য। যদি যোগ শিক্ষা করিবার জন্য সরল ইচ্ছা থাকে, তবে এই সংসার পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তবে কি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া চিরসন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে? যদি কেহ মনে করেন, যোগেতেই তিনি চির জীবন যাপন করিবেন, তিনি যেন বিবাহ না করেন। যদি নর নারী মধ্যে কেহ চিরজীবন এই ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যিনি পুরুষ, তিনি যেন স্ত্রী গ্রহণ না করেন এবং যিনি স্ত্রী, তিনি যেন স্বামী গ্রহণ না করেন। যাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি যেন আর বিবাহ না করেন এবং যিনি বিধবা হইয়াছেন, তিনি যেন পুনর্ব্বার

পতি গ্রহণ না করেন। কেবল যোগের নিমিত্ত বিবাহ না করাই ভাল। যদি চিরকৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া কেহ একাকী কিম্বা একাকিনী যোগ সাধন করেন, তিনি জগতের কাছে সমাদৃত হইবেন, ধার্ম্মিকদিগের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। কিন্তু যদি স্ত্রী, স্বামী, সন্তানাদি থাকে, সে অবস্থায় কি যোগ সাধন হয় না? অবশ্য হয়। পরিবার পরিত্যাগ করিলে যোগ হয় না, পরিত্যাগ নিষেধ, যোগশাস্ত্রে পরিত্যাগ পাপ। যদি স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকে, তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে, তাহাদিগকে যথোচিত সুখ সম্পদ দান করিবে। ইহার অন্যথা করা নিষিদ্ধ। সংসার পরিত্যাগ করিবে না; কিন্তু লোকে যাহাকে সংসার বলে, তাহা যোগের বিরুদ্ধ। সে সংসার ছাড়িতেই হইবে। তবে কিরূপে এই দুইয়ের সামঞ্জস্য হইবে? লোকে যাহাকে সংসার বলে, সে সংসার থাকিবে না। কি ভাবে? এবার কিছু কঠিন কথা। সেই ভাবটি কি, যে ভাবে পরিবার মধ্যে থাকিয়াও যোগী হওয়া যায়? যাঁহার পরিবার, গৃহ, আত্মীয়, কুটুম্ব আছে, তিনি এইরূপে থাকিবেন, যেন তাঁহার পরিবার, গৃহ, আত্মীয় কিছুই নাই। যাঁহার অনেক ভৃত্য আছে, তিনি এইরূপে থাকিবেন, যেন তাঁহার সেবা করিবার একটিও লোক নাই। এ মত অতি কঠিন, আপাততঃ শুনিতে ভয়ানক। মনে কর, একজন মানুষ শ্মশানে দণ্ডায়মান, রাত্রি দ্বিপ্রহর, কাছে কেহ নাই, চিতা সাজান, সেই চিতার জ্বলন্ত অনলে তাহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হইবে। অগ্নি হইবে কালি, কাঠ হইবে কলম। চারিদিকে স্ত্রী পুত্র, দাস দাসী, এত বিপুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, কিন্তু যোগী দেখিতেছেন, তাঁহার নিকটে আর কেহ নাই; কেবল তিনি ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী রহিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে সাজান চিতা, যাহার জ্বলন্ত অনলে তাঁহার প্রাণনাশ হইবে।

এই দৃশ্য যদি কল্পনা করিতে পার, তবে, হে যোগার্থী, যে কথা বলা হইতেছে, তাহার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে। এই ভাবে যদি সংসার করিতে পার, কর, নতুবা অন্য ভাবে নিষিদ্ধ। এই আদর্শ শ্মশানবাসী গৃহবাসী, সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অথচ সকলের সেবক। স্ত্রীর বহুমূল্য অহঙ্কার আছে, অথবা কিছুই নাই, সন্তানাদি অতি উচ্চপদে আরূঢ়, অথবা সন্তানাদি অত্যন্ত দরিদ্র, দুই সমান। সমজ্ঞান, অর্থাৎ যোগীর মন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ নহে, মন অবিচলিত, অবস্থার পরিবর্ত্তনে চাঞ্চল্য নাই, দাও সহস্র টাকা, নাও সহস্র টাকা, ক্ষতি নাই। সমান ভাব, সমচিত্ত অর্থাৎ অনেক আছে, তথাপি তাহার মধ্যে এমন ভাবে থাকিবে, যেন তোমার কিছুই নাই। যাহার ভার্য্যা সমক্ষে দণ্ডায়মান, দক্ষিণে কন্যা, পশ্চাতে দাস দাসী, তাহার পক্ষে কিছুই নাই, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব? আছে অথচ নাই, ইহা কিরূপে হইবে? বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য সাধন চাই। সাধনে সিদ্ধ হইলে এইরূপ হইবে। তাহা হইলে ত সংসার থাকে না, মূঢ় এই কথা বলে; জ্ঞান বলেন, সংসার ষোল আনা থাকে, এক পাই কমে না। ষোল আনা সংসার, কিন্তু যোগী নির্লিপ্ত সংসারবাসী। তুমি যদি যোগী হও, তবে তুমি যে অন্ধ, স্ত্রী তোমার নিকটে কে বলিল? পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব তোমার নিকটে কে বলিল? অন্ধ না হইলে কেহই যোগী হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন, চক্ষুকে সংস্কৃত করিয়া বিশুদ্ধ চক্ষে জীবন্মুক্তের ন্যায় স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিকে দেখিলে আর যোগভঙ্গ হয় না। বিশুদ্ধ চক্ষে পরিবারকে দেখা উৎকৃষ্ট; কিন্তু কাণা হইয়া দেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাপ কে? মা কে? শ্বশুর কে? স্ত্রী কে? ভাই কে? ভগ্নী কে? বাটী কি? অন্ধের পক্ষে এ সকল থাকিয়াও নাই। অন্ধের পক্ষে দিন যেমন, রাত্রিও তেমন। লোকে বলিতেছে, সূর্য্য

প্রখর কিরণ দিতেছে, দ্বিপ্রহর বেলা হইয়াছে; কিন্তু অন্ধের পক্ষে দ্বিপ্রহর দিন, আর দ্বিপ্রহর রাত্রি ঠিক নিক্তির ওজনে দুই সমান। যদি যোগী হইতে চাও, তবে চক্ষু দুটি উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর। এই অন্ধের আদর যোগধ্যানে। সেখানকার সকলেই অন্ধ। অন্ধ না হইলে যোগধ্যানে প্রবেশ নিষেধ। তবে কি বিশ্বাস করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্র কেহ নাই? তবে স্ত্রী তোমার কে? ছেলে তোমার কে? টাকা তোমার কি? বাড়ী তোমার কি? এ সমুদায় থাকিতেও তোমার যেন কেহ নাই। ইহা ভাবিলে কি হইল জান, সকলের সঙ্গে সেই পুরাতন সংসারের সম্পর্ক চলিয়া গেল, কেবল ধর্ম্মের সম্পর্ক হইল। স্ত্রী আর স্ত্রী রহিলেন না, পুত্র আর পুত্র রহিলেন না, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের সহায় হইলেন। যদি বল, ধর্ম্মের সম্পর্কের উপর এক তিল সংসারের সম্পর্ক রাখা উচিত, কেন না, তাঁহাদের শরীর আছে কি না। উহু, না, তিলার্দ্ধও সংসারের সম্পর্ক রাখা হবে না। খাঁটি ধর্ম্মের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না। জীবন্মুক্ত হইয়া, পরিমিত আহার বিহার করিয়া, বাড়ীতে থাকিয়াও যোগ সাধন করা যায়, এ সব কথার কথা, গিল্‌টি। এখানে মানুষের ভেল্কী। যদি খাঁটি গম্ভীর বৈরাগী হইতে চাও, তবে শ্মশানবাসী গৃহী হইতে হইবে। মনের ভিতর জটাধারী সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে, তোমার ভয়ানক তেজ দ্বারা সংসার পরাস্ত হইয়া যাইবে। কতকগুলি সংসারের লোক তোমাকে কাঁদাইতে আসিল; কিন্তু তাহারা কাঁদাইবে কাহাকে? শ্মশানে বাস করিতেছে যে, সে আর কি কাঁদিবে? অথবা কতকগুলি লোক তোমাকে হাসাইতে আসিল; কিন্তু যে শ্মশানে প্রাণনাশের প্রতীক্ষা করিতেছে, সে কি হাসে? প্রণিধান কর, শ্মশানবাসী হইয়া গৃহধর্ম্ম আচরণ কর, আর ভয় নাই। ধর্ম্মের জন্য বিষয়ের কথা কহ, যদি

বিষয়ের জন্য বিষয়ের কথা কহ, তবে যোগাসন ছাড়। যদি টাকার জন্য টাকা উপার্জ্জন করিবে, তবে যোগভূমি হইতে বাহির হইয়া যাও। গভীর ধর্ম্মের কর্ত্তব্য কর, স্ত্রীর পদসেবা কর, পুত্র কন্যাদের পদসেবা কর, ঈশ্বরের আদেশ পালন কর, এক আনা যদি কম হয়, নরকে গমন। ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি স্ত্রী পুত্রাদির মনে দুঃখ দাও, বিচারপতি বিচার করিবেন। ঔষধ বিনা যদি স্ত্রী মরে, যোগী, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। এক ছিল এই মত, যোগসাধন করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিবে; আর এক ছিল এই মত, যদি নিতান্তই সংসারে থাকিয়া যোগধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, তবে জীবন্মুক্ত হইয়া সংসার সম্ভোগ করিতে হইবে। এই উভয় মতকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া এই মত স্থাপিত হইল যে, যোগী শ্মশানবাসী অথবা নির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া বাস করিবেন। যোগী সম্পূর্ণ অন্ধ হইবেন, তাঁহার পক্ষে জ্যোতিও অন্ধকার। সেই যোগীর কাছে স্ত্রী আসিবে, তাঁহার পুত্রাদি হইবে, গৃহধর্ম্ম পালন হইবে, সমুদায় যোগী ভাবে, অর্থাৎ কিছুই নাই এই ভাবে। যোগী সম্পূর্ণ অনাসক্ত। পিতা মাতা গুরুজন ভক্তিভাজন, স্বামী স্ত্রী প্রণয়ভাজন, সন্তানাদি স্নেহাস্পদ, ইঁহাদের প্রতি কি যোগীর আসক্তি হইবে না? যদি হয়, তবে যোগ-শাস্ত্রের অপমান হইল। স্ত্রীর প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ কর, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দাও, ষোল আনা সংসারধর্ম্ম পালন কর; কিন্তু তোমার মন অবাতকম্পিতদীপশিখার ন্যায় অবিচলিত। যোগী হইয়াছ বলিয়া সংসারী হইবে না, কি লজ্জার কথা!! সংসারধর্ম্ম পালন করিতে যদি সাহস না হয়, যোগাভিমানী, তোমাকে শত ধিক্! কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাবৎ কার্য্য করিবে, সকলের সেবা করিবে; কিন্তু নিজে নির্লিপ্ত থাকিবে। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে তোমার হস্তে আনিয়া দিয়াছেন,

তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিবে, তাঁহাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিবে। গ্রহণ করুন আর না করুন, স্ত্রীর কাছে যোগের কথা বল; ঈশ্বর দিন দেন দিবেন, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইবেন। আজ ফল দেখিতে পাও আর না পাও, ছেলেকে ধর্ম্মের কথা ব'লে যাও; কিন্তু সাবধান, তুমি কাহারও প্রতি আসক্ত হইবে না, তুমি অনন্তকালের লোক ব্রহ্মপুত্র, তুমি কেবল তোমার ধর্ম্মের সংসার করিয়া যাও। বৈরাগ্যসম্পর্কে অদ্য এই পর্য্যন্ত।

সুন্দরোপাসনা।

কলুটোলা, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ৪ঠা এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই যে ভক্তির শেষ বিভাগ, সুন্দরের উপাসনা, সুন্দর সাধন, এটি কেবল দ্বিতীয় বিভাগের পরিপক্কাবস্থা মাত্র। শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলময়কে দর্শন করিতে করিতে যে ক্রমে মত্ততা হয়, সেই মত্ততা হইতেই এই শেষ বিভাগের আরম্ভ হয়। এক দিকে যিনি 'শিবম্', তিনি বারম্বার ভক্তের নয়নগোচর হওয়াতে, অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া ভক্তের নিকট 'সুন্দরম্' হইলেন; আর এক দিকে ভক্তের প্রেম ভক্তি বারম্বার উচ্ছ্বসিত হইয়া ঘনীভূত মোহ, মত্ততা অথবা মুগ্ধাবস্থা লাভ করিল। ঈশ্বরের অত্যন্ত দয়া দর্শনে অত্যন্ত গাঢ় প্রেম হয়, আবার ক্রমাগত দয়ার উপর দয়া দেখিতে দেখিতে যখন ঈশ্বর "দয়াঘন" "ঘন প্রেমের আধার" হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তিনি আশ্চর্য্য মনোহর রূপ ধারণ করেন, তাঁহার ঘন রূপের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং গভীর হয়। সেই রূপ দেখিলে ভক্তের প্রেম অত্যন্ত ঘনীভূত হয়। ঈশ্বর ভক্তের সম্মুখস্থ অল্প স্থানের মধ্যে তাঁহার আপ-

নার ঘন প্রেম দর্শন করান। সেই প্রেম দর্শন করিলে প্রেম হয়, কিন্তু মত্ততা হয় না, সৌন্দর্য্য না দেখিলে মন মোহিত হয় না। তবে কি প্রেম কদাকার? না, কিন্তু দর্শকের পক্ষে প্রেমের সেই সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে, যে প্রেম সে দেখিতেছে, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক প্রেম না হইলে, সে তাহাতে সৌন্দর্য্য না দেখিতে পারে, সুতরাং তাহার মোহ হয় না। অতএব ক্রমাগত ঈশ্বরের ঘন হইতে ঘনতর দয়া দেখিবে, তিনি দয়াঘন হইয়া অতি সুন্দর হইয়াছেন, এই সুন্দর রূপ ভাবিতে ভাবিতে মোহিত হইবে। মোহিত হওয়া কি? অবাক্ হওয়া, বশীভূত হওয়া, যেমন লোক মদ্যপানে মত্ত হয়। একটি লোক পথে চলিতেছিল, হঠাৎ পথিমধ্যে একটি সুন্দর বস্তু দেখিল, তাহার চক্ষু স্থির হইল, আর সে চলিতে পারে না; সৌন্দর্য্য মানুষকে অচল এবং বশীভূত করে। ঈশ্বরের যতই ঘনরূপ দেখিবে, ততই প্রগাঢ়রূপে মোহিত হইবে। তবে মোহিত হইলে কি মানুষ নড়ে না? তবে কীর্ত্তনাদিতে মানুষ নৃত্য করে কেন? মোহের অবস্থাতে লজ্জা ভয় বিলোপ হয়, তখন কেহই লজ্জা ভয়ের অনুরোধে কোন কার্য্য করিতে পারে না; কিন্তু মোহের অবস্থাতে মানুষ একেবারে জ্ঞানহীন কিম্বা চৈতন্যবিহীন হয় না, আনন্দের বেগে, মুগ্ধ হওয়ার প্রভাবে সে নৃত্য করিতে থাকে। যদি সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র মন মোহিত হয়, তবে আবার নাচিবে কেমন ক'রে? নাচিলে কি মন অস্থির হইয়া গেল? সৌন্দর্য্যের প্রতি কি আর দৃষ্টি রহিল না? নৃত্যের প্রতি দৃষ্টি হইল? বাহিরের অস্থিরতা কি মনের অস্থিরতা জন্মাইল? না। যেমন চারি পাঁচটি কলস মস্তকে লইয়া নর্ত্তকী নৃত্য করে, গৃহস্থেরাও হয়ত দুই তিনটি কলস মস্তকে বহন করে, তাহাদের মস্তক স্থির থাকে; অথচ শরীর নৃত্য করিতেছে, চলিতেছে; সেইরূপ চক্ষু বিদ্ধ রহিল সেই

সৌন্দর্য্যে, প্রাণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে সেই সৌন্দর্য্যে, শরীর কেবল নৃত্য করিতেছে। ভিতরে মন সেই সৌন্দর্য্যের আকরকে দেখ্‌ছে, বাহিরে শরীর নাচ্‌ছে, হাস্‌ছে, কাঁদ্‌ছে। যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা যখন নাচে কিম্বা হাসে, অমনি তাহাদের ভিতরে যোগ কাটিয়া যায়; কিন্তু যথার্থ ভক্ত চক্ষুকে সেই সৌন্দর্য্যরসে বদ্ধ করিয়া রাখেন। দর্শকের নয়ন স্থির রহিল সেই সৌন্দর্য্যে, তাহার চক্ষু, হস্ত, পদ আনন্দ প্রকাশ করিল, ক্ষতি কি? ইহাই যথার্থ মুগ্ধ হওয়া। ঈশ্বরের ঘন গভীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য যতবার দেখিবে, তত অধিক পরিমাণে মোহিত হইবে এবং সেই পরিমাণে প্রাণ স্থির হইয়া আসিবে। মুখ নানা প্রকার প্রলাপবাক্য বলিতে পারে, শরীর দৌড়িতে পারে; কিন্তু মন সেই কলসবাহকের ন্যায় স্থির হইয়া রহিয়াছে। অতএব বাহ্যিক লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না। কেবল ভিতরে বারম্বার অনিমেষ-নয়নে তাঁহাকে দেখিবে। প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্রে মুগ্ধ হওয়া, সেই ঘন হইতে ঘনতর সৌন্দর্য্য দেখা, তৃতীয় বিভাগে কোন নূতন প্রকার সাধন নাই। সেই শিবপূজার 'শিবম্' অত্যন্ত প্রেমময়। প্রেম ঘন, প্রেম ঘনতর হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইলেন এবং সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভক্তের মন মোহিত হইল। ক্রমে যত সৌন্দর্য্য দেখিবে, তত প্রগাঢ় মোহ হইবে। ভিতরে স্থির রহিল, বাহিরে চঞ্চলতা। যদি ভিতরের চক্ষু অন্য দিকে তাকাইতে চায়, তবে জানিবে, সেই সৌন্দর্য্য দেখা হয় নাই। যখন প্রাণ সেই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আর অন্য দিকে যাইতে ইচ্ছা করিবে না, তখন জানিবে, প্রাণ স্থির হইয়াছে। যে পরিমাণে অন্য দিকে যাইবে, সেই পরিমাণে মোহের অল্পতা।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে যে ঈশ্বরের প্রতিভার সৌন্দর্য্য-দর্শন হয়, তাহা বাস্তবিক তাঁহার সৌন্দর্য্য-দর্শন নহে। সর্ব্বোচ্চ মুগ্ধাবস্থাতেও জ্ঞান

থাকিবে যে, আমি মোহিত হচ্ছি; কিন্তু নড়্‌তে পার্‌ছি না। চক্ষু খুলিয়াও সত্য দর্শন হইবে।

শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য।

কলুটোলা, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, সংসারসম্বন্ধে বৈরাগ্য কি এবং কি আকার ধারণ করে, তুমি ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে যেমন বাহির হইতে ভিতরে এবং ভিতর হইতে বাহিরে, যোগের দুই প্রকার গতি শুনিয়াছ, বৈরাগ্যেরও সেইরূপ দুই প্রকার গতি আছে। এক, অপদার্থ হইতে পদার্থে, আর এক, পদার্থ হইতে অপদার্থে। বাহিরের এ সমুদায় অপদার্থ, কিছুই নহে, এ সমুদায় অসার, ইহা জানিয়া যে ভিতরে পদার্থ অন্বেষণ করা, তাহাই অপদার্থ হইতে পদার্থে যাওয়া। যত বিষয় ভাল না লাগে, তত বিষয়ের অতীত যিনি, তাঁহাকে ভাল লাগে। যত পৃথিবীর অসারতা বুঝিবে, তত ব্রহ্মের সারতা অনুভব করিবে; যত বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইবে, তত ভিতরের আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। এই যে বৈরাগ্য, ইহা অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য, যাহা পদার্থ হইতে অপদার্থে গমন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি; সে কিরূপ? পদার্থ পাইয়াছি বলিয়া অপদার্থ ভাল লাগে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্য হইল বিষয়রসে মন তৃপ্ত হয় না বলিয়া, সংসার ভাল লাগে না বলিয়া, যিনি বিষয়ের অতীত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া। দ্বিতীয় প্রকার

বৈরাগ্য হইল, ঈশ্বরকে পাইয়া পূর্ণকাম হইয়াছি বলিয়া আর বিষয়-সুখভোগের বাঞ্ছা নাই। অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন সন্ন্যাসী উদাসীনের অবস্থা। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি প্রকৃত যোগীর অবস্থা। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগবিধি। যত বিষয়লালসা-ত্যাগ, তত ব্রহ্মপ্রাপ্তির আনুকূল্য। যত ছাড়িবে সংসারে, তত পাইবে পুণ্য-লোকে। ইহা বৈরাগ্যের প্রথম পথ। শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর শাস্ত্র কি? যখন, যিনি এত বড় তাঁহাকে পাইয়াছ, তখন আর কেন অসারের বাসনা কর? পদার্থ পাইয়া যে অপদার্থত্যাগ, তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। পদার্থলাভ উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যের হেতু। ভাল হইব বলিয়া সংসার ছাড়িব, উৎকৃষ্ট বৈরাগীর মনে এই চিন্তার স্থান নাই। কেন না, তাঁহার মন পূর্ণ। পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটি ফোঁটা সংসারের সুখও রাখা যাইতে পারে না। যেমন ধর্ম্মগম্ভীর লোক ছেপ্‌লা চঞ্চলচিত্ত লোক-দিগের সঙ্গে থাকিতে পারে না, যেমন যথার্থ বণিক সোণা রূপো ভিন্ন সামান্য ঝুটো বস্তু লইয়া কার্য্য করে না, সেইরূপ যিনি পদার্থ পাইয়া-ছেন, তাঁহার আর অপদার্থ ভাল লাগে না। ভিতরে যদি সূর্য্য থাকে, বাতি জ্বালে কে; এই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যের যুক্তি। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে দীনতাবৃদ্ধি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, কল্যকার জন্য চিন্তা-বিহীনতা, দুঃখী ভিক্ষুকের ন্যায় প্রতিদিন ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করা। শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর পক্ষে আহারচিন্তা প্রভৃতি স্বতন্ত্র রহিল না। ব্রহ্ম যাহা বলেন, তিনি তাহা করেন। ব্রহ্মেতেই তাঁহার স্থির নিষ্ঠা। সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্যজ্ঞানে করেন। প্রথম প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া। একজন একটি টাকা দিলেন, স্বর্গের অনেক ধন পাইবেন বলিয়া, অন্য জন স্বর্গের ধন পাইয়াছেন বলি.া পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত। বিশেষ বিশেষ

অবস্থাতে এই দুই বিধিই অবলম্বনীয়। কিন্তু, হে যোগার্থী, তোমার ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, শেষ বিধিই শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্রেণীর বৈরাগ্যে ত্যাগ বহু আদৃত, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈরাগীর অভিধানে 'ত্যাগ' এই শব্দই নাই। আমি একটি পয়সা দিলাম টাকা পাইবার জন্য, ইহাতে ত্যাগ বলা যায়; কিন্তু উচ্চাবস্থায় যখন একটি টাকা পাইলাম, তখন একটি পয়সা দেওয়াতে যে ত্যাগ বলে, সে মূর্খ মিথ্যাবাদী। যেখানে কেবল লাভ, সেখানে ত্যাগ কি? নয় তেষট্টি পয়সা হইল। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ স্বর্গরাজ্য পাইবে বলিয়া, যখন স্বর্গলাভ হইল, তখন আর ক্ষতি কি? বাস্তবিক একটি পয়সা ছাড়া ত্যাগ হয় কি না? ত্যাগ হয় না। একটি টাকার তুলনায় একটি পয়সা কিছুই নহে। ব্রহ্মকে পাইলে আর সেরূপ সংসারপিপাসা থাকে না, সুতরাং সংসার ছাড়া আর ত্যাগ কি? যতদিন ভাল বস্ত্র না পাও, ততদিন ছেঁড়া কাপড় ছাড়া ত্যাগ; কিন্তু ভাল বস্ত্র পাইলে আর ছেঁড়া কাপড় ছাড়া ত্যাগ কি? বাড়ী প্রস্তুত হইল, মনোগৃহ ধনে পরিপূর্ণ হইল, তখন জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিলে ইহা আর ত্যাগ কি? অতএব বিষয়-লালসা ছেড়ে দেওয়াকে শ্লাঘা মনে করিও না। যতদিন মনে করিবে, আমি ত্যাগ করিতেছি, ততদিন তুমি অর্দ্ধ বৈরাগী। যখন জানিবে, আমি ত্যাগ করিতেছি না, তখন পূর্ণ বৈরাগী। আজ এই পর্য্যন্ত।

জীবনগত ভক্তি।

কলুটোলা, ২৫শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ৬ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এই যে মুগ্ধভাব সৌন্দর্য্য দেখিয়া হয়, এইটির স্থান কোথায়? শরীরে কি মনে? হৃদয়ে কি জীবনে? সৌন্দর্য্য

দেখিয়া মত্ত হইলে মনই মত্ত হয়, তবে চক্ষু দিয়া জল পড়ে কেন? শরীর নৃত্য করে কেন? এইজন্যই জিজ্ঞাসা করি, এই মুগ্ধভাব শারীরিক কি মানসিক? যখন মনের ভিতরে মত্ততার ভাব উথলিত হয়, তখন সেই ভাব বাহিরে অর্থাৎ শরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়, শরীর মনের সহানুভূতি করে। শরীর মন এক হয়, শরীর মনের অনুগামী সহগামী হয়, মনের সঙ্গে শরীরের বন্ধুতা হয়, যোগ হয়; কিন্তু বাস্তবিক মনই মত্ত হয়। তবে বাহিরে যে মত্ততার লক্ষণ দেখা যায়, তাহা খাঁটি মত্ততা নহে। ভিতরে যে মত্ততা হয়, সেইটিই মত্ততা। বস্তু যাহা প্রার্থনীয়, তাহা ভিতরে। শরীরে মূর্চ্ছা কিম্বা অজ্ঞান হওয়া মত্ততা নহে। প্রকৃত মত্ততা সজ্ঞানতা। চৈতন্য ভক্তের নাম। অচেতন ভক্ত, আর সোণার পাথরবাটী সমান। চৈতন্য বিনা ভক্তি কোথায়? যাঁহাকে ভক্তি করিতেছ, তাঁহারই সুন্দর মুখ দেখিতেছ, সেই জ্ঞান চাই। যদি জ্ঞান চৈতন্য না থাকে, তবে বিমোহিত হইবে কে? অতএব অচৈতন্য ভক্ত হয় না। চৈতন্য আধারে ভক্তি হয়। অচৈতন্য অবস্থায় ভক্তি অসম্ভব। যেখানে চেতন পুরুষ, সেখানে ভক্তি সম্ভব। পাথরে ভক্তিভাব হয় না। মোহিত হওয়া মূর্চ্ছিত হওয়া এক নহে। ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্য্যরস পান করেন। যাই দর্শন কেটে যায়, অমনি মত্ততাও কেটে যায়। নিদ্রা, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা, কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না। এইটি ভক্তিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। অতএব ইহা স্থির হইল যে, মত্ততা চৈতন্যময় মনের মধ্যে হয়, শরীরে নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, মত্ততা হৃদয়ে কি জীবনে? ভাবের মত্ততা অনেকের হয়; অনেকে সকল কর্ম্ম কার্য্য ছাড়িয়া, হয়ত দুই চারি ঘণ্টা নিজের হৃদয়ের ভাবেতেই মত্ত হইয়া থাকেন। সেই ভাবের মত্ততাতেই

তাঁহাদের অত্যন্ত উল্লাস এবং আনন্দ। কিন্তু প্রকৃত মত্ততা, হে ভক্তি-শিক্ষার্থী, তুমি জানিয়া রাখ, জীবনগত। কেবল হৃদয় ভক্তির আধার নহে; সমস্ত জীবন ভক্তির মত্ততার আধার। প্রকৃত মত্ততায় কেবল হৃদয় নহে, কিন্তু সমস্ত জীবন মধুময় হয়। জল যদি কেবল বৃক্ষের শাখায় প্রদান কর, তাহা সমস্ত বৃক্ষকে পরিপোষণ করিতে পারে না; কিন্তু যে জল বৃক্ষের মূলদেশে সিক্ত হয়, তাহা শাখা, প্রশাখা এবং পল্লবাদি-পূর্ণ সমস্ত বৃক্ষকে পরিপুষ্ট এবং সতেজ করে। সেইরূপ যে মত্ততা আত্মার গভীরতম মূলদেশে যায়, তাহা সমস্ত জীবনকে মধুর করে। প্রকৃত মত্ততা হৃদয়ের একটি সাময়িক ভাব নহে, ইহা জীবনের অবস্থা। একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিবে। যাহারা মাদকের পূর্ণ মত্ততা ভোগ করিতে চায়, তাহারা সুচতুর হইয়া খুব ভিতরে বারম্বার দম টানিয়া লয়; ভিতরে সেই মাদকের ধুঁয়া এত টানিয়া লয় যে, তাহাতে ভিতর পূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ সুচতুর ভক্ত ভিতরে সেই সৌন্দর্য্যরস এতদূর আকর্ষণ করিয়া লয় যে, তাহাব সমস্ত জীবন, এবং অন্তর বাহিরের সমস্ত ব্যাপার মিষ্ট হইয়া যায়।

বৈরাগ্য আচ্ছাদন।

কলুটোলা, ২৬শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ৭ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগ্যবিষয়ে আরও দুই পাঁচটি কথা আছে, শ্রবণ কর। যে বৈরাগ্য অহঙ্কারের কারণ হয়, তাহা মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। আমি এতদূর স্বার্থত্যাগ করিয়া বড় হইয়াছি, এই জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয় না; অতএব যাহাতে অহঙ্কারের উত্তেজনা না হয়, এরূপ আচরণ করিতে হইবে। ভিতরে যাহা, বাহিরে তাহা

নহে, কপটতা। ভিতরে মন্দ, অথচ বাহিরে আপনাকে ভাল বলিয়া প্রকাশ করা দূষণীয় কপটতা; কিন্তু ভিতরে ভাল, বাহিরে লোককে তাহা জানিতে না দেওয়া যদি কপটতা হয়, তাহা প্রার্থনীয়। লোক জানুক, আমার কতদূর দীনতা এবং কতদূর বৈরাগ্য হইয়াছে, এ ভাবে কাজ নাই। কষ্ট যদি লইতে হয়, অন্ধকারের ভিতরে গিয়া প্রবেশ কর। ভিতরে ভিতরে বৈরাগ্যের চাপ যাহাতে অনুভূত হয়, এমন উপায় কর। বাহিরের লোকদের দেখাইবার আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয়তঃ, উহা বাহিরে না হইয়া অন্তরে বদ্ধ থাকা এইজন্য আবশ্যক যে, তাহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবে না। অনেকে বাহিরের লক্ষণ দ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য বুঝিতে না পারিয়া অনধিকার চর্চ্চা করে। বৈরাগ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহারা অনেক অসার কল্পনা এবং কুতর্ক করে। অতএব এ সকল গভীর বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সকল শাস্ত্রেই যাহা নিগূঢ়, তাহা গুপ্ত। যতদূর সম্ভব, বৈরাগ্য গোপনীয়। অতএব বৈরাগ্য দেখাইবার জন্য সাহসী হইবে না। যিনি দেখাইবেন, তাঁহার অহঙ্কার এবং যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। যদি ভিতরে দীনতা থাকে, বাহিরে অন্ততঃ এমন পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যে, তত দীনতা প্রকাশ না পায়। যদি মনের ভিতর শুষ্কতা হয়, বাহিরে তৈল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে; ভিতরে যদি অপমানিত এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যথিত হও, বাহিরে অম্লান ভাব এবং ভদ্রতাবসনে তাহা আচ্ছাদন করিবে। ধনীদের ন্যায়ও হইবে না, অত্যন্ত দরিদ্রদিগের ন্যায়ও হইবে না। শুধু তাহাও নহে, আরও একটি নিয়ম রাখিতে হইবে। যদি উপবাস কর, সমস্ত দিনের মধ্যে কিছু আহার করিবে, তাহা হইলে অহঙ্কার হইবে না। অত্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব

ভাল বস্ত্র পরিবে। অবলুণ্ঠিত হইলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব বাহ্যিক কিছু করিবে না, মনেতে অবলুণ্ঠিত হইবে। বৈরাগ্যের দিকে কিছুমাত্র অহঙ্কার রাখিবে না। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বৈরাগ্য, দীনতা, ভিখারীর ব্রত, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান। বাহিরের লোক বৈরাগী বলিবে, কিন্তু কষ্টগ্রাহী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা করিতে পারিবে না। বরং এই বলিয়া নিন্দা করিবে, এই ব্যক্তি ততদূর বৈরাগী হইতে পারে নাই। বৈরাগ্য লোকে জানিবে না; কিন্তু তোমার মনের ভিতর ষোল আনা বৈরাগ্য, দীনতা, মস্তকমুণ্ডন, কৌপীন, দণ্ড সকলই চাই। তুমি নিজে জানিবে, আমার এ সকলই হইয়াছে। লোকের নিন্দা তোমাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবে, লোকের প্রশংসা তোমার ধর্ম্ম বিকৃত করিবে। লোকে জানিতে পারিল না, অথচ ভিতরে বৈরাগী, ইহা প্রার্থনীয়। জলের বাঁধ জল হয় না, স্থল হয়, পাথর হয়। দীনতাকে রক্ষা করিতে পারে না দীনতা, দীনতার প্রাচীর অদীনতা, দুঃখের প্রাচীর সুখ। কৌপীন পরিয়া আছে যে আত্মা, তাহাকে রক্ষা করিবে ভদ্র বস্ত্র পরিয়া আছে যে শরীর।

নিরবলম্ব ভক্তি।

কলুটোলা, ২৭শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক; ৮ই এপ্রিল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, ইতিপূর্ব্বে এই প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে, ভক্তির মুগ্ধাবস্থা শরীরে কি অন্তরে, হৃদয়ে কি জীবনে? তুমি শুনিয়াছ, যথার্থ মোহিত অবস্থা অন্তরে এবং জীবনে। আবার এই প্রশ্ন, এই মোহিত অবস্থা নির্জ্জনে না সজনে? বাহ্যিক উত্তেজনাতে এক প্রকার ভক্তিভাব হইতে পারে। পাঁচ জন ভক্তের সহিত একত্র নাম সঙ্কীর্ত্তন,

কিম্বা সদালাপ করিলে মন মোহিত হয়; কিন্তু এ সকল কারণে যে ভক্তি হয়, তাহা বাহ্যিক অবলম্বন-সাপেক্ষ। যথার্থ মোহিত ভাব বাহিরের কোন অবলম্বনের উপর নির্ভর করে না, আপনি সংসিদ্ধ হয়। কেবল নির্জ্জনে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দর্শনে যে মুগ্ধাবস্থা, তাহাই যথার্থ নিরবলম্ব ভক্তি। সাধুসঙ্গের গুণে, অথবা ভাল গান শুনিয়া যে মোহিত হওয়া, তাহা অন্য শ্রেণীর ভক্তি; তাহা অবলম্বন-সাপেক্ষ। বহুজনমিলন, বহুকীর্ত্তন ইত্যাদিতে যে মন মোহিত' হয়, সময় বিশেষে যদিও তাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রকৃত নহে; অতএব সর্ব্বোপায়ে এই চেষ্টা করিবে, কেবল খাঁটি অন্তরের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন মন মোহিত হয়। দর্শন হওয়াতেই দর্শকের মন মোহিত হইবে, আর কোন হেতু নাই। প্রকৃত ভক্তি অহৈতুকী, নিরবলম্ব। অতএব মোহিত হইলে কি না, কেবল তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না; কিন্তু অন্তরে সেই খাঁটি রূপ দর্শন করিয়া মোহ হইল কি না, তাহা দর্শন করিবে। সেই আন্তরিক দর্শনে, আন্তরিক গুণ গ্রহণে মন মুগ্ধ হইবে। এই প্রকারে ভিতরে ভিতরে আপনার মধ্যে নির্জ্জনে সেইরূপ দর্শনে এমনি গভীর রূপে মুগ্ধ হইবে যে, চির-জীবন সেই অনন্তরূপসাগরে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে।

দর্শনারম্ভ।

কলুটোলা, ১লা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ১২ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, বৈরাগী হইলে কি করিতে হয়, বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ, যোগের

প্রথম পথ বাহির হইতে ভিতরে। মনুষ্য বুঝিল যে সংসার অসার, সুতরাং সে সংসার ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিবে। বৈরাগ্য না হইলে হৃদয়ে প্রবেশ করা যায় না। কেন না, সংসার টানিবে। এইজন্য যোগশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম সাধন বৈরাগ্যে। অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া প্রথমেই বৈরাগী সারাৎ-সারের অন্বেষণে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করে; কিন্তু বৈরাগীর চক্ষু যাই মুদিত হইল, অমনি ঘোরান্ধকার। সর্ব্বপ্রথমে ঘোরান্ধকার দেখিবে। চিন্তা কি কল্পনা দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিবে না। বাহিরে কিছুই নাই, নেতি নেতি নেতি, এই বলিয়া গাঢ়তম অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহা অভাবপক্ষের সাধন। যখন বাহিরের কোন বস্তু রহিল না, ভিতরের জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন অথবা জঞ্জালশূন্য; সেই অন্ধকারের ভিতরে "সত্যং" আছেন, ইহা সাধন করিতে হইবে। যাহা সৎ, যাহা আছে, যাহা সার বস্তু, তাহা এই অন্ধকার মধ্যে আছে। এই সৎ কেমন করিয়া দর্শন করিতে হয়, কেমন করিয়া এই সৎকে আয়ত্ত এবং ভোগ করিতে হয়, ক্রমশঃ বলা হইবে। প্রথমে ঘন অন্ধকার দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ ঘন কাল দ্বারা হৃদয় ছবিকে কাল কর, সেই কাল জমির উপর সত্যস্বরূপকে আঁকিবে। ভূমি প্রস্তুত হইলে পরে বীজ বপন। চিত্রকর যেমন আগে ভূমিতে কাল রং দিয়া পরে তাহাতে অন্যান্য সুন্দর বর্ণ ফলায়, সেইরূপ হৃদয়ভূমিকে একবার ঘন কাল অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে। পরে তাহার মধ্যে সত্যস্বরূপের জ্যোতি এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে।

মত্ততা।

কলুটোলা, ২রা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ১৩ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, মত্ততা মিষ্টতা,' মিষ্টতা মত্ততা, বাস্তবিক এই দুই মূলেতে এক। মিষ্টরসপানে মত্ততা হয়। যে সামগ্রীতে মত্ততা হয়, সেই সামগ্রী অত্যন্ত মিষ্ট। ব্রহ্ম মিষ্ট কি না? এই প্রশ্নের উত্তর কি দিবে তাহারা, যাহারা ভক্তিরসজ্ঞ নহে। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের অনেক গুণ আছে; কিন্তু ঈশ্বর মিষ্ট কি না, এই প্রশ্নের উত্তর কোন জ্ঞাতস্বরূপে পাওয়া যায় না। ইহা আস্বাদনের ব্যাপার, শরীর মনের অবস্থা। মত্ততার অবস্থায় ঈশ্বর পানে তাকাইলে মিষ্টতা হয়। ভক্তি-শিক্ষার্থী, তুমি এই বিষয়ে সাবধান হইবে, মিথ্যা বলিবে না, কল্পনা করিবে না; মিষ্টরসাস্বাদ না করিতে পারিলে, সরলভাবে বলিবে, মিষ্টতা ভোগ করিতে পার নাই। প্রথমাবস্থায় অবিচ্ছেদে মিষ্ট রস পান করা অতি দুর্ঘট। সকল সময় কে বলিতে পারে, "দয়াময় কি মধুর নাম"? ব্রহ্মনামের মিষ্ট রস পান না করিয়া, ব্রহ্মনাম বড় মিষ্ট, এ সকল কথা বলা ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। হে ভক্তিশিক্ষার্থী, এখন তুমি যে সকল কার্য্য কর এবং যে সকল কথা বল, ভক্তির অনুরোধে তোমাকে সে সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। মিষ্ট তখন বলিতে পার, যখন মিষ্ট খাচ্ছ। সকল সময়ে এবং সকল দেশে, জ্ঞানীর চিনিকে মিষ্ট বলিবার অধিকার আছে। ভক্ত পারেন না, ভক্তকে ঈশ্বর এ অধিকার দেন নাই; তিনি যখন খাচ্ছেন, তখনই কেবল মিষ্ট বলিতে পারেন। ঈশ্বর মধুময়, এই কথা কখন বলা যায়? যখন সেই মধু পান করা হচ্ছে, যখন শরীর মন সেই রসে ডুবে আছে। ঈশ্বরের মিষ্টতা ভোগ করা এবং ঈশ্বর

মধুময় ইহা জানা, এই দুইয়েতে কেমন প্রভেদ জান, যেমন স্বর্গ আর পৃথিবীতে, জল আর পাষাণে, অথবা পুষ্প আর শুষ্ক কাষ্ঠে। ক্রমে সাধন এবং অভ্যাস দ্বারা এ দুইয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। সেই মিষ্ট রস ভোগ করিতে করিতে বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্র মনের মধ্যে আবল্য উপস্থিত হয় এবং প্রেমে হৃদয় ঘোর হইয়া আসে। প্রকৃত মত্ততাসম্পর্কে আপনার ধাত বুঝিবে। এ বিষয়ে মনে মূর্খতা থাকিতে দিবে না। যখন আত্মপরিচয় পাইবে, তখন মত্ততা স্থায়ী করিতে শিখিবে। অন্তরে মিষ্টতা ভোগ করিতে পারিতেছ না, অথচ 'দয়াময় কি মধুর নাম', এই গান করিবার প্রয়োজন কি? যখন মিষ্ট রস ভোগ করিতে পার না, তখন বিচ্ছেদের জ্বালা হওয়া আবশ্যক। অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস পান করা সাধারণ ব্যাপার নহে, কোটি কোটি লোকের মধ্যে যদি চারি পাঁচ জন ভক্ত থাকেন, এমন ধারা আবার কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে দুই একজন কেবল অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস পান করিতে পারেন। যখন মিষ্টতা আস্বাদ করিতে পারিবে না, তখন বলিবে, আমি অত্যন্ত নরাধম; কিন্তু আর আমি পাথর হইয়া থাকিব না, জল হইব, প্রেমিক হইব। ক্রমে ক্রমে দেখিবে, বিচ্ছেদের সময় অল্প হইয়া আসিবে এবং মত্ততার অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে।

মিষ্টতা আস্বাদন হয়ত দুই মিনিট হইল, তাহার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী। যথার্থ রসাস্বাদন প্রাণের ভিতরে মিষ্টতা, আরাম আনিয়া দেয়। হয়ত দুই মিনিট রসাস্বাদন করা হইল, কিন্তু দুই শত মিনিট সেই আরামে থাকিবে। মিষ্ট বস্তু যে সর্ব্বদা আহার করি, তাহা নহে। যেমন শীতল জলে স্নান করিয়া আঃ বলিলে যে আরাম হয়, তাহা সমস্ত দিন থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের মুখচন্দ্র দেখিলে যে অন্তরে মিষ্ট রস

অনুভূত হয়, তাহা সমস্ত জীবনে থাকে, যদি আর তিক্ত রস পান না করা হয়। তিক্ত রস পান করিলে, আবার সেই মিষ্ট রস পান করিবে। কখন মিষ্টতা অথবা মত্ততা ছেড়ে গেল, এই জ্ঞানটি ভক্তি-শিক্ষার্থীর পক্ষে সতেজ থাকা আবশ্যক।

অন্ধকারের প্রশংসা।

কলুটোলা, ৩রা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ১৪ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, এই যে হৃদয়ের ভিতরে অন্ধকার দেখিলে, (অন্ধকার দেখিলে এই শব্দ ঠিক, ইহাতে ভুল নাই, যেমন আলোক দেখা, তেমনই অন্ধকার দেখা) এ অন্ধকার দেখা কি? যেখানে কিছুই নাই, তাহা অন্ধকার। বাস্তবিক যোগসাধন করিতে হইলে এই অন্ধকার দেখিতে হয় অর্থাৎ অন্ধকারের প্রতি নয়ন স্থির রাখিতে হয়। ভিতরের জ্ঞানচক্ষু সমক্ষে, উপরে, দক্ষিণে, বামে, ভিতরে, বাহিরে কেবলই অন্ধকার দেখিবে, তন্মধ্যে কিছুমাত্র জ্যোতি নাই, বিদ্যুৎও নাই, অবিচ্ছিন্ন গাঢ় অন্ধকার। অনেকের পক্ষে এই অন্ধকার সহ্য হয় না। এই নিবিড় অন্ধকার দেখিয়া নূতন বৈরাগীর ইচ্ছা হয়, নয়ন আবার খুলি; কিন্তু এই অন্ধকারকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যোগীর পক্ষে আলোক অসার, এই অন্ধকার সার। যে অন্ধকার যোগাসনে বসিয়া দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মের মুখের আবরণ। এই অন্ধকারের ভিতরে পরম বস্তু। এই অন্ধকারই সেই বস্তু। অন্ধকার রূপে সেই সার সত্তা, নিমীলিত নয়নের ভিতরে যে উন্মীলিত নয়ন, তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকারলক্ষণাক্রান্ত যে জ্যোতির্ম্ময় সত্তা, ঈশ্বরের রাজ্য, তাহা প্রকাশ পায়। এই অন্ধকার পদার্থের অন্ধকার। এই

অহঙ্কার দেখিয়া বালক পলায়ন করে, কিন্তু জ্ঞানী ইহার মধ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করে এবং যোগী আদরের সহিত এই অন্ধকারকে চুম্বন করে, মূঢ় মন এই অন্ধকার সহ্য করিতে না পারিয়া বলপূর্ব্বক চক্ষু খুলিয়া পলায়ন করে। অথবা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলেও সে এই অন্ধকারের মধ্যে আবার তাহার নিজের ইচ্ছামত একটি ছোট জগৎ কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করে এবং সেখানে সংসার চিন্তা করে। যেমন চোর কারাবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সে তাহার ভিতরে আবার তাহার আপনার লুক্কায়িত সামগ্রী ভোগ করিতে লাগিল। খুব যদি কলেতে চাবি দিয়ে, দম দিয়ে রেখে দাও, ভিতরে চলিবেই, বাহিরে স্থির থাকিবে। সেইরূপ ভিতরে যতক্ষণ আসক্তির দম থাকিতেছে, ততক্ষণ মন সংসারের বস্তুতে ঘুরিতেছে। মূঢ়ের এই অবস্থা হয়। জ্ঞানী যিনি, তিনি অন্ধকার দেখিয়া ভয় পান না; কিন্তু তাহার মধ্যে বসিয়া প্রতীক্ষা করেন, আশা করেন, বিশ্বাস করেন। যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি আঃ বলিয়া অন্ধকারকে আলিঙ্গন করেন। তিনি বলেন, এসেছ প্রিয় অন্ধকার, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি। যেমন সৃষ্টির মধ্যে জল, পর্ব্বত, ফুল, বৃক্ষ ইত্যাদি এক একটি পদার্থ, নিরাকার অন্ধকারও সেইরূপ একটি বস্তু এবং যোগীর পক্ষে পরম বস্তু। ঘোর কাল, ঘন, ঘনতর, ঘনতম অন্ধকার দেখিলে শরীর স্তম্ভিত হয়, লঘুভাব চলিয়া যায়। যথার্থ যোগী বলেন, অন্ধকারই বস্তু, চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখা যায়, এ সকল অবস্তু। অন্ধকারই একটি সুখের বস্তু। ইহা কিছুদিন সাধন এবং শিক্ষা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্ধকারস্পর্শে গাম্ভীর্য্য হইবে, পরে সুন্দরম্ হইবে। অন্ধকারের এত মহিমা, এত প্রতাপ। অন্ধকার পূজা কর। খুব অন্ধকারে থাকিতে তোমার স্পৃহা হউক।

ভক্তি দুর্লভ কেন?

কলুটোলা, ৪ঠা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ১৫ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, ভক্তি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাব হইতে হয়। এইজন্য ইহা সুলভ এবং এইজন্যই ইহা দুর্লভ। সুলভ কেন? স্বাভাবিক যে সকল ভক্তির উত্তেজক ব্যাপার আছে, তাহার মধ্যে হৃদয়কে রাখিলেই ভক্তি হয়। দুর্লভ কেন? ভক্তি এত কোমল যে, একটু সামান্য বিঘ্ন হইলেই আর ভক্তি থাকে না। ভক্ত চটে না, কিন্তু ভক্তি চটে। সামান্য কারণে ভক্তি চলিয়া যায়। চক্ষুতে যেমন চুলপড়া সামান্য কারণ হইলেও চক্ষুঃপীড়া হয়, সেইরূপ সামান্য কারণে ভক্তির বিদায় হয়। তবে ভক্তির সর্বোত্তম অবস্থা যে মত্ততা, তাহার প্রয়াসী যদি তুমি হও, ভক্তিশিক্ষার্থী, বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মত্ততা শীঘ্র হইতে পারে, আবার শীঘ্রই যাইতে পারে। যদি একটু অন্যথা হয়, দেখিবে, মত্ততা চ'টে গেল। ভক্তের অভিমান নাই; কিন্তু ভক্তির বড় অভিমান হয়। এইজন্য ভক্তির সহবাস বড় কঠিন। ভক্তি সপত্নী সহ্য করে না। সমস্ত হৃদয় ভক্তির হাতে দিতে হবে, একটু অন্য দিকে ঝুঁকিলে অমনি দেখিবে, ভক্তি কোথায় গেল। এইজন্যই ভক্তি সুলভ এবং দুর্লভ। যখন ভক্তি আসে, ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়; আর যদি একবার ভাঙ্গে, ভক্তি আর গড়ে না। ভাঙ্গিলে আবার গড়া কঠিন, কাচের মত। অত যে ব্যাপার, তাহার মধ্যে যদি একটু মনের বৈলক্ষণ্য, চিত্তবিকার হয়, অমনি সমস্ত নষ্ট হয়। যেমন অত দুগ্ধ, তাহার মধ্যে যদি একবিন্দু টক্ দাও, সেই দুগ্ধের আস্বাদন আর থাকে না। ধাবিত হইয়া আসিতেছে যে মত্ততা, তাহাকে কোন

প্রকারে বাধা দিবে না। এ সকল সূক্ষ্ম ব্যাপার ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলেই তাঁহার সম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যক্তি এবং বস্তুর প্রতি অনুরাগ হইবে। যে পুস্তকে তাঁহার নাম আছে, যে গৃহে তাঁহার পূজা হয়, যে সকল সাধকেরা তাঁহার পূজা করেন, প্রগাঢ় মত্ততার নিয়মানুসারে এ সমুদায় স্থানে অনুরাগ যাইবে। যে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ঈশ্বরের নাম অনুকীর্ত্তিত হয়, তাহার প্রতি যদি কেহ অবহেলা করে, সে তাহার ভক্তিপথে কণ্টক আনয়ন করে এবং সেই পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি মত্ত হইব, আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ব্যক্তি এবং বস্তুকে ভালবাসিব না, ইহা হইতে পারে না। প্রণয়ে মত্ততা সর্ব্বগ্রাসী। যে আসনে বসিয়া ভক্ত পূজা করেন, সেই আসনের সূতগুলি পর্য্যন্ত মনোহর হয়। যাঁহারা বিশেষরূপে ঈশ্বরের ভক্ত, সেই ভক্তদিগের বাড়ী, তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র, সেই স্ত্রী পুত্রদিগের ভৃত্য, সেই ভৃত্যদিগের গ্রাম ও ভৃত্যদিগের বন্ধুরাও ঈশ্বরপ্রেমমত্তের প্রিয় হয়। এক ভক্তিশৃঙ্খলে সমুদায় বদ্ধ হয়। একটি টানিলে সমুদায় আসে, যদি না আসে, তুমি ভক্ত নহ। মিষ্টতার কথা শুনিয়াছ। যেমন মিষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে, তেমনি মিষ্টতার সহিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সমুদায় জীব এবং বস্তুকে দেখিবে। যে যে অক্ষরে ঈশ্বরের নাম হয়, সেই প্রত্যেক বর্ণ তোমার পক্ষে মিষ্ট হইবে। যে রাজ্যের রাজা ভক্তবৎসল, তাহার সমস্ত পদার্থ মধুময় হইবে। প্রাণ মন সুমধুর হইবে। অন্তরে বাহিরে মধু প্রবাহিত হইবে। কেবলই মধুর ভাব, মিষ্টভাব, মোহিত ভাব, প্রসন্ন ভাব। অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম্মপুস্তক, কি সঙ্গীত, কি খোল, ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা অনাদর আসিতে দিবে না। এইরূপে প্রগাঢ়, প্রকৃত মত্ততা পাইবার জন্য আপনাকে স্বভাবের স্রোতে ফেলিয়া দিবে।

ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।

কলুটোলা, ৫ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক ; ১৬ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, দেখিলে মনের ভিতর সমুদায় অন্ধকার হইল। কোন কষ্টেতে কিম্বা বহু আয়াসে এই অন্ধকারের প্রকাশ হইল না। এই অন্ধকারে আগমন স্বাভাবিক। যোগাসনে বসিয়া চক্ষু নির্মীলন করিলেই অন্ধকার দেখা যায়। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও প্রদীপ দেখা যায় মূঢ়তা দ্বারা। মূঢ়তা কি? অন্ধকারে আলোক দেখা, আলোকে অন্ধকার দেখা। জ্ঞান কি? আলোকে আলোক দেখা, অন্ধকারে অন্ধকার দেখা। মূঢ় ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিলেও কল্পনারূপ প্রদীপ জেলে সেই অন্ধকার মধ্যেও আপনার স্ত্রীপুত্রসম্বলিত একটি সংসার দেখে। যথার্থ জ্ঞানী যোগী অন্ধকারে একটি প্রদীপকেও উদ্দীপ্ত হইতে দেন না। এই অন্ধকার ছবি আঁকিবার জমি, বীজ বপন করিবার জমি। অন্ধকার একটি প্রকাণ্ড খনি, যাহা হইতে বহুরত্ন প্রসূত হয়। এই অন্ধকার একটি অক্ষয় ভাণ্ডার, যাহা হইতে অনেক সামগ্রী অভাবের সময় বাহির হইবে। আদিজ্যোতি যোগেশ্বর ঘোর অন্ধকার হইতে যোগবলে যোগধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। এই অন্ধকার সৃষ্টির নৈমিত্তিক কারণ। চিত্রকর এই অন্ধকারের উপর ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করেন। কৃষক এই অন্ধকার ভূমির উপরে যোগবৃক্ষ উৎপন্ন করেন। ভাণ্ডারী এই অন্ধকাররূপ অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ সামগ্রী বাহির করেন। ধনী বণিক্ এই অন্ধকাররূপ খনি হইতে অমূল্য রত্ন সকল লাভ করিয়া সেই রত্নে ব্যবসায় করিয়া আপনার সম্পদ্ বৃদ্ধি করে। এই অমিশ্রিত, ঘন, নিবিড় অন্ধকারের

ভিতরে সকলই চাপা আছে। এই অন্ধকার হইতে নির্ম্মাণ করিবেন যিনি, সেই নির্ম্মাতা প্রকাণ্ড যোগের অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, এই অন্ধকার জমি হইতে প্রকাণ্ড যোগবৃক্ষ উৎপন্ন করিবেন। যেখানে কিছু নাই, অর্থাৎ অন্ধকার, আকাশ, শূন্য, সেখানে যদি অঙ্গুলি দ্বারা ছবি আঁক, দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে; কিন্তু সেই আকাশে তাহার দাগ থাকিবে না। তেমনি এই অন্ধকার মধ্যে যদি ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি আঁক, তাহা থাকিবে না। এই ঈশ্বরের নিয়ম। যোগরূপ তুলী দ্বারা এই অন্ধকারে ব্রহ্মের স্বভাব, ব্রহ্মের স্বরূপ, মূর্ত্তি আঁক; কিন্তু এই আঁকিলে, আর চিহ্ন নাই। এই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। অন্ধকারের ভিতরে নিরাকার সাধন, তাহা না হইলে সাকার পূজা হয়। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, ঘোর অনন্ত অন্ধকারের এক ক্ষুদ্রতর স্থানে ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ভাবিত হইল, আবার তাহা বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। এই অন্ধকার সর্ব্বগ্রাসী। সাধকের ইচ্ছা হইলেই তাঁহার মনের এই অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি আঁকেন, কিন্তু পরে আবার সেই অন্ধকাররূপ প্রকাণ্ড সাগরে নিরঞ্জনের বিসর্জ্জন হয়। এই অন্ধকারে আছেন তিনি। অন্ধকার হইতে তাঁহাকে টান, তিনি প্রকাশিত হইবেন। নিরাকারের বিসর্জ্জন অন্ধকারে। অন্ধকারে তিনি রহিলেন। এই অন্ধকারকে মিশ্রিত হইতে দিবে না, ইহার মধ্যে প্রদীপ জ্বালিতে দিবে না। সিন্ধুকের মধ্যে যেমন রত্ন থাকে, এক অন্ধকাররূপ সিন্ধুকের মধ্যে যোগীর পরম রত্ন যোগেশ্বর বাস করিতেছেন। যত্নের সহিত এই অন্ধকার মধ্যে তাঁহাকে রাখিবে, আবার আবশ্যক হইলে এই অন্ধকার হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া লইবে।

নাম-মাহাত্ম্য।

কলুটোলা, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ২০শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, নাম অমূল্য ধন, যদি বস্তুতে প্রেম হয়, বস্তুর নামেও প্রেম হয়। বস্তু ছাড়া নাম নহে, নাম ছাড়া বস্তু নহে। যে কথা বলিলে সেই বস্তু বুঝায়, সেই কথা বস্তুর সঙ্গে থাকাতে, সেই কথাতেই মত্ততা হয়। যদি বস্তু সুন্দর হয়, তাহার নামও সুন্দর হয়; যদি বস্তু প্রিয় হয়, তাহার নামও প্রিয় হয়; যদি বস্তু তিক্ত হয়, তাহার নামও তিক্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে তাঁহার সম্বন্ধীয় সমুদায় বস্তু এবং জীবের প্রতিও প্রেম হয়। তবে তাঁহার নামের প্রতি যে প্রীতি হইবে, আশ্চর্য্য কি? নামেতে তাঁহাতে প্রভেদ নাই। নামকে সমাদর করা আর বস্তুকে সমাদর করা এক। যে নামেতে মত্ত হয় নাই, সে প্রেমে মত্ত হয় নাই; কিন্তু, এই নাম-সম্বন্ধে একটি কথা তুমি বিবেচনা করিবে। নামে মত্ততা আগে, না পরে? কেহ কেহ বলে, নিকৃষ্ট সাধকের জন্য নাম সাধন আবশ্যক। মুখে একবার নাম উচ্চারণ করিলে মূঢ়তম ব্যক্তির পরিত্রাণ হয়। এই কথায় সায় দিব কি না? বস্তুর আগে নাম, না পরে নাম? সাধারণ চলিত মত এই, যিনি বস্তু ধরিতে পারেন না, তাঁহারই পক্ষে নাম সাধন বিধেয়; কিন্তু ইহা যথার্থ মত নহে। বাস্তবিক তিনিই নামের মহিমা বুঝিতে পারেন, যিনি বস্তুর মহিমা বুঝিয়াছেন। বস্তু দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, অর্থাৎ আগে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম অনুরাগ হইলে, পরে সেই বস্তুর নামেও প্রেম হয়, ইহাই যথার্থ ভক্তিশাস্ত্রের সত্য। অনেক সময় এমন হয় যে, ঈশ্বর-দর্শন হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, সে সকল

সময় কেবল নাম করিলেই কার্য্য সমাধা হইল। সুতরাং তাঁহাদের মতে নাম নিকৃষ্ট ব্যাপার হইল; কিন্তু ভক্তের পক্ষে নামসাধন ঈশ্বর-দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নহে, বরং উৎকৃষ্টতর ব্যাপার। কেন না, বারংবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন ভক্তিরসে পূর্ণ না হইলে, তাঁহার নামে যথার্থ মত্ততা হয় না। তিনি যদি বারংবার আমার কাছে না আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নাম আমার কাছে অপরিচিত ব্যক্তির নামের ন্যায় থাকিবে। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যখন প্রগাঢ় মত্ততা হয়, তখনই তাঁহার নামে মত্ততা হয়। তবে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ না হইলে, প্রথমাবস্থায় নাম করিবে না। বারংবার নামোচ্চারণ করিলে পরিত্রাণ পাইব, এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করা বিশ্বাসীর পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু তুমি ভক্তিশিক্ষার্থী, তোমাকে ভক্তির সহিত নামোচ্চারণ করিতে হইবে। তোমার পক্ষে প্রথমে ঈশ্বর-দর্শনে মত্ততা, শেষে নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে মত্ততা হইবে। যতই তুমি সেই শিব সুন্দরকে দেখিবে, যতই তুমি তাঁহার চরিত মনোহর বুঝিবে, ততই তাঁহার নাম শুনিতে ও বলিতে তোমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ইচ্ছা হইবে; কেন না, বস্তুতে আর নামেতে প্রভেদ নাই।

ভক্তেরা দুর্ব্বল অধিকারী নিকৃষ্টদিগের প্রতি দয়া করিয়া বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নাম সাধন করিতে বিধান করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তের পক্ষে সে বিধান নহে। মনে ভক্তি নাই, প্রেমের উচ্ছ্বাস নাই, অথচ জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, বলিয়া ডাকিতেছি, ইহা ভক্তিশাস্ত্রসম্মত নহে। কেন না, ভক্তেরা নামকে অতি উচ্চ মনে করেন।

ঈশ্বরাবির্ভাব।

কলুটোলা, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ২১শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, প্রলয়ের কথা শুনিয়া থাকিবে। সেই প্রলয়ের অবস্থাতে এখন মন উপস্থিত হইল। যখন অন্ধকার সর্ব্বগ্রাস করিল, তখন যুগান্তর হইল, পূর্ব্বকার সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইল। সেই জগৎ কৈ? সেই জগতের চিন্তা কৈ? এত সময় লাগিল পূর্ব্বকার জগৎকে বৈরাগ্য দ্বারা নির্ব্বাণ করিতে। পুরাতন জগৎ নির্ব্বাণ হইল, মহা-প্রলয় উপস্থিত, সমুদায় ঘন অন্ধকার, তিমিরাচ্ছন্ন হইল, এখন যোগের নূতন জগৎ সৃষ্ট হইবে। একবার অন্ধকার দেখিতে হইবে। প্রলয়রূপ অন্ধকারসাগর হইতে নব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইবে, নব সূর্য্য উদিত হইবে। সেই জলেতেই সমুদায় আছে, উদ্ভাবিত হইবে। ঘোরান্ধকারসাগরে ক্ষুদ্র নৌকারোহী জীবাত্মা সাধক ভাসিতেছে। কিন্তু ঘোরান্ধকার রাত্রির পর যেমন উষা হয়, সেইরূপ যোগের জীবনে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রথম উষা, পরে প্রাতঃকাল, পরে দ্বিপ্রহর আলোক উপস্থিত হয়। এই অন্ধকারের ভিতরে ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়। হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, এই বলিয়া ক্রমাগত তাঁহাকে ডাকিতে হয়। ডাকৃছ আর অন্ধকারসাগরের তরঙ্গ গ্রাস করিতেছে। উপরে অন্ধকার আকাশ, নীচে অন্ধকার সাগর। ডাকৃছ, ডাকৃতে ডাকৃতে "আমি আছি" এই একটি গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিলে। নিশ্চয় বিশ্বাস দ্বারা এই অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যতদূর অন্ধকার, ততদূর তিনি। এই অন্ধকারের ভিতরে তিনি। অন্ধকার বস্ত্ররূপে তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমুদায় অন্ধকার কথা

কহিতেছে। "আমি আছি" প্রকাণ্ড সাগরের রোলের ন্যায় এই কথা উত্থিত হইল। অন্ধকারসাগর এই কথা বলিল। অন্ধকার আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। এই অন্ধকারের মুখ হইল। অন্ধকার কথা কহিল, এই অন্ধকার একটি ব্যক্তিতে পরিণত হইল। এ জড় অন্ধকার নহে, এ মৃত্যুর অন্ধকার নহে। যখন অন্ধকার ব্যক্তিত্বে পরিণত হইল, তখন সাধক সেই পুরাতন মন্ত্র বার বার পাঠ করিতে লাগিলেন। "তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য", "সত্যং সত্যং সত্যং" গম্ভীরস্বরে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আর মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল, সেই গম্ভীর ধ্বনি "আমি আছি"। সমস্ত অন্ধকার জীবন্ত হইল। অন্ধকারসমক্ষে বসিয়া সাধক বলিতে লাগিলেন, "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ"। যত বলেন, ততই সেই অন্ধকার জীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে লাগিল। একটি প্রকাণ্ড অন্ধকার একটি প্রকাণ্ড পুরুষ হইল। সেই অন্ধকারও নাই, সেই সাগরও নাই, সমক্ষে একটি প্রকাণ্ড পুরুষ। যিনি বলিতেছিলেন, "আমি আছি" অন্ধকাররূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া, তিনিই আত্মপরিচয় দিলেন। সাধকের নিকট তিনি একেবারে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হন না; অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হইয়া তিনি সাধকের নিকট প্রকাশিত হন।

জীবে দয়া।

কলুটোলা, ১১ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ২২শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, জীবের প্রতি দয়া ভক্তিশাস্ত্রের একটি প্রধান ধর্ম্ম। যখনই শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম স্থাপন করা যায়, তখনই তাঁহার নামে ভক্তি এবং তাঁহার জীবে দয়া

প্রবর্দ্ধিত হয়। যখন সুন্দরমের প্রতি মুগ্ধতা, তখন তাঁহার নামের প্রতি এবং জীবের প্রতিও মুগ্ধতা হয়। প্রেমের অবস্থায় সকলই প্রেমের আকার ধারণ করে। যখন ব্রহ্মপ্রেমে মত্ততা হয়, তখন নামে ভক্তি এবং জীবে দয়াও ঘন অনুরাগের আকার ধারণ করে। জীবের প্রতি দয়া, আজ এই বিষয় আলোচ্য। 'পরোপকার' পার্থিব ধর্ম্মের অভিধানে এই শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্রে কি পরোপকার ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে? তুমি বলিবে, ভক্তিশাস্ত্রে এই শব্দই নাই। সে কি? পরোপকার করা উচিত নহে? ভক্তিশাস্ত্রে পরোপকার অধর্ম্ম? উপকার করার ভাবে অহঙ্কার আছে, সুতরাং উপকার করার ভাব অধর্ম্ম। অতএব হে ভক্তিশিক্ষার্থী, অহঙ্কার যে ধর্ম্মে আছে, তাহা তুমি গ্রহণ করিবে না। উপকারী আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া যাহার উপকার করেন, তাহাকে আপনা অপেক্ষা নীচ মনে করেন এই জন্য পরোপকার এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে নাই; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে ইহার প্রতিশব্দ আছে। সেই শব্দ পরসেবা, জীবে দয়া ইহার অর্থ পরসেবা। ভক্তিশাস্ত্রে যিনি সেবিত হইলেন অর্থাৎ যাঁহার উপকার করা হইল, তিনি হইলেন উচ্চ, আর যিনি সেবা করিলেন, তিনি হইলেন নীচ। ভক্তের স্থান পরপদতলে, পরস্কন্ধে বা পরের মস্তকে নহে। ভক্তের স্থান সেবকের স্থান। এই পরসেবা ব্রহ্মের প্রতি প্রেমের অনিবার্য্য ফল। এই সেবা প্রেমপ্রসূত এবং মধুময়। ঈশ্বরকে ভালবাসিলেই জীবে দয়া এবং পরসেবা করিতে হয়। নামে ভক্তি এবং জীবে দয়া এই দুইটি স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মে ভক্তি হইলে যেমন ব্রহ্মমন্দিরে এবং তাঁহার সম্পর্কীয় পুস্তকাদিতে প্রেম যায়, সেইরূপ যাঁহাদের মুখে পিতার লক্ষণ আছে, যাঁহাদের অন্তরে পিতার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, তাঁহাদের প্রতিও প্রেম যাইবেই। মনুষ্যের মধ্যে

ব্রহ্মের গন্ধ আছে বলিয়া মনুষ্যের প্রতি প্রেম যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ পবিত্র সুগন্ধ। যাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকেন, তাঁহাদের আত্মার এই স্বর্গীয় সৌরভ মনের প্রেম আকর্ষণ করে। এই সম্পর্কভূমির যে সুগন্ধ, তাহাতেই ভালবাসা হয়। সদ্গুণে বা সুরূপে ভালবাসা নহে; মনুষ্য সাধুসদ্গুণসম্পন্ন না হইলেও ভালবাসার পাত্র, কেন না, সে ঈশ্বরসন্তান। তাহার অনেক দোষ থাকিতে পারে, তথাপি সে প্রেম আকর্ষণ করিবে; কেন না, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধরূপ একটু চিনি, একটু মিশ্রী তাহার মধ্যে আছেই। চারিদিকে উচ্ছের ক্ষেত, মধ্যে একটি আখ। চারিদিকে তিক্ত, মধ্যে একটু মিষ্টরস। মনুষ্যমাত্রেই দোষগুণজড়িত; কিন্তু তিনি পিতার সন্তান, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তিনি ভ্রাতা ভগ্নী। এই যে সম্পর্কের মিষ্টতা, ইহারই উপর ভালবাসা ধাবিত হইবে। গুণের জন্য সম্মান, দোষের জন্য ঘৃণা পৃথিবীর ধর্ম্ম। ভক্ত কেবল সম্পর্কের ফুল দেখেন, তাঁহার মনোমধুকর সেই ফুলের মধু পান করে। এইজন্য সকল ভক্তের মনুষ্যের প্রতিই তাঁহার প্রেম আকৃষ্ট হয়, এবং ভক্তের প্রতি আরও অধিক প্রেম শ্রদ্ধা হয়; কেন না, ভক্তের মধ্যে তিনি ব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মের প্রেম পুণ্য উজ্জ্বলতররূপে দর্শন করেন। কিন্তু জীবে দয়া অথবা প্রেমের সাধারণ ভূমি সম্পর্ক। সেই ভূমি হইতে সকলকে ভালবাসিবে, এবং সকলের সেবা করিবে। যদি জীবের প্রতি প্রগাঢ় ঘন দয়া না হয়, তবে নামে ভক্তি হইয়াছে, বিশ্বাস করিও না। এই দয়া যখন খুব প্রবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বদাই সকল জীবের প্রতি ধাবিত হইবে, তখন জীবে মত্ততা বা মোহিত ভাব হইবে। আজ কেবল এই বলা হইল, জীবের মধ্যে ব্রহ্মের সম্পর্ক অবলোকন করিলেই তাহার প্রতি ভক্তের প্রেম আকৃষ্ট হয়। জীবে দয়া, প্রগাঢ় ভালবাসা, ব্রহ্মের মূল ধর্ম্ম,

ভক্তের প্রধান লক্ষণ। জীব আমার প্রভু, তাঁহার সেবা করিলে আমার পরিত্রাণ হইবে, এই ভাবে যে পরসেবা করা, এটি বিশ্বাসরাজ্যের কথা। রাস্তায় গরিব প'ড়ে আছে, তাহার রোগের উপশম করিলে, তাহার উপায় করিয়া দিলে আমার পুণ্য এবং পরলোকের সম্বল হইবে, এই ভাবে যে পরসেবা করা, ইহা বিশ্বাসের সহিত নাম করার ন্যায় কেবল বিশ্বাসের কথা। পুণ্য হইবে বলিয়া খুব খাটিলাম, অথচ যাহার জন্য খাটিলাম, সেই ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা হয় নাই, প্রাণ শুষ্ক রহিয়াছে, ভালবাসার সেবা এরূপ নহে। মাতা যে দুগ্ধ দিয়া, পিতা যে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া সন্তানের লালন পালন করেন, তাঁহারা কি পরোপকার করেন? সন্তান কাণা হইলেও পিতা মাতা প্রেমের সহিত তাহাকে সেবা করেন। কেবল সম্পর্কগুণে প্রেম। কিন্তু যেমন শুষ্কতা থাকিলেও বিশ্বাস করিয়া নাম করিবে, তেমনি প্রেম না থাকিলেও বিশ্বাসের সহিত আপনাকে ক্ষুদ্র জানিয়া ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। প্রকৃত প্রেমশাস্ত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিষ্ট। প্রেমের হেতু নাই। প্রেম দোষ গুণ এবং ফলাফল বিচার করে না।

নির্গুণ সাধন।

কলুটোলা, ১৬ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ২৭শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, নির্গুণের নিকটে আসিয়াছ, কিন্তু এখানে থাকিবার জন্য নহে। সগুণের নিকট উপনীত হইতে হইবে। নির্গুণ সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। এই অন্ধকার সাধন দ্বারা মনকে নির্গুণের নিকট উপস্থিত করা যায়। কেবল সত্তামাত্র উপলব্ধি, ইহাকেই বলে

নির্গুণ সাধন। "আমি আছি" এই উপাধিধারী যিনি, তিনি নির্গুণ। নির্গুণের অর্থ গুণশূন্য? না। নির্গুণের অর্থ কি কখনও গুণশূন্য? না। যিনি গুণাকর, কখনও তাঁহার গুণের অভাব হইতে পারে না। তবে নির্গুণ কেন বলি? যাঁহার গুণ এখনও সাধকের ধারণ করিবার সময় হয় নাই। সত্তামাত্র ধারণ করা যোগের আরম্ভ। সেই সত্তা কি? এই যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছে গভীর অন্ধকার, ইহার মধ্যে "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" এই বলিয়া যে ঈশ্বরের সত্তা অবধারণ, অবলোকন এবং সম্ভোগ করা, ইহাই সত্তাসাধন। কেবল যিনি এই সত্তাটি উপলব্ধি করেন, তিনি নির্গুণ সাধক। গুণ আছে তাঁহার, কিন্তু নির্গুণ সাধক তাহা দেখিতেছেন না। নির্গুণ সাধনের সময়, "তিনি আছেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন" এই ভাবটি খুব সাধন করিতে হইবে। "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" এই সত্য বারম্বার বলিতে বলিতে সত্তার উপলব্ধি উজ্জ্বলতর হয়। এই সত্তা উপলব্ধি করিলে কি কি ভাবের উদয় হয়? গাম্ভীর্য্য ইহার অনুরূপ ভাব। "এই যে তুমি আছ, এই যে তুমি আছ, এই যে তুমি আছ" এইরূপে যত সেই সত্তা দেখিব, সেই সত্তা ভাবিব, ততই শরীর মন গম্ভীর হইবে, শিথিলতা যাইবে, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। এই নির্গুণ সত্তা সাধকের মনের উপরে আপনার রাজ্য স্থাপন করিবার পর ঈশ্বরের গুণসম্পন্ন স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই। ঈশ্বর আছেন, এই সত্যে প্রত্যয়কে দর্শনরূপে পরিণত করিতে হইবে। সৎ তিনি, ইহা জানিয়া গম্ভীর হও। সৎ-শব্দে বিশ্বাস হৃদয়ঙ্গম কর। অন্ধকারের যে দিকে তাকাও, কেবল সৎ, এই নির্গুণ স্বরূপ দেখিবে। অন্য গুণ ভাবিবার সময় নহে। এই অন্ধকারেই নির্গুণ ঈশ্বর। গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তারূপে প্রকা-

শিত। এই সত্তা কেমন করিয়া সগুণভাবে প্রকাশিত হইবে, পরে বর্ণিত হইবে।

মন-পাত্র ব্রহ্ম-সত্তারূপ বারি দ্বারা পূর্ণ, গম্ভীর। জলের গুণ আছে কি না, মিষ্ট কি তিক্ত, পরে প্রকাশিত হয়; শূন্য পাত্রের ন্যায় কর্কশ শব্দ করে না। নির্গুণ উপাসনা দ্বারা এই ফল হয়।

সেবার উপযোগী দুইটি বল।

কলুটোলা, ২০শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ১লা মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, সৌভাগ্য তোমার যে, তুমি ভক্তির পথ ধারণ করিয়াছ। কেন না, ভক্তির পথে তুমি দুই বলের সাহায্য পাইতেছ। এক বলই যথেষ্ট। সৌভাগ্য তোমার যে, তুমি দুই বল পাইতেছ। পরসেবা করিবার জন্য, পরের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য দুই বল তোমার সহায় হইতেছে। এক আন্তরিক প্রেমের বেগ, দ্বিতীয় পরসেবাতেই আমার পরিত্রাণ, ইহাতে বিশ্বাস। যেমন মাতার সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা স্বাভাবিক এবং প্রবল, সেইরূপ ঈশ্বরসন্তানের প্রতি ভক্তের প্রেমের টান স্বাভাবিক এবং প্রবল। এই প্রেমের বেগের সহিত, এই প্রগাঢ় সুমিষ্ট ভালবাসার সহিত পরসেবা কর, পরের মঙ্গল সাধন কর, ইহাতে তুমি অনেক বল পাইবে। যখন প্রেমের টান হইবে, তখন ভাই ভগ্নীদিগের জন্য তুমি এত যত্ন করিবে যে, তাহা দেখিয়া তুমি আপনি আশ্চর্য্য হইবে। এমন দুর্ব্বল শরীর লইয়া কিরূপে আমি এত কার্য্য করিলাম, ইহা ভাবিয়া তুমি চমৎকৃত হইবে। এ সকলই ঈশ্বর করিয়া লইবেন। কিন্তু সেই মমতা যদি

না থাকে, দেখিবে, পরসেবা করিতে হয়ত অন্তরে ইচ্ছা নাই, অথবা অল্প অল্প ইচ্ছা থাকিলে বল নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে যাহাতে সেই প্রেমের বেগ এবং প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পার, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। প্রেমনদীর এই বেগ, ইহাতে যদি আর এক নদী সংযুক্ত হয়, সেই সংযোগ হইতে এত বল উৎপন্ন হয় যে, আর ভক্তের পক্ষে কোন বিঘ্ন বাধা থাকিতে পারে না। সেইটি পরিত্রাণ পাওয়ার আশা এবং বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরসন্তানদিগের সেবা করিতেছি, ইহাতে আমার পরিত্রাণ হইবে। এই বিশ্বাস থাকিলে মানুষ সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া নিতান্ত কঠোর ব্রত পালন অথবা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ক্ষুধিতকে অন্ন এবং তৃষিতকে জল দান করিলে পরলোকে আমার সদ্গতি হইবে, ইহাতে খাটি বিশ্বাস হইলে আর পরসেবায় বিলম্ব করিতে পারি না। পরোপকার করিতেছি, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অহঙ্কার করিলে কখনও পরসেবা করিবার জন্য সে প্রকার ব্যস্ততা হয় না। পরের পদধূলি লইয়া পরসেবা না করিলে আমার পরিত্রাণ নাই, পরসেবাতে এরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের সংস্রব না দেখিলে যথার্থ পরসেবা হয় না। একজনের জন্য একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, একজনকে কিছু লিখিয়া দিলে, কিম্বা কাহাকে একখানি পুস্তক আনিয়া দিলে, ইহাতে যদি আঃ ব লয়া শরীর মন না জুড়ায় এবং সাক্ষাৎ নগদ বর্ত্তমান পরিত্রাণ পাইলে, ভাবী বিষয় নহে, এরূপ মনে করিতে না পার, তবে জানিও, অন্তরে পরসেবার ভাব আসে নাই। এইরূপ বিশ্বাস এবং এইরূপ প্রেমের সহিত তুমি যদি একটি অতি সামান্য কার্য্য কর, তাহাও তোমার পরিত্রাণ হইয়া আসিবে এবং পরলোকের সম্বল হইয়া থাকিবে। কতকগুলি লোক, যেমন মাতা এবং ভাই ভগ্নী, প্রবল স্বাভাবিক স্নেহের উত্তেজনায় পরসেবা করে।

আর এক শ্রেণীর লোক কেবল পরিত্রাণ হবে এই বিশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিয়াও পরসেবা করে, তাহাদের তেমন গাঢ় অনুরাগ নাই। কিন্তু, হে ভক্তিপথাবলম্বী, তোমার জীবনে দুই নদীর যোগ হইবে। ভালবাসার অধীন হইয়া তুমি পরসেবা করিবে; কিন্তু কেবল ভালবাসাতে ভক্ত কৃতার্থ হইতে পারে না। পরসেবা করিলে আমার পরিত্রাণ হইবে, এই বিশ্বাসে সে বিনীত-হৃদয়ে পরসেবা করে। ভক্তবৎসলের আজ্ঞানুসারে জগতের সকলকে প্রেম বিতরণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতেই আমার পরিত্রাণ হইবে, ইহাতে বিশ্বাস করিবে। প্রকৃত ভক্তির পথে থাকিলে এই দুই বলই লাভ করিবে। এই ভাবে পরকে একটা খ'ড়কেকাঠি দিলে, তাহা পরিত্রাণরূপে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তিনি ধন্য, যিনি অহঙ্কতভাবে পরোপকার করেন না; কিন্তু ভক্তিভাবে পরসেবা করেন। এই দুই বলের সমষ্টি করিয়া পরসেবা কর, নিশ্চিত পরিত্রাণ হইবে। সেবাতে বড় ছোট অথবা সমানের প্রভেদ নাই। যখন সন্তানেরও সেবা করিতে হয়, তখন আর ইহাতে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভাব কোথায়? ভালবাসা সাধারণ ভাব। পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং স্নেহমিশ্রিত ভালবাসা হয়। গুরুজনের দুঃখ মোচন করার ভাবও ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। অভাব দেখিলেই দয়া হয়। সুতরাং গুরুজনের যদি অভাব থাকে, সেই বিষয়ে তাঁহাকে দয়া অথবা ভালবাসা হইতেই সেবা করিতে হয়। সন্তানের অভাব দেখিলেই যেমন মাতার স্তনে দুগ্ধ আসিবেই আসিবে, জীবের দুঃখ দেখিলে তেমনি ভক্তের দয়া হইবেই হইবে।

অবলোকন ও নিরীক্ষণ।

কলুটোলা, ২১শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ২রা মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারসাগর মন্থনপূর্ব্বক কোন্ দেবতা লাভ করা হইল? "আমি আছি" এই উপাধিধারী দেবতা, সত্তা অথবা বর্ত্তমানতা যাহার নাম। প্রথমাবস্থায় এই ঘোরান্ধকার ভিতরে ব্যাপ্ত যে সত্তা, সেই সত্তা দর্শন, সেই সত্তা পূজা, সেই সত্তা ধারণ করিতে হইবে। এই যে সত্তা উপলব্ধি অথবা দর্শন, ইহা দুই ভাবে সম্ভব। এক স্থূল, এক সূক্ষ্ম; এক সামান্য, এক বিশেষ; এক অবলোকন, এক নিরীক্ষণ; এক সন্তরণ, এক মগ্ন। স্থূল কি? প্রকাণ্ড একটি জীবন্ত জাগ্রত ব্যাপ্তি, যতদূর দেখিতেছি, মন যতদূর যাইতেছে, ততদূর সেই ব্যাপ্তি, দেশে অপরিচ্ছিন্ন, খানিক আছে খানিক নাই তাহা নহে, এই যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি, ইহা স্থূল সত্তা। একটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বিন্দুমাত্র স্থানে যে সেই আবির্ভাব উপলব্ধি, তাহাই সূক্ষ্ম দর্শন। এরূপ মনে করিবে না যে, এই দুই স্বতন্ত্র সত্তা। সেই একই সত্তা, সমস্ত দেখিলে স্থূল, একটি অংশ দেখিলে সূক্ষ্ম দর্শন হইল। সাধারণ সত্তা এবং বিশেষ সত্তা দর্শনও এইরূপ। অবলোকন কি? ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করা। নিরীক্ষণ কি? একটি জায়গাতে খুব ভালরূপে তাঁহাকে দেখা। একটু ছোট বিভাগে স্থিরভাবে তাঁহাকে দেখা। কিন্তু যখন সূক্ষ্ম অথবা বিশেষভাবে সেই সত্তা নিরীক্ষণ করিবে, তখন এরূপ মনে করা হইবে না যে, আমি যতদূর দেখিতেছি, ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মের সত্তা নাই। তখন মনে করিবে, আমার সাধ্যানুসারে আমি কেবল অল্প অংশ দেখিতেছি। সন্তরণ

কি? প্রকাণ্ড সত্তাসাগর দেখা, একবার তাহার উপরিভাগে ভেসে নেওয়া, যেমন বস্তুর উপর চক্ষু বুলাইয়া লওয়া। দ্বিতীয়তঃ, সেই সত্তার ভিতরে মগ্ন হওয়া। এক উপরিভাগে চক্ষুর সন্তরণ, এক অভ্যন্তরে দৃষ্টির প্রবেশ। এক চক্ষু বস্তুর উপরিভাগ দেখিল, এক চক্ষু সেই বস্তুতে বিদ্ধ হইল। সুতরাং দর্শন দুই প্রকার। স্থূলভাবে, বিশেষরূপে। সেই সত্তা নিরীক্ষণ করা অনেকের পক্ষে সর্ব্বদা হয় না; কিন্তু তুমি যোগশিক্ষার্থী, তোমার কেবল উপরিভাগে, বাহিরে দৃষ্টি হইলে হইবে না; সমস্ত সত্তা বিস্তৃত থাকুক, তোমার নয়নকে একটি স্থানে বদ্ধ করিতে হইবে, খুব অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ হয়, তাহার জন্য বিশেষ সাধন করিবে। দৃষ্টি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে পরে তাঁহার সমুদায় গুণ প্রকাশিত হইবে। প্রথম নির্গুণ সত্তা দর্শনেও নিরীক্ষণ আবশ্যক।

কেবল নির্গুণে থাকিলে অদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। সত্তাতে, অর্থাৎ কেবল 'আছেন' বলিলে বস্তুর প্রভেদ হয় না। গুণ-নির্ব্বাচনেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। এইজন্য নির্গুণ সোপান অতিক্রম করিয়া সগুণে উপস্থিত হইতে হইবে। সগুণে দ্বৈতভাব স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু নির্গুণ সত্তা নিরীক্ষণের সময়েও দ্বৈতভাব রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া কেবল আপনার দৃষ্টিকে সেই সত্তার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। আমি নহি, কিন্তু আমার চক্ষের দৃষ্টি সেই নির্গুণ সত্তায় মগ্ন হইতেছে, এই প্রকার বিশ্বাসের সহিত সাধন করিতে হইবে।

ভক্তি-সমুচিত বৈরাগ্য।

কলুটোলা, ২২শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক ; ৩রা মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তোমার শাস্ত্রে প্রেমিক আর বৈরাগী এক লোক। ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমিক এবং বৈরাগী স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে, একই ব্যক্তি। আশ্চর্য্য, প্রেমশাস্ত্রে প্রেম এবং বৈরাগ্য এক। যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছিল, বৈরাগ্যের এক বিভাগ ভক্তিশাস্ত্রের অন্তর্গত। আজ তাহাই আলোচ্য। বৈরাগ্যও তোমার পক্ষে মধুর। তুমি বৈরাগী হইবে কেন? কেবল ভালবাসার উত্তেজনায়। অত্যন্ত ভালবাসার সহিত পরসেবায় নিযুক্ত হইলে বৈরাগ্য আসিবেই। যখন জগৎকে ভালবাসিবে, তখন তুমি সংসারী বিলাসপরায়ণ হইয়া থাকিতে পারিবে না। পরকে ভালবাসিলে নিজের বিশ্রাম এবং সুখভোগেচ্ছা আপনি চলিয়া যাইবে। পরের কুশলের জন্য ভাল খাওয়া, ভাল বস্ত্র, ভাল বাসগৃহ, টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম এ সকলই ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে, এবং অতি আহ্লাদের সহিত এ সকল ত্যাগ করিবে। কিন্তু যত ছাড়িবে, তত পাইবে। দ্বিগুণ ছাড়, দ্বিগুণ পাইবে; দশ গুণ ছাড়, দশ গুণ পাইবে। ইহা অভ্রান্ত নিশ্চিত সত্য। তুমি যদি সর্ব্বত্যাগী দীন হইয়া ঈশ্বরের অন্বেষণ কর, জগৎ তোমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবে, তোমার উপরে সকলে নির্ভর করিবে। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি অনায়াসে নিশ্বাস ফেলার ন্যায় সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছ, ভাইকে দিতেছ, তাহাতে তোমার কষ্ট কি? কিন্তু এই বৈরাগ্য কতদূর যাইবে? ক্রমাগত দিতেছ, কতদূর দিবে? জগতের প্রতি তোমার প্রেম তোমার সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে লাগিল। কতদূর শোষণ করিবে?

তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আছে, তাহা কি তুমি জান না? যদি বল, আপনাকে আগে দিবে, পরে তোমার পরিবারকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ঈশ্বরের সাধারণ পরিবারকে দিবে, ইহা ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ ভাব। আগে পরিবারকে দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ করা, উহা বুদ্ধিশাস্ত্রের কথা। ভক্তিশাস্ত্রমতে আগে জগৎকে দিয়া যাহা থাকিবে, তাহা দ্বারা আপনাকে এবং পরিবারগণকে প্রতিপালন করিতে হইবে। নিজের পরিবারের সুখ অপেক্ষা অন্যের অধিক সুখ দেখিলে ভক্তের আহ্লাদ হইবে। নিজের সুখ দেখিয়া ভক্তের মন তেমন চরিতার্থ হয় না, যেমন পরের সুখ দেখিলে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হয়। নিজেব ছেলের অপেক্ষা পরের সন্তানের ভাল কাপড় এবং ভাল জুতো দেখিলে যদি অধিক সুখ না পাও, তবে জানিবে, তুমি ভক্ত হও নাই। যেখানে আমি এবং আমিত্ব, সেখানে যদি সুখ অধিক বোধ হয়, সেইটি পৃথিবীর তত্ত্ব, সেইটি সংসারীর ভাব। আর যেখানে পর, সেখানে যদি অধিক সুখ হয়, তাহা ভক্তি। ভক্তির অবস্থায় দেখিবে, তোমার নিজের সম্বন্ধীয় বিষয়ে তত অনুরাগ নাই, তত আহ্লাদ নাই। ভক্তি মনের অনুরাগ প্রেমকে বাহিরে টানিয়া লয়। তোমার নিজের বাড়ী ছিল না, একটি বাড়ী হইল, ইহাতে তোমার তত আমোদ হইবে না, যেমন অন্য একটি লোকের বাড়ী ছিল না, তাহার বাড়ী হইল, ইহা শুনিলে তোমার আহ্লাদ হইবে। শুনিবামাত্র তুমি আনন্দের সহিত বলিবে, কি বল্‌লে? অমুক লোকের বাড়ী হয়েছে? যাহাকে ভালবাস, তাহার সুখে এইরূপ সুখ হয়। ভক্ত আপনাকে ভালবাসেন না, তাঁহার ভালবাসা বাহিরে। সেই ভালবাসা তাঁহাকে বৈরাগী করে। ভক্তিশাস্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম ততদূর, ভালবাসা যতদূর। যদি প্রাণগত ভালবাসা হয়,

বৈরাগ্যের অধিকার প্রাণের উপর পর্য্যন্ত; অতএব ভক্তের বৈরাগ্যের পরিমাণ অপরিমিত। যত প্রেম হইবে, তত দান এবং পরসেবা হইবে। পরের মঙ্গলের জন্য যখন ভক্ত পাগল হন, তখন বৈরাগ্য আপনি উপস্থিত হয়। আমি যদি মাছ খাই, দশ জন ভাই মরিবে, আর যদি না খাই, তাহারা পরিমিত আহার করিয়া বাঁচিবে, এইজন্য মাছ ত্যাগ করা হইল। আমি প্রাণ দিলে অন্যে প্রাণ পাবে, এইজন্য ভক্ত আপনার প্রাণ দেন। আমি শান্তস্বভাব হইলে আরও পাঁচজন শান্তস্বভাব হইবে, আমি যত ফোঁটা রক্ত দিব, তত ফোঁটা রক্তে অন্যের জীবন হইবে। এই ভক্তিমিশ্রিত বৈরাগ্য অতি সুন্দর এবং অতি মূল্যবান্। যে বৈরাগ্যে মুখ ম্লান হয়, শরীর শীর্ণ হয়, তাহা ভক্তের পরিত্যাজ্য। ভালবাসাশূন্য বৈরাগ্য ভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভক্তের বৈরাগ্য কষ্টের অগ্নি নহে, কিন্তু তাহা শান্তিসরোবর এবং প্রচুর সুখের ব্যাপার। অতএব, হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি প্রেমের আনন্দে বৈরাগ্য গ্রহণ কর। তুমি অন্যের প্রতি খুব প্রেম পাঠাইয়া দাও, সেই প্রেমই তোমার নিজের সকল সুখ কাটিয়া অন্যকে দিবে। ইহলোকে থাকিতে থাকিতে নিজের সুখ অপেক্ষা ভাইয়ের সুখ দেখিয়া অধিক সুখী হও। আপনার সন্তানদিগের অপেক্ষা পরের সন্তানদিগের সুখ দেখিয়া অধিক আহ্লাদিত হও। যিনি পরের সুখ দেখিয়া এত সুখী হন, সেই ভক্তের পক্ষে বৈরাগ্য ক্ষতি নহে, বৈরাগ্য পরম লাভ। জগতের পরিত্রাণের জন্য ভক্তের বৈরাগ্য। কেবল প্রেমের উত্তেজনায় ভক্ত তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন। যদি কল্পনা করা যায়, একা ভক্ত ব'সে আছেন, জগতে আর কেহই নাই, তবে তিনি কাহার জন্য বৈরাগী হইবেন? ভক্তের অনুরাগই বৈরাগ্য। সেই ভালবাসার জন্য তাঁহার যে সকল জিনিস আপনি চলিয়া যায়, তাহাই তাঁহার বৈরাগ্য।

তিনি জগৎকে এত ভালবাসেন যে, জগৎকে তাঁহার সর্ব্বস্ব না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। লাভের প্রত্যাশায় ভক্ত কিছুই দেন না। কম প্রেম হইলে কম দেওয়া হয়, অধিক প্রেম হইলে অধিক দেওয়া হয়।

বিশেষ দর্শন।

কলুটোলা, * * বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; * * মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, দ্বিবিধ দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়াছ, এক অবলোকন, এক নিরীক্ষণ; এক স্থূল ভাব, এক সূক্ষ্ম ভাব। সাধনের জন্য একই সময়ে এই দুই অবলম্বনীয়। এক সময়ে স্থূল দর্শন, এক সময়ে সূক্ষ্ম দর্শন, ইহা বুঝা যায়; কিন্তু দুই একসময়ে কিরূপে সম্ভব? শ্রবণ করিয়াছ ঈশ্বর অনন্ত, যোগীর ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এই অনন্তভাব ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরত্ব থাকে না। কল্পনা দ্বারা মন যতদূর যাইতে পারে, ততদূর তিনি। অসীম দৃষ্টির আয়ত্ত হইতে পারে না। অসীম ব্রহ্ম-দর্শনের অর্থ এই যে, যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর তিনি, যেখানে দৃষ্টি শেষ হইল, তাহার ও দিকেও তিনি। পরিমিত কর্ত্তৃক অপরিমিত ধারণ এইরূপে সম্ভব। হইল স্থূল দর্শন, স্থূল উপলব্ধি। যতদূর মনের দৃষ্টি যায়, ততদূর তিনি এবং দৃষ্টির বহির্ভূত স্থানেও তিনি। ইটি স্থূল দর্শন, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরীক্ষণ করাও আবশ্যক। ঠিক আমার সমক্ষে তিনি আছেন, সেই সমক্ষে বিশেষ-রূপে তাঁহার ধারণ করাই নিরীক্ষণ অথবা সূক্ষ্ম দর্শন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তিনি আছেন, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। সন্তরণ করা এবং মগ্ন হওয়া একই সময়ে হইবে। চারিদিকে স্থূল ব্রহ্ম, তাঁহার ভিতরে

অধিবাস করিতেছি, সন্তরণ করিতেছি, অথচ তাঁহার যে অংশটুকু ঠিক সমক্ষে, তাহা নিরীক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু যদি এমন হয়, যতটুকু নিরীক্ষণ করিতেছি, সেইটুকুই ব্রহ্ম, তাহা হইলে তাহা পুতুল হইল, ছোট পরিমিত দেবতা হইল। সমস্ত অবলোকন করিব; কিন্তু অল্প স্থানে নিরীক্ষণ করিব। সেই অল্প স্থানে যে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিব, তাহাতে সমস্ত শরীর মন স্তম্ভিত হইবে, এবং সমস্ত আত্মার ভিতরে তাঁহার ভাব গম্‌গম্‌ করিবে। চারিদিকে ঘোরতর অন্ধকার, মধ্যে একটি হীরের খণ্ড, তাহা নহে; কিন্তু সমস্ত আকাশ জ্যোতির্ম্ময়, মধ্যে যেন সূর্য্য, ইহাই যথার্থ উপমা। নিরীক্ষিত অংশ সমধিক উজ্জ্বল। এই দুই প্রকার দর্শনই একত্র থাকিবে, নতুবা আংশিক সাধন হইতে দোষ উৎপন্ন হইবে। যদি কেবলই স্থূল দেখ, তবে গভীরতা হইবে না; আর যদি কেবলই এক অংশ দেখ, পৌত্তলিকতা-দোষ আসিয়া পড়িবে। অল্প স্থানেতে গুণ সকল ধারণ করিতে হইবে। মনে কর, যেমন একটি প্রকাণ্ড ফুল, তাহার কিয়দংশের ঘ্রাণ দ্বারা তাহার সৌরভ কেমন বুঝিতে হয়। সমুদায় গ্রহণ করিলে তেমন ভালরূপে গুণ গ্রহণ করা যায় না। অথবা কোন বস্তুর স্পর্শ কেমন পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার একটি সংকীর্ণ স্থানে অঙ্গুলী স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ বৃহৎ ঈশ্বর, সমস্ত আকাশে তিনি আছেন, ইহা বিশ্বাস করিব, অথচ তাঁহাকে এবং তাঁহার গুণ আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে একটি স্থানে তাঁহাকে দেখিব। একটি বিশেষ অংশে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের প্রকাশ দেখিব; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, অন্য স্থানে তাঁহার এ সকল গুণ নাই। কেবল সাধকের সুযোগের জন্য একটি বিশেষ স্থানে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে হয়। সাধারণ ভাবে তাঁহার সমস্ত সত্তা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে, বিশেষ ভাবে বিশ্বাস এবং ভক্তির দ্বারা তাঁহার

কিয়দংশ সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষিত হইতেছে। দুই এক সঙ্গে রাখিবে। যদি অসীম ভাবে ভাসিয়া যাও, তোমার যথার্থ গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না; আর যদি তাঁহার অনন্তত্ব ভুলিয়া কেবল কিয়দংশ নিরীক্ষণ কর, তোমার ব্রহ্ম পরিমিত হইবে। তুমি যেটুকু বাঁধিলে, কেবল সেটুকু ব্রহ্ম নহেন, তাহা ছাড়া আরও অসীম ভাবে ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্মরণ রাখিবে। অতএব স্থূল এবং সূক্ষ্ম, সাধারণ এবং বিশেষ, সন্তরণ এবং মগ্ন, অবলোকন এবং নিরীক্ষণ, এই উভয়ই এক সঙ্গে রাখিবে। নিরীক্ষণ কেমন? যেমন ডুবে জল খাওয়া। চারিদিকে জল, কিন্তু যে জল মুখের ভিতর যাইতেছে, তাহারই আস্বাদন হইতেছে। যোগী কি স্থলে বসিয়া জল পান করেন? না। যোগী জলময় ব্রহ্মময় আকাশের ভিতরে ডুবিয়া ব্রহ্মগুণরস আস্বাদন করেন। ব্রহ্মজলে তাঁহার শরীর বেষ্টিত; কিন্তু তাহার একটি বিশেষ স্থানে বসিয়া যোগী সেই রস পান করেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

নাম-গ্রহণ।

কলুটোলা, ২৭শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক; ৮ই মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি যে নাম-মন্ত্র শিক্ষা করিলে, এই নাম আমাকে তিনবার শ্রবণ করাও, হরি সুন্দর, হরি সুন্দর, হরি সুন্দর। আমি তোমায় দশবার শ্রবণ করাই। তুমি মনে মনে কিয়ৎকাল এই নাম জপ কর। এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম রূপ করিয়া দর্শন কর, শব্দ করিয়া শ্রবণ কর, রস জানিয়া আস্বাদ কর, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতরে রাখ। এই নামে আপনি বাঁচিবে, পরকে বাঁচাইবে। নাম

সর্ব্বস্ব। ইহকাল পরকালে নাম বিনা আর কিছু নাই। নাম সৎ, অতএব নাম সার কর।

হে গতিনাথ, তোমার নাম জানিলাম না। তোমার নাম আস্বাদ করিতে দাও। নাম স্বর্গ, নামই বৈকুণ্ঠ, নাম পরাইয়া দাও। এস হে দয়াল ঈশ্বর, নাম হার করিয়া দাও, তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি।

দর্শন-সাধন।

সাধনকানন, ৭ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক; ২১শে জুলাই, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, উপযুক্ত আবাস স্বীকার করিয়া দর্শন শিক্ষা কর এবং দর্শন সাধন কর। সুবুদ্ধি সাধকমাত্র এই কথা বলিবেন, দর্শন পরমানন্দ, দর্শন গতি, দর্শন মুক্তি, দর্শন মনুষ্যজীবনের ভূষণ, দর্শন মহারত্ন। যদি বল, দর্শন আবার শিখিব কি? চক্ষুর নিকটে বস্তু থাকিলেই তাহা দেখা যায়। বাস্তবিক বাহিক দর্শন শিখিতে হয় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধীভূত থাকিলে দর্শন শিখিতে হয়। চক্ষু খোলা থাকিলে দর্শন অনিবার্য্য, তখন বরং দর্শন না করিব কিরূপে বুঝা যায় না। খোল চক্ষু, দেখ ব্রহ্ম। চক্ষু খোলার পর ব্রহ্মদর্শন। কিন্তু যে অন্ধ, সে কেমন করিয়া চক্ষু পাইবে? যে চক্ষু খুলিতে জানে না, সে কেমন করিয়া দেখিবে? সেই ব্যক্তিকে দর্শন শিখিতে হইবে, দর্শন সাধন করিতে হইবে। কিন্তু চক্ষু খুলিলে যদি কেহ দর্শন শিখাইবার জন্য উপদেশ দিতে আসে, তাহাকে দূর করিয়া দিবে, তাহার কথা শুনিবে না, উহা নির্ব্বোধের কার্য্য। যখন চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন সহজে অবাধে মানুষ দেখিবে, না দেখা অসম্ভব

হইবে। চক্ষু কি নাই, কি আছে? চক্ষু আছে। কোথায়? ভিতরে। কিন্তু তাহা সন্দেহ, অবিশ্বাস ও পাপেতে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে দর্শনশক্তি আছে; কিন্তু জ্ঞানের আলোক নাই, কুসংস্কার, পাপ, অবিশ্বাস আসিয়া সেই চক্ষুকে অন্ধকারে ফেলিল। অন্ধকারের ভিতরে চক্ষু খোলা রহিল; কিন্তু অন্ধকার দেখিতে দেখিতে দর্শনশক্তি স্ফূর্ত্তি না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। বাহ্যিক চক্ষু আলোক পাইল, বস্তু সকল দেখিল। ভিতরের চক্ষু আলোক পাইল না, ক্রমাগত অন্ধকার দেখিতে দেখিতে অন্ধীভূত হইয়া গেল। এখন সেই চক্ষুকে জাগ্রত করিতে হইবে। অনেক যুক্তি দ্বারা সত্তা নির্ণয় করিয়া যে ঈশ্বরকে দশন, সে দর্শন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং সে দর্শন থাকিবে না। দর্শন কেমন? "এই তুমি, এই আমি" "এই যে তুমি, যে তুমি আমার সমক্ষে, আর আমি তোমার সমক্ষে" যাহার অপেক্ষা সহজ আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন জড়দর্শন সুলভ, তেমনি ব্রহ্মদর্শন সুলভ। "এই আমার বুকের ভিতর তুমি, এই তোমার বুকের ভিতরে আমি।" চক্ষু খোলার পর আর যুক্তি স্থান পায় না। যদি পায়, জানিও, কোন পাপ আসিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া যদি আবার 'ঈশ্বর আছেন' ইহা যুক্তি দ্বারা অবধারণ করা আবশ্যক হয়, তবে পূর্ব্বে সাধনে ত্রুটি ছিল, মনে করিতে হইবে। চক্ষু খোলার পর ব্রহ্মদর্শন জলের মত, বায়ুর মত সহজ। চক্ষুরূপ যন্ত্রকে ব্যবহার কর নাই, সাধন দ্বারা টানিয়া কোনমতে জাগ্রত করিয়া তোল। চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে আর ভয় থাকিবে না। কিন্তু চক্ষু খুলিতে অনেক আয়াস, অনেক সাধন যত্নের প্রয়োজন। মূল এই চক্ষুকে খোলা। অন্ধকে বল, ঈশ্বর তোমার কাছে, সে বলিবে কৈ? সে বলিবে, ঘর, বাড়ী, গাছ, আকাশ দেখি, ঈশ্বরকে দেখি না। কাছে

কেহ আছেন, ইহা বুঝিতে পারে না। দর্শনের অবস্থা কি? "এই যে তোমার ঈশ্বর, এই যে তোমার ডান দিকে, এই যে তোমার বুকের ভিতরে, এই যে তোমার বামে" এ সকল কথা শুনিয়া তাকাইবা মাত্র অমনি শরীর রোমাঞ্চিত হইল। অন্ধ যে, তাহাকে বল, তোমার নিকটে পৃথিবীর রাজা বসিয়া আছেন, অথবা তোমার চারিদিকে পঞ্চাশটি ব্যাঘ্র, সে মনে করিবে, উপহাস করিতেছে। প্রকাণ্ড সত্য তাহার পক্ষে উপহাস। জিনিস আছে, কি নাই, সে তাহা বুঝিতে পারে না। অন্ধ যদি হঠাৎ প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখে, তাহার শরীর মন স্তম্ভিত হইবে। যখন চক্ষু কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হয়, তখন দর্শনের যে উজ্জ্বল অবস্থা, তাহা নহে। যতই চক্ষু খুলিয়া অভ্যাস করিবে, ততই দর্শন উজ্জ্বলতর হইবে। এত বড় পদার্থ, মহান্ এবং অনন্তের কাছে বসিলে যদি শরীর মনের সমান অবস্থা থাকে, তবে জানিবে, ঈশ্বর-দর্শন হয় নাই। ঐ যে এত বড়, এমন বৃহৎ, এমন মহান্, আমার সাম্‌নে ইহা দেখিবামাত্র শরীর শির্ শির্ করিয়া আসিবেই আসিবে, মন স্তম্ভিত হইবে। শান্তভাবে, অবিচলিত ভাবে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে ব্রহ্ম-দর্শন যদি সম্ভব হয়, তবে আগুনে হাত দিলে হাত শীতল হয়, তাহাও সম্ভব। তুমি কি বল সম্ভব? তবে, ওহে সাধক, তোমার দেখা হয় নাই। দর্শন ফল দ্বারা জানা যায়। দর্শন হইলে মন স্তম্ভিত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। ক্রমে ক্রমে দর্শন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

দৃষ্টি-সাধন।

সাধনকানন, ১০ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক; ২৪শে জুলাই, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, চক্ষুকে কদাপি অবহেলা করিবে না। যদি বল চক্ষু কি, চক্ষুর আবশ্যক কি, চক্ষুর গুরুত্ব কি? চক্ষুর আদর করিব কেন? ভক্ত চক্ষুকে বিশেষরূপে আদর করেন। চক্ষু ভক্তির যন্ত্র। সেই যন্ত্র চালিত হইলে ভক্তি প্রস্ফুটিত হয় ভক্তি হৃদয়ের ভিতরে, যাঁহাকে ভক্তি করিব, তিনি আছেন বাহিরে। এই চক্ষুরূপ বিশেষ যন্ত্র দ্বারা ভক্তি তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত হইবে। বাহিরের বস্তুই দেখি, আর ভিতরের বস্তুই দেখি, দেখিতে হইবে। না দেখিলে ভক্তি হয় না। ভক্তিরাজ্যের দ্বার এই চক্ষু, সেই দ্বারের চাবি দর্শন। না দেখিলে ভক্তিস্রোত বন্ধ হইবে। ভক্তবৎসল শত সহস্র বৎসর তোমার চক্ষের সমক্ষে থাকুন না কেন, না দেখিলে ভক্তি হইবে না। চক্ষুর মধ্যে যোগনদী এবং ভক্তিনদীর মিলন হয়, ইহার ভিতর দিয়া যোগপথে এবং ভক্তিপথে দুই দিকেই যাওয়া যায়। এই চক্ষুর ভিতর দিয়া যোগী যোগেশ্বরকে দেখেন, ভক্ত ভক্তবৎসলকে দেখেন। যোগের দেখা শাদা চক্ষে জল নাই। এই "তুমি আছ" ইহা যোগীর মূলমন্ত্র। এই সত্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিতে করিতে যোগীর দর্শন উজ্জ্বলতর হয়। এইখান দিয়া যোগী তাঁহার নৌকা ভাসাইয়া দিলেন, সত্যপদার্থ ধরিলেন; ভক্ত বসিয়া আছেন, প্রতীক্ষা করিতেছেন, "তুমি আছ" শুদ্ধ এই সত্য ধরিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না। শাদা চক্ষে বর্ণহীন ঈশ্বরকে দেখিলে তাঁহার ভক্তি হয় না। প্রেম পুণ্যে অনুরঞ্জিত সুবর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে, তবে তাঁহার চক্ষে প্রেমজল আসিবে।

যিনি ভক্তবৎসল প্রেমময়, যাঁহার মুখে পবিত্রতার রঙ্গ, প্রেমের রঙ্গ আছে, প্রেমাশ্রু-পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে। নতুবা শাদা চক্ষে রঙ্গের প্রতিভা হয় না। পদার্থের খুব সুন্দর রঙ্গ হউক না, জল চাই, নতুবা তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না। যখন চক্ষে জল আসিল, তখন প্রেমময়ের রঙ্গ প্রতিভাত হইল এবং তখন ভক্তের প্রাণ হইতে আরও ভক্তির জল, প্রেমের জল বাহির হইতে লাগিল। ডোবার মত অল্প জল ছিল, পরে পুষ্করিণী হইল, ক্রমে নদী হইল, পরে সমুদ্র হইল। তার উপর জোয়ার আসিল, আবার প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উথলিয়া পড়িল, সেই জলপ্লাবনে সমুদায় ভাসিয়া গেল। যত জল পড়ে, তত জল আসে। না দেখিলে কিছু হয় না। বস্তু দেখা ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। এই চক্ষুই সাধনের যন্ত্র। যদি রুক্ষ ভাবে কঠোর রূপ দেখ, হে অল্প-ভক্তিবিশিষ্ট সাধক, তোমার ভক্তি হইবে না। যতক্ষণ রূপের ভিতরে মাধুরী, সৌন্দর্য্য না দেখ, ততক্ষণ ভক্তির উদয় হইবে না। কেন ভক্ত হইবে? যাহার ভক্তি হইয়াছে দেখিতে দেখিতে, ক্রমাগত দেখিতে দেখিতে এমন হইবে যে, তাহার চক্ষু হইতে সেই প্রতিভা আর চলিয়া যাইবে না। ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবে, যাহা হয়, চক্ষু দিয়া হইবে। তুমি রুক্ষ নয়নে দেখিলে ভক্তি হইবে না। অশ্রু-রঞ্জিত চক্ষে দেখ, সহজেই ভক্তি হইবে। এই উপদেশ হইতে এই বিধি উৎপন্ন হইবে, যদি ভাল দর্শন না হয়, চক্ষের দোষ দিবে। এই বলিবে, পোড়া চক্ষু ঠাকুরকে ভালরূপে দেখিতে দিল না। পাঁচ মিনিটে না হয় দশ মিনিটে, দশ মিনিটে না হয় আধ ঘণ্টাতে, আধ ঘণ্টাতে না হয় এক ঘণ্টাতে, যতক্ষণ সেই মধুর ভাবে দর্শন না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। আগা গোড়া চক্ষুকে লইয়া টানা-টানি করিবে। চক্ষের ভিতরে অনেক লীলা খেলা, চক্ষের ভিতরে

অনেক রত্ন। ভক্তি যদি শিখিবে, চক্ষুতে অঞ্জন দাও, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রেমাশ্রু আসে, তাহার উপায় কর। তাহা হইলে যখনই তাঁহার দিকে তাকাইবে, তখনই সুন্দর ভাব আসিয়া প্রাণ মোহিত করিবে, তখন ইচ্ছা হইবে, আরও তাকাইয়া থাকি। নিরীক্ষণ করিতে করিতে আঠার মত একটা বস্তু আসিয়া চক্ষুকে একেবারে সেই রূপের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া ফেলিবে। চক্ষুর ভিতরে এত নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। চক্ষু শত্রু হইলে সহস্র মিত্র কিছু করিতে পারিবে না। অতএব চক্ষু যেন বন্ধু থাকে। চক্ষু যেন প্রেমের জল উথলিত করিয়া দেয়। সেই রঙ্গ যতক্ষণ চক্ষে না পড়িবে, ততক্ষণ ছাড়িবে না। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভক্তি প্রেম বাড়িবে। অতএব চক্ষুকে শ্রদ্ধা কর। চক্ষুর মহত্ত্ব প্রশংসা কর। চক্ষু মিত্র হউক, চক্ষু সুহৃদ্ হউক, চক্ষু প্রেমানুরঞ্জিত ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি ফুল প্রস্ফুটিত করিয়া দিক্।

দর্শন-ভেদ।

সাধনকানন, ১১ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক ; ২৫শে জুলাই, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, যাহার কখন দর্শন হয় নাই, তাহার প্রথম দর্শন হইলে মনের কি রকম গাম্ভীর্য্য ও স্তম্ভিত ভাব হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহার কখনও দেখা হয় নাই, দেখিবা মাত্র তাহার শরীর মন স্তম্ভিত হয় ; তাহার চক্ষের সমক্ষে উপলব্ধি করিবা মাত্র শরীর মন বিস্ময়াপন্ন হয়। ইহাই অবাক্ হইবার অবস্থা, আশ্চর্য্য হইবার অবস্থা। এ সকল ভাব প্রথম অবস্থায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতে দর্শনের ভাব প্রকাশ হয় না। কেহ যদি মারে, কে মারিল, কেন মারিল, প্রথমে

এ ভাব মনে হয় না, কেবল যন্ত্রণাই প্রবল হয়। অনেক কাল পর আলোক দেখিলে, আলোক কি, তাহা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু আলোক দেখেই মন মোহিত হইয়া যায়। প্রথম, ভাবে তদ্গদ, পরে বস্তুনির্ণয়। ক্রমে ক্রমে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি এবং বস্তুর সমালোচনা আরম্ভ হয়। সেইরূপ দর্শন। দর্শন অনেক প্রকার। যেমন স্বর্গ অনেক প্রকার, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ আছে, সেইরূপ দর্শনেরও ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান আছে। প্রথম দর্শন দ্বিতীয় দর্শন অপেক্ষায় নিকৃষ্ট। ক্রমেই দর্শন উচ্চ হইতে উচ্চতর, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়। দর্শনকে ঠিক স্বর্গের মত মনে করিবে। অতএব দর্শন উজ্জ্বলতাতে বিভিন্ন। আরও এক প্রকার বিভিন্নতা আছে, তাহার স্থায়িত্বসম্পর্কে। যে ব্যক্তি বহুক্ষণ অন্ধকারে থাকে, সে হঠাৎ আলোক দেখিলেই অন্ধ হইয়া যায়। আলোকদর্শন অভ্যস্ত না থাকিলে প্রথম আলোক-দর্শন গভীর অন্ধকারের হেতু হয়। সেইরূপ যদি অনেক কালের পর একবার ঈশ্বর দর্শন হয়, সেই দর্শনের পর আবার গভীরতর অন্ধকার হয়। বার বার দর্শন হইলে সে অন্ধকার কম ঘন হয়। যাহাদের উজ্জ্বলতর দর্শন হয়, তাহাদিগকে আর এক প্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে অর্থাৎ একবার উজ্জ্বল দর্শনের পর যে অন্ধকার হয়, তাহা ঘন, না ঘনতর। সেই পরিমাণে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। খুব উজ্জ্বল দর্শন হইল, তার পর উজ্জ্বলতা কমিল বটে, কিন্তু সেই আলোক অনেকক্ষণ স্থায়ী হইল। দর্শনের উজ্জ্বলতানুসারে যেমন সাধকদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, সেইরূপ সেই উজ্জ্বলতার স্থায়িত্ব অনুসারেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হয়। সেই সাধক কি সুখী, যিনি একবার খুব উজ্জ্বল দর্শন পাইলেন, কিন্তু তার পর দুই মাস অন্ধকারে রহিলেন? না, তিনি সুখী, যিনি তেমন

উজ্জ্বলরূপে দেখিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই এক প্রকার তাঁহাকে দেখিতে-ছেন? ঈশ্বরকে একবার উজ্জ্বলরূপে দেখিলে; কিন্তু অন্য সময় যদি ঈশ্বরসহবাসে বসিয়া আছ এরূপ মনে করিতে না পার, তবে জানিবে, সেই আলোক আর নাই। দর্শনের সময়ে দর্শন উজ্জ্বল হইবে এবং যখন দর্শন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলতা থাকিবে, এইরূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। এই তারতম্যানুসারেই দর্শনের প্রকারান্তর হয়, উচ্চতর হইতে উচ্চতম দর্শন হয়। আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে। যদি যথার্থই দর্শনের অধিকারী হইতে চাও, তবে খুব উজ্জ্বল দেখিবে এবং এমন করিয়া দেখিবে, যাহাতে আর বিচ্ছেদ না হয়। ক্রমে ক্রমে যত ভাল দেখিবে, তত বিচ্ছেদ অসহ্য হইবে। যাহার দর্শন ভূতকালে, বর্ত্তমানে দেখে না, সে অবস্থা যেন তোমার না হয়। তোমার দর্শন ভূতকালে উজ্জ্বল, বর্ত্তমানে উজ্জ্বলতর এবং ভবিষ্যতে যেন উজ্জ্বলতম হয়। আগে পাঁচবার বিচ্ছেদ হইত, এখন দুইবার বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না। এইরূপে যাহারা উচ্চ শ্রেণীর দর্শক, সেথানে পৌছিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাবের প্রাধান্য।

সাধনকানন, ১৪ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক; ২৮শে জুলাই, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী, চক্ষুকে যদিও যন্ত্র বলিয়া জানিলে, চক্ষের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলে; কিন্তু যোগনদী এবং ভক্তিনদীর বিভিন্নতা স্মরণ রাখিবে। যোগীর দৃষ্টি চিরদিন অটলভাবে সেই বস্তুর প্রতি সংস্থিত। ভক্তের দৃষ্টি বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তিকেই আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়। যোগচক্ষে দর্শনই লক্ষ্য, দর্শনই পুরস্কার,

দর্শনই সাধন। ভক্তিদৃষ্টির পক্ষে তাহা নহে, ভক্তিচক্ষে প্রত্যেকবার দর্শনে অনুরাগ, ভক্তি উপস্থিত হয়, মুগ্ধতা হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হয়। যে দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভাবের উদয় হয়, তাহাই ভক্তিচক্ষে দর্শন। দর্শনের জন্য দর্শন ভক্তিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ভক্তের দর্শন প্রেমের জন্য, ভক্তি শান্তির জন্য। ভক্ত, তুমি কি দেখিয়াছ তাঁহাকে? ইহার অর্থ এই যে, তুমি কি দেখিবা মাত্র পুলকিত হইয়াছ? ভক্তি উথলিয়া উঠিবে, এই অভিপ্রায়ে দর্শন, অতএব ভক্তের দর্শন উপলক্ষ। ভক্ত যখন ব্রহ্মবস্তুকে স্থিরভাবে দেখেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তরে হুহু করিয়া প্রেমস্রোত আসে; অত্যন্ত ভক্ত যিনি, তাঁহার আর বিলম্ব হয় না। দর্শনমাত্র সমুদায় ভক্তির ভাব হয়। যদি একবার দেখিবার পর তাদৃশ ভাব না হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু ভক্তিচক্ষে দৃষ্ট হয় নাই। দর্শন অপেক্ষা ভক্তি উৎকৃষ্ট ভক্তিশাস্ত্রে। দর্শন উপায়, তদ্দ্বারা হৃদয় প্রেমরসে প্লাবিত হয়, নতুবা দর্শন অগ্রাহ্য। তবে, শিক্ষার্থী, তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন ভাবে মন মত্ত হয়, তখন কি দর্শন হয় না? ইহা বুঝিতে না পারাতেই জগতে কুসংস্কার আসিয়াছে। প্রেমে মত্ত হইবে, অথচ দর্শন সূত্রটি হাতে রাখিতে হইবে, নতুবা নিশ্চিত বিপথগামী হইবে। চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে; কিন্তু তোমার এই অবস্থা হইবে যে, তুমি দেখিতেছ কি না ভাবিবে না, অর্থাৎ একটি যন্ত্রের যেমন দুইটি মুখ, এক দিকে চক্ষু ব্রহ্মে নিমগ্ন, আর এক দিকে উৎস হইতে যেন জল উঠিতে লাগিল। ঐ মুখ বন্ধ কর, জল উঠিবে না। যন্ত্রের যে দিকে ব্রহ্ম-দর্শন হইতেছে, তুমি সেই দিকে খেয়াল রাখিবে না; তুমি সেই সময় দর্শন হইতেছে কি না, দৃষ্টি রাখিবে না। প্রথম একবার দেখিয়াই, ভাবসাগরে ডুবিবে। বস্তু এক দিকে, ভাব এক দিকে।

বস্তুর প্রতি অনেক দৃষ্টি যোগ।

ভাবের প্রতি অনেক দৃষ্টি ভক্তি।

ভাব, ভাব, ভাব, ভক্তি।

বস্তু, বস্তু, বস্তু, যোগ।

ভাব-প্রধান সাধক ভক্ত।

বস্তু-প্রধান সাধক যোগী।

অতএব ভক্তের পক্ষে প্রাণের ভিতরে প্রেম সঞ্চার হয় কি না, দেখা সর্ব্বপ্রধান। "এই তুমি" ইহা বলিতে বলিতে, এই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তের ভাবের প্রাবল্য। এই প্রাবল্য স্থির না অস্থির, অপরিবর্ত্তনীয় না পরিবর্ত্তনীয়, রোজ রোজ ঠিক পরিমাণে আসে, না ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এ বিষয় পরে বিবেচ্য। আজ এই পর্য্যন্ত।

ব্রতান্তে যোগী ভক্ত জ্ঞানীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ।

১৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, ভক্তি, যোগ বা জ্ঞান যাহাতে তোমাদিগের চিত্ত অনুরক্ত হউক, জানিও, সে সকলই পুণ্যমূলক। অতএব যত্নপূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় কর। রসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখ, তাহাতে যেন তোমাদের স্খলন না হয়। এ বিষয়ে তোমরা কখনও শিথিল হইও না, লোকেরা তোমাদিগকে এই লক্ষণেই চিনিবে। তোমাদিগের চরিত্র দ্বারা যাহাতে ভক্তি যোগ জ্ঞানে কাহারও ঘৃণা বা সংশয় না হয়, এরূপ নিয়ত যত্ন করিবে। তোমাদিগের প্রতি প্রভুর এই আদেশ।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই আদেশ প্রতিপালন কর। কার্য্য, রসনা ও চিত্ত হইতে পাপ দূরে রাখ, যাহাতে পাপ এ সমুদায় হইতে বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্য যত্ন কর। যখনই পাপ চিন্তা হঠাৎ মনের ভিতরে উদিত হইতে উদ্যত হইবে, তখনই বলসহকারে উহাকে দূরে নিক্ষেপ কর। পুণ্য উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া নির্ম্মলচিত্তে বিচরণ কর এবং সকলের প্রিয় হও। প্রভু তোমাদিগের হস্তে গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। ইহা প্রতিপালনের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া নিজ ব্রত বহন কর।

২য়।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, তোমরা দীর্ঘকাল ব্রত ধারণ করিলে। যাহারা ব্রত ধারণ করে নাই, তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের ভিন্নতা থাকিবে। তোমাদিগের ব্রত সফল হইয়াছে, ইহাতেই বুঝা যাইবে। সংসারিগণ হইতে যদি তোমাদের ভিন্নতা না হইল, তবে ব্রতে কি প্রয়োজন ছিল? এরূপ হইলে সমুদায় নিষ্ফল হইয়াছে সন্দেহ কর। জীবন যাহাতে নিত্য পবিত্র ও উন্নত হয়, ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন কর। ঈশ্বরে অনুরক্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বনপূর্ব্বক অল্পে তুষ্ট হও, ভোগ ও বাসনা পরিত্যাগ কর। অনাহারাদি দ্বারা শরীর কৃশ করিলে ভোগাভিলাষ যায় না। আসক্তি উন্মূলন করিয়া ইহা সহজে সাধিত হয়। বাসনার নিবৃত্তি এবং ঈশ্বরে অনুরাগ, এই দুই ব্রতের সাফল্য জানিবে। অতএব লোকে যাহাতে বিষয়িগণ হইতে তোমাদিগের ভিন্নতা বুঝিতে পারে, তজ্জন্য নিয়ত যত্ন কর।

৩য়।

হে ধর্ম্মার্থিগণ, আগে ছোট, তারপর বড়; ছোটতে যে কৃতার্থ হয়, বড়তে সে কৃতার্থ হয়। যদি জগতের ভিতরে পরসেবা করিয়া

জীবনকে পবিত্র করিবে মনে থাকে, তবে ছোট দল যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যে গুণ তোমাদের এই কয় জনের ভিতরে আয়ত্ত হইবে, সেই গুণ জগৎকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। এই অবস্থা ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণের জন্য দিয়াছেন। এই অবস্থা অনুসারে স্বীয় উন্নতি করিতে পারিলে জগতের সেবাতে নিরাশ হইবে না। আগে নির্লোভী হইয়া এই কয়জনকে সেবা কর। এই কয়জনকে পরিত্রাণপথের সঙ্গী এবং ঈশ্বরের সেবক জানিয়া পরস্পরের সেবা শিক্ষা কর। অনেকে একেবারে প্রকাণ্ড জগতের সেবা করিতে গিয়া কার্য্যে কিছুই করিতে পারে না, কারণ অত বড় সমুদ্রে কি কেহ হা'ল ধরিতে পারে? এই জন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া তোমাদের অল্প কয়েকজনকে একত্র করিয়াছেন। এই দলের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায় ভাব আছে, তাহা দূর কর। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ অভ্যাস কর। তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ থাকিবে না। এই কয়জনকে পর ভাবিতে পারিবে না। অহঙ্কারী বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। এই কয়জনকে সামান্য মনে করিবে না। কখনও ক্ষমাবিহীন এবং অপ্রেমিক হইবে না। আলস্যপরায়ণ হইয়া জীবনকে নষ্ট করিও না। আগে একটী সর্ষপকণার ন্যায় স্বর্গ নির্ম্মাণ কর। একত্র অধ্যয়ন, একত্র শিক্ষা লাভ করিবে। সহাধ্যায়ী কয়জন, তোমাদের মধ্যে যতগুলি সাধুভাব আছে, এই কয়জন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত কর, জীবন সংগঠিত হইবে। ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা কর, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কর।

সাধক চতুষ্টয়ের ব্রতোদযাপন উপলক্ষে আচার্য্যের উপদেশ।

২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক ; ৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

তিন শত পঁয়ষট্টি দিন অতীত হইল। ব্রতদাতা ঈশ্বর আজ সিদ্ধিদাতা হইয়া তোমাদিগকে ফল বিধান করুন! ফলবিহীন ব্রত শুষ্ক স্রোতের ন্যায়। বীজ রোপণ করিয়াছ, আজ বৃক্ষকে নাড়া দাও, যদি ফল পড়ে, জানিবে, তোমাদের সার্থক জীবন। কল্পতরুমূলে বসিয়া চারিদিকে তাকাও। নিয়মপালনসম্বন্ধে তোমাদের ত্রুটি হইয়াছে, সৎপ্রসঙ্গ ভাল হয় নাই, এইজন্য তোমরা দণ্ডের উপযুক্ত। যদি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না হয়, তোমাদের মধ্যে এই অপরাধ থাকিয়া যাইবে। সাধুসঙ্গে থাকিয়াও যদি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে, হে ধর্ম্মার্থিগণ, বিশ্বাস কর, এই সাধন অতি দুর্লভ। সৎপ্রসঙ্গ প্রতিদিন করিতেই হইবে। দুর্ব্বলপ্রকৃতি মনুষ্যের পক্ষে সৎপ্রসঙ্গ কঠিন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সৎপ্রসঙ্গ শিখিয়া সৎপ্রসঙ্গের সুধা পান করিবে। সৎসঙ্গে অনুরাগী হইতে হইবে। সৎপ্রসঙ্গে মোহিত হওয়া, আর ঈশ্বরে মোহিত হওয়া এক কথা। অন্যান্য বিষয়ে তোমাদের সাধনে ফল হইয়াছে, এখন গূঢ়, পরে প্রকাশ পাইবে। তোমরা চারিজনে মিলিত হইয়া অনন্ত জীবনের দিকে চলিয়া যাইবে। ব্রতপরায়ণ থাকিবে, ব্রত তোমাদের আহার, ব্রত তোমাদের বস্ত্র, ব্রত তোমাদের টাকা কড়ি। ব্রত পালন হইতেছে বলিয়া অহঙ্কারী হইবে না, আরও বিনীত হইবে : কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলের পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। তোমরা শূদ্রজাতি হইলে,

দাসের জাতি পাইলে, সেবকজাতিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেবকের ব্রত পালন কর। সকল সেবা অপেক্ষা লুক্কায়িত সেবা প্রধান। এমনি ভাবে সেবা করিবে যে, যিনি সেবিত, তিনি যেন টের না পান। কিছু বুঝিবেন, কিন্তু অনেক অংশ গুপ্ত থাকিবে। লোকে জানিতে পারিবে না, এমন সকল সেবা করিবে। সেবিত ভ্রাতা এবং সেবিতা ভগ্নী যদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন, যদি নিষ্ঠুরাচরণ করেন, তথাপি বিনীতভাবে তাঁহাদের সেবা করিবে। বাধাতে সেবা বৃদ্ধি। জগতে আসিয়াছ সেবা করিবার জন্য, সেবা করিয়া চলিয়া যাও। পায়ের দিকে দৃষ্টি যাহাদের, মুখের হাসি দেখিতে তাহাদের অধিকার নাই; অতএব তোমাদের প্রভু নরনারীদিগের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাও আর না পাও, তোমরা তোমাদের কার্য্য করিয়া যাইবে। ভিক্ষাবৃত্তি তোমাদের জীবিকা। অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিবে, যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে এক মুষ্টি অন্ন দেন। ভিক্ষার ভিতর দিয়া স্বর্গের পুণ্যস্রোত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব অভিমানী হইয়া পরের দান অগ্রাহ্য করিও না। একটি পয়সা যদি অনুগ্রহ করিয়া দেন, তাহা বিনীত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিবে, সেই পয়সার বিনিময়ে পুণ্যধন লাভ করিতে পারিবে।

যোগপরায়ণ, তুমি গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে, তাহা যোগশাস্ত্রের বর্ণমালার 'ক'।

ভক্তিপরায়ণ, ভক্তির মধুরতা এখন অনেক বাকি আছে, অপার প্রেমজলে ডুবিয়া বিহ্বল হইতে হইবে। ঈশ্বরের মুখ-দর্শনে এমন প্রমত্ত হইবে যে, অন্য দিকে আর মুখ ফিরিবে না।

জ্ঞানপরায়ণ, অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে, সেই মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে সকল

শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে সমুদায় অপরা বিদ্যা; শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে, যেখানে অমিল নাই।

ভক্তিপথের অনুবর্ত্তী, ভক্তিপথে যাওয়া আর ভক্তের অনুবর্ত্তী হওয়া একই। অনুবর্ত্তীর ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তি-পথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল নাম গ্রহণ করিতে করিতে, না জানি কোন দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ করিয়া, কত সুধা ভোগ করিবে। চলিয়া যাও, এই রাজ্যে অনুবর্ত্তী হওয়াতে ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে, তখন আর কিছু ভেদা-ভেদ-জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হইবে। ভক্তির আর দুই পথ নাই। অনুবর্ত্তীর পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া আবশ্যক। যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একে-বারে টানিয়া লইবেন, তখন 'অনুবর্ত্তী আছি' ইহা মনে থাকিবে না; তখন বুঝিবে, কেবল সুধাতে ডুবিয়াছি। আসল জিনিস এখন উদরস্থ হয় নাই। এত হইল, অথচ আমার কিছু হইল না, এই দুঃখ; কিছু করিলাম না, এত হইল, এই সুখ। এই দুই তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আসিলেন কি না, সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এখন যাঁহারা তোমাদের চারি দিকে বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়া নমস্কার কর।

সেবাশিক্ষার্থীর প্রতি আচার্য্যের প্রথম উপদেশ।

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০০ শক ;
১৭ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে সেবাশিক্ষার্থী, মনঃসংযোগপূর্ব্বক সেবাতত্ত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ত্ব শিক্ষা করিলে, সাধন করিলে, প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়া ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও সেবা এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশাস্ত্র বিভক্ত। চতুর্থ খণ্ড অদ্য আরম্ভ হইল। প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে মোক্ষধাম, দিব্যধাম লাভ করিবে। সেবানন্দে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সেবা মোক্ষধামের পথ, সেবা জীবনের ব্রত, সেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ, এই ভাবে সেবা গ্রহণ কর। সেবাতত্ত্বের মূল বিবেকতত্ত্ব। অতএব যাঁহারা সেবাতত্ত্ব-শিক্ষার্থী, তাঁহাদিগের পক্ষে বিবেকের মূলতত্ত্ব শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কে জানে সেবা কি? এই ঘোর অন্ধকারময় পৃথিবীর মধ্যে সত্যপথ কোন্‌টী, কে জানে? জানিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পারে? কিরূপে সেবা করিলে প্রভু তুষ্ট হন, কে বলিয়া দিবে? এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক এক মাত্র সৎপথ প্রদর্শক এবং নেতা। এই জন্য বিবেকতত্ত্ব জানা, বিবেকের অনুসরণ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেবাশিক্ষার্থী, এখনই কর্ণপাত কর। এখনই শুনিবে, পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা নানা প্রকার গোল করিতেছে। চারিদিকে দুর্ব্বুদ্ধির কুমন্ত্রণা

এবং পাপের ভয়ানক আস্ফালন হইতেছে। পাপাচারীদিগের প্রলোভন-বাক্য, শত্রুদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন, সংসারী মনুষ্যদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কে গুরু? কাহার নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করিব? কোন্ পথে গেলে ঠিক সত্য পাইব? একে পথ চিনি না, তাহাতে চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে। আবার পাপীরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সংসারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী। তরী বুঝি মারা যায়, ভয়ানক পাপের ঢেউ উঠিতেছে; কিন্তু আরোহীর আশা আছে, যদি কেহ হাল ধরে, সব বিপদ অতিক্রম করিয়া শান্তি উপকূলে উপনীত হইতে পারিব। ঘোর বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী 'কোথায় কর্ণধার, কোথায় কর্ণধার' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল। "আমি আছি" ভয়ানক অন্ধকার ভেদ করিয়া এই কথা উঠিল। উচ্চরবে একজন বলিলেন, "আমি আছি"। তব নাম কি? বিবেক। তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্থির হইল। ভারী তুফানের সময় ভবনদীর মধ্যে কর্ণধার পাওয়া গেল, নেতা পাওয়া গেল, ভরসা উদিত হইল। ভীত মনে সাহসের সঞ্চার হইল, মৃত মনে আবার বল আসিল। স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত একজন স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া "আমি আছি" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া অস্থির জগৎকে শান্ত করিলেন। নৌকা টল্‌মল্ করিতেছিল, এখন সেই আন্দোলনের বক্ষে তরী অনান্দোলিত হইল। জীব দিক্ নিরূপণ করিতে লাগিল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে সূর্য্য উঠে, ঐ দিকে সূর্য্য অস্তমিত হয়। গম্যস্থল ঠিক হইল—বিবেকী মনুষ্য ভয়কে অতিক্রম করিল। বিবেক যিনি, তিনি "আমি আছি" এই কথা বলিলেন। বিবেকের এই প্রথম আত্মপরিচয় চিত্ত-স্থৈর্য্যের হেতু। বিবেকের আত্মপরিচয়ে সেবার আরম্ভ। বিবেক—নিদ্রিত

যেখানে, সেবা কল্পনা সেখানে। যেখানে বিবেক অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলক্ষিত, সেখানে সেবাসাধন ক্ষণস্থায়ী, অনুমানের ব্যাপার। এই কি বিবেক? ইঁহার বাসস্থান কোথায়? ইনি কে? পৃথিবীর পণ্ডিতেরা বলেন, বিবেক মনের একটী বৃত্তি। দেবলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল। তাহা নহে, তাহা নহে, তাহা নহে। মূর্ত্তি-উপাসকেরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বলে, এই ঈশ্বর। দৈববাণী হয়, না। তথাপি লোকে মূর্ত্তি পূজা করে এবং সেই মূর্ত্তিকে দেবতা বলে। মূর্ত্তি ছাড়িয়া যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে অনেক পোষিত অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এইজন্য সুবিধার অনুরোধে লোকে মূর্ত্তি-পূজা করে। তেমনি ঈশ্বরকে বিবেক বলিলে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিতে হয়, এইজন্য মনুষ্য আপনার মনের বৃত্তিকেই বিবেক বলে। দেবপ্রকৃতিকে নীচ মনুষ্যের বৃত্তি বলা হইল। ঈশ্বরের কথা মনুষ্যের বোধায়ত্ত নহে বলিয়া, মনুষ্য বিবেককে আপনার মানসিকবৃত্তি বলিল। কিন্তু বিবেক বৃত্তি নহে। বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর, —ঈশ্বর ছাড়া আর বিবেক নাই। তিনি নিজেই নিজের আলোক— তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য মনুষ্যের মনে অন্য আলোক নাই। তিনিই আপনিই আপনাকে জানান। তাঁহাকে জানিবার জন্য মনুষ্যের মনে তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নাই। তিনি আপনিই উদ্দেশ্য, আপনিই উপায়। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তিনিই উপায় —অন্য সোপান নাই। বিবেক মনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি নহে, বিবেক স্বয়ং ঈশ্বর। আপনার অবয়বের মত হাত পা বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাজ্ঞানে তাহার পূজা করা মনুষ্যের অভ্যাস। সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পনা করাও মনুষ্যের বিকৃত স্বভাব। কিন্তু ঈশ্বর মূর্ত্তিও হন না, বৃত্তিও হন না।

ক্ষুদ্র মনুষ্য তাঁহাকে মূর্ত্তি ও বৃত্তি করিতে যায়; কিন্তু তিনি কিছুই হন না। অতএব যদি মহাপ্রভুর দাসানুদাস হইতে সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীর নীতিজ্ঞেরা বলেন, বিবেক নামক মনের একটী বৃত্তি সত্যাসত্য ভালমন্দ জানাইয়া দেয়—কিন্তু ধার্ম্মিকেরা বলেন, ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যকে পাপ পুণ্য বুঝাইয়া দেন এবং তাহার মনে ধর্ম্ম দেন। ধন্য বিবেক!! তোমার মনুষ্যত্ব ঘুচিল, তোমার ঈশ্বরত্ব দেখিতেছি। এই বিবেকতত্ত্ব জান, এই তত্ত্ব সাধন কর। সাধন করিয়া অসত্য পরিত্যাগ এবং সত্যগ্রহণ করিয়া স্বর্গধামের উপযুক্ত হও। এই প্রথম উপদেশ।

সেবাশিক্ষার্থীর প্রতি দ্বিতীয় উপদেশ।

২রা কার্ত্তিক, ১৮০০ শক; ১৮ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে সেবাশিক্ষার্থী, তুমি সাধারণ লোকের ন্যায় ভ্রমে পড়িয়া কদাচ এ কথা বলিও না যে, বিবেক মনের একটি বৃত্তি। ঈশ্বরকে জড় পুতুলের সঙ্গে সমান করিলে যেমন মিথ্যাদোষে দোষী হইতে হয়, সেইরূপ জগদ্গুরু ঈশ্বরকে মনের বৃত্তির সঙ্গে সমান করিলে মিথ্যাপাপে কলঙ্কিত হইতে হয়। হয় বিবেক পার্থিব, নয় বিবেক স্বর্গীয়। হয় বিবেক মানুষ, নয় বিবেক দেবতা। তাহারা ভ্রমে পড়িয়াছে, যাহাদিগের মতে বিবেক মানুষের এক অংশ। সেবাশিক্ষার্থী, সাবধান, স্বয়ং দেবতা যিনি, তাঁহাকে মনুষ্যের অংশ মনে করিও না। দেবতার কথাকে, বিবেকের কথাকে মনুষ্যের মানসিক বৃত্তির মীমাংসা বলিলে,

কেবল কুযুক্তি এবং ভ্রম হয় তাহা নহে, পাপ হয়; যেমন ঈশ্বরকে মানুষ বলিলে পাপ হয়। বিবেক ঈশ্বরের অংশ। শরীরের সমুদায় অঙ্গ এবং মনের সমুদায় বৃত্তি মানুষের; কিন্তু বিবেক মানুষের নহে। মানুষের অতীত বিবেক। আর সকল আমি, কেবল বিবেক ঈশ্বর। দেহ মন আমার, আমার নয় কেবল বিবেক। বিবেকসম্পন্ন মনুষ্য, ইহার অর্থ ঈশ্বরসম্পন্ন মনুষ্য। বিবেক স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর। সেবা-শিক্ষার্থী, এই সত্য অবলম্বন কর, এই মূল সত্য চিরদিন গ্রহণ কর। যে কথা বিবেকের, সেটি ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বরের প্রমুখাৎ যে কথা শুনিবে, তাহাই বিবেকের কথা। ঈশ্বরের মুখের কথা, ঈশ্বরের হাতের লেখা বিবেকের কথা। বিবেকরাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরের। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেক হইয়া মনুষ্যের মনে সত্য কি দেখাইয়া দিতেছেন, বলিয়া দিতেছেন। স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর মনুষ্যের মনের ভিতরে বসিয়া দিবারাত্র সত্য শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতেছেন। তবে বিবেক বলিয়া আর মানুষের স্বতন্ত্র বৃত্তি রহিল না। একদিকে মনের সমস্ত বৃত্তি আমারই, আর একদিকে স্বয়ং ঈশ্বর বিবেক হইয়া এই সমুদায় বৃত্তির উপরে রাজত্ব করিতেছেন। এখন বুঝিলে বিবেক কি? কিন্তু কি লক্ষণ দ্বারা বিবেককে চিনিতে পারিবে? ঈশ্বরের উক্তি কিরূপে জানা যায়? মানুষের বিচার হইতে বিবেকের বাণীকে কেমন করিয়া স্বতন্ত্র করা যায়? প্রথম লক্ষণ এই;—ইহা করিলে ভাল হয়, ইহা করিলে মন্দ হয়, ইহা করিলে ইষ্ট হয়, ইহা করিলে অনিষ্ট হয়, ইহা দ্বারা অল্প লোকের অকল্যাণ হয়, কিন্তু অনেকের মঙ্গল হয়, এ সকল মনুষ্যের বুদ্ধির কথা। ভাল হয় কি মন্দ হয়, ইহা বলিয়া কখনও বিবেকের কথা আরম্ভ হয় না। কিম্বা বিশেষণ যোগ করিয়া বিবেক কখনও কথা বলেন না। ইহা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহা

ন্যায়, ইহা অন্যায়, বিবেক এ সকল কথাও বলেন না। বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর, ইহা করিও না, বিবেক এইরূপে আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এবং উপদেশ বিভিন্ন। আদেশ করা বিবেকের কার্য্য, উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য। সদ্যুক্তি অথবা হেতুপ্রদর্শন বুদ্ধির মীমাংসা। ইহা করিলে উপকার হয়, ইহা করিলে অপকার হয়, এরূপ হেতুপ্রদর্শন করিয়া উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির নিষ্পত্তি। ভাল হউক বা না হউক, কর, ইহা বিবেকের অনুজ্ঞা। বুদ্ধির মীমাংসা গৌণ মীমাংসা। বিবেকের আজ্ঞা বিদ্যুতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি ফলাফল বিচার করিয়া বহু আয়াসের পর, কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয়, এ সকল বিষয়ে উপদেশ দেয়। বিবেক একেবারে আদেশ করেন। বিবেক এবং বুদ্ধি কখনই এক নহে। বুদ্ধির পথ যদি দক্ষিণে হয়, বিবেকের পথ উত্তরে। বুদ্ধির পথ যদি নীচে হয়, বিবেকের পথ ঊর্দ্ধে। যেখানে দেখিবে আদেশ, সেখানে বিবেক। ভাল কথা বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধির কার্য্য। খুব ভাল কথাও মানুষের হইতে পারে; কিন্তু আদেশ কখনই মানুষের হইতে পারে না। সর্ব্বদা আদেশের আকারে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা, অথবা বিবেকের উক্তি প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর যখনই কথা কহেন, তাহা আদেশ। ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ঈশ্বর এরূপ কথা বলেন না। তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে কেবল বলেন, "ইহা কর, ইহা করিও না।"

দ্বিতীয় লক্ষণ অহেতুক। বিবেকের আদেশের হেতু নাই। প্রভু আজ্ঞা করিলেন, সে আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। কেন করিব? আজ্ঞাবহ দাসের মুখে এ কথা নাই। কেন এই আজ্ঞা পালন করিব, বিবেক ইহার উত্তর দিতে বাধ্য নয়, অর্থাৎ ঈশ্বর হেতুপ্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন। তিনি কখন ত হেতু দেখান না। হেতু দেখাইলে ত

তাঁহার অনুজ্ঞা বিচারের মধ্যে আসিল। তাঁহার অনুজ্ঞা মনুষ্যের বিচারের অতীত। যেখানে হেতু, সেখানে মনুষ্যের হাত। যেখানে হেতু নাই, সেখানে ঈশ্বরের আদেশ। যেহেতু ইহা করিলে দশ জনের দুঃখ বিমোচন হইবে, অতএব এই কার্য্য করা ভাল, ঈশ্বর এরূপ বলেন না। কেন এই আজ্ঞা পালন করিব, যে এই কথা জিজ্ঞাসা করে, সে পাষণ্ড। ঈশ্বর বলিতেছেন, অতএব করিব, অন্য কোন হেতু বা কারণ নাই। দ্বিরুক্তি ভিন্ন হেতু নাই। যদি হেতু জানিতে চাও, ঈশ্বর বলিবেন, যেহেতু আমি বলিতেছি। ঈশ্বরের নিকট হেতু নাই। পৃথিবীর পতি হেতু লিখিয়া নিষ্পত্তি লিখিবেন, কিন্তু সত্যস্বরূপ ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের এ ধর্ম্ম নহে। তিনি হেতু দেখাইবেন না। হেতু দেখাইলে তাঁহার শাস্ত্রের উচ্চতা থাকে না। যুক্তি বিবেচনা করিয়া এই অনুষ্ঠান কর, ইহা বুদ্ধির উপদেশ; কিন্তু মহাপ্রভু ঈশ্বর ভৃত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, অমুক স্থানে যাও। তিনি কাহারও নিকট কারণ বা হেতু প্রদর্শন করেন না। ধন্য সেই ভক্ত ভৃত্য, যিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। বিবেক অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা বলিবেন, তাহা করিতেই হইবে। কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে নিজের সর্ব্বনাশ এবং অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে। আদেশ, এবং আদেশ অহেতুক—এই দুই লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের উক্তি জানা যায়। আদেশ শুনিবে, হেতুর জন্য প্রতীক্ষা করিবে না, তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিবে, এই দ্বিতীয় উপদেশ।

যোগোপনিষৎ।

যোগে অধিকারী।

১লা ভাদ্র, ১৮০২ শক; ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, যোগেশ্বরের চরণে ভাল করিয়া প্রণাম কর, গম্ভীর মহাদেব মহেশ্বরের চরণে ভাল করিয়া প্রণাম কর। পরলোক-বাসী যোগধামবাসী যত মুনি, যত যোগী সকলের চরণে নমস্কার কর। যেখানে তাঁহারা থাকুন, প্রত্যেক যোগী, প্রত্যেক ঋষির চরণে মস্তক অবনত কর। বিশ্বাস-নয়ন খুলিয়া দেখ, গম্ভীরমূর্ত্তি যোগেশ আপনার যোগী ঋষি সন্তানদিগকে লইয়া বসিয়া আছেন। মহেশ্বর শিষ্য প্রশিষ্য সকলকে লইয়া তোমার কাছে। তাঁহার আবির্ভাবযোগে এই ঘর ঘোরাল ঘন। হিন্দুস্থানের যোগেশ্বর তোমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। যোগধর্ম্মের প্রতি একটু আদর দেখিলে সদ্‌গুরু পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। তুমি ব্রহ্মকর্ত্তৃক আদৃত হইতেছ, স্মরণ করিও; যে পরিমাণে আদর, সেই পরিমাণে গুরুতর যোগতত্ত্ব চাপাইবেন। মহেশ্বরের ভালবাসার উপযুক্ত হইবে, তত্ত্বসাধন করিবে, তত্ত্ব বুঝিয়া কেবল ক্ষান্ত হইবে না। সিদ্ধ হইয়া তুমি তোমার দেশে যোগ প্রচার কর, তোমার সদ্‌গুরু ঈশ্বরের তোমার প্রতি এই আজ্ঞা। অতএব তাঁহাকে প্রণাম কর, ভক্তির সহিত যোগধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ কর। তুমি কে, জান? তুমি আত্মা। আত্মা কে, জান? পরমাত্মার সৃষ্ট, পরমাত্মার সন্তান। তুমি কে? জীবাত্মা। কার সঙ্গে যোগ চাও? পরমাত্মার সঙ্গে। যোগ আছে, কি হইবে? আছে যোগ চিরদিন, জীব তাহা মানে না, জীব তাহা সাধন করে না; গম্ভীরপ্রকৃতি সাধক,

তুমি তাহা সাধন কর। ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে প্রকাণ্ড মহেশের যোগ। বুদ্ধির আলোক নির্ব্বাণ কর, ফুঁ দাও, অন্ধকার। অন্ধকারের ভিতর যাহা আছে, বলি, শুন। একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখ। গভীর ঘন অন্ধকার চারিদিকে, ইহার ভিতরে তুমি ক্ষুদ্রাকৃতি অত্যন্ত ছোট লৌহের ন্যায় একটি পদার্থ। শরীর নয়, তুমি, তোমার আত্মা। দেখ তাকাইয়া, তোমার বুকের ভিতরে এই যে আত্মা লৌহের মত শক্ত অর্থাৎ বস্তু পদার্থ। আরও দেখ, সমস্ত কাল, খুব কাল, পার্থিব বলিয়া, পাপদূষিত বলিয়া কাল। জীবাত্মা কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় অন্ধকারে মিশিয়াছে। ধরিলে, আপনাকে বাঁধিলে? বিশ্বাসনয়নে আরও দেখ, ঐ বস্তুর উপরিভাগে সুবর্ণ—উত্তমবর্ণ স্বর্ণ। নীচে লৌহ এবং কাল, উপরে স্বর্ণ এবং সুবর্ণ। খুব উপরে তাকাও, খুব উজ্জ্বল। এক বস্তুর দুই ভাব, —উপরে স্বর্ণ, নীচে লৌহের ন্যায় রং। দুই, না এক? এক পদার্থ। এক বস্তুর উপরে স্বর্ণ, নীচে লৌহ। চক্ষু উপরে আরোহণ করুক স্বর্ণ, চক্ষু অবতরণ করুক লৌহ। আরও আরোহণ করুক, আরও স্বর্ণের মত। ঈশ্বরের শেষ কোথায়, জীবের আরম্ভ কোথায়? উপদেষ্টা বলেন, আমি জানি না। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন কোথায়? জানেন কেবল ব্রহ্ম, জীব জানে না, জীবের নিকটে উহা সঙ্গোপন। এক মলিন অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ জীবাত্মা, সেই জীবাত্মা হইতে অল্প অল্প ঈষৎ সুবর্ণ দেখাইবে। ওহে জীবাত্মন্, তুমি কি বুঝিলে? তোমাতে ব্রহ্ম সংযুক্ত। চেতনশক্তি দেহশক্তি নীচে তোমা হইতে উৎপন্ন। সৃষ্ট আশ্রিত শক্তি কাল। এই শক্তির উপরে স্বর্ণ রং। কাল কাটীর উপরে কেন সোণার রং? জ্ঞানশক্তি দেহশক্তি নীচে কাল, কেন না, তোমার শক্তি; উপরে সোণার বর্ণ, কেন না, উহা পরমাত্মার, সমুদায় উপরে উজ্জ্বল। যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহাকে পরমাত্মা

বলি। বলপূর্ব্বক বলিতেছি, কেহ পৃথক্ করিতে পারে না। ঐ কাটীর উপরে অঙ্গুলী রাখ। বল, এতখানি লোহা, এতখানি সোণা। মনে কর, কেবল একটু লৌহশলাকা, তাহার ভিতরে কেন সোণার রং দেখিলে? মনে কর, কেবল ব্রহ্মশক্তি। ঐ শক্তির নিম্নে চলিয়া যাও, পার্থিবশক্তি মানবশক্তি। বিদ্বান্ ভক্ত সুপণ্ডিত ভাবুক সকলে বলিল, ঈশ্বরে মানবে কিরূপে মিল হইয়াছে, জানি না। ইটি প্রাচীন মত নহে। আজ যাহা শুনিতেছ, দৃঢ়রূপে ধর। তুমি যে বস্তু, তোমারই ভিতরে ব্রহ্ম। একটি ছোট লৌহদণ্ডের মত শলাকার একদিকে জরদ্ রং, একদিকে কাল। নরহরি হরিনর? হাঁ, হরিনর। পরমাত্মাতে জীব, জীবে পরমাত্মা; নীচে জীব, উপরে পরমাত্মা। নীচে চিৎ জীব, উপরে চিৎ ব্রহ্ম। উপর হইতে দেবশক্তি, নীচে আসিয়া জীবশক্তি। পিতা উপরে, পুত্র নীচে। পিতার ভিতরে পুত্র, পুত্র পিতাতে আশ্রিত। কি দেখিতেছ, সাধক, কত কাছে দেখ জীব ও পরমাত্মা। ছবি নহে, বস্তু। এই যে আমি ছিলাম, এই যে মুটোর ভিতরে ব্রহ্ম! জীব ব্রহ্ম একত্র বাস। নরের সাধ্য নাই যে, জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে। ইহা পরমাত্মারই অদ্ভুত সৃষ্টি। ভূমা, তব ইচ্ছা এতদ্রূপ। স্বতন্ত্র আকারে থাকিবার আর ইচ্ছা নাই। কি অভিপ্রায়ে, জান কেবল তুমি। হে ভূমা, তুমি একত্র আছ। এই যে শেষ ভাগ জীবাত্মা, আমি ইহা বুঝি? ঐ যে শেষ ভাগ ঈশ্বরশক্তি, আমি বুঝি, কিন্তু দুইয়ের যোগ বুঝি না। ওহে সাধক, তুমি যোগ কি দেখ। বল পুত্রের শেষ এই, পিতার শেষ ঐ। বল পাপী নরাধমের এইখানে শেষ, পুণ্যাত্মা পুরুষোত্তমের ঐখানে শেষ। যদি সাধ্য থাকে বল, আমি দেখিলাম, যোগস্থলে এই পর্য্যন্ত লৌহ, এই পর্য্যন্ত স্বর্ণ। যোগশাস্ত্র মিথ্যা হইবে, যদি বিযুক্ত করিতে পার। আমি এই সভ্যতার

সময়ে বলি, যে বলিল জীবাত্মা আছে, সেই বলিল পরমাত্মা আছে। এইজন্ত নাস্তিকতা অসম্ভব। হরিলীলা শুন। পরমাত্মা স্বর্গে আপনাকে রাখিলেন, পৃথিবীতে মানুষকে রাখিলেন, মধ্যে যোগ করিয়া দিলেন। এই যোগ বুঝা যায় না, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝ। সাধক, উষা—প্রাতঃকাল কখন হয়? বল, এই মিনিটে রাত্রির শেষ, এই মিনিটে দিবারম্ভ। বলিতে পারি না। এমনি নিগূঢ় ভাবে দিবস রজনীতে প্রবিষ্ট যে, কেহ বলিতে পারে না। কখন রাত্রি শেষ হয় জান? চারিটার সময় গাত্রোত্থান কর, দেখ গভীর রজনীতে আস্তে আস্তে অন্ধকার তরল হইতেছে; কিঞ্চিৎ আলোক প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে দেখিতে আরও আলোক। দ্বিপ্রহর দিবা ও দ্বিপ্রহর রজনী তুমি জান, কিন্তু দিবা ও রজনীর সন্ধিস্থল তুমি জান না। পূর্ণ ব্রহ্ম এবং পূর্ণ জীব তুমি জান; যোগ, পিতা পুত্রের মিলন, স্বর্গ পৃথিবীর ঐক্য তুমি জান না। ইন্দ্রধনুর অনেক বর্ণ, কিন্তু বর্ণের সন্ধি কেহ জানে না। দুই বর্ণের সম্মিলন স্থান কে বলিতে পারে? সকল বিষয়ের যোগ অতি গভীর, উহা গভীর বুদ্ধিকেও পরীক্ষা করে। দুই বস্তু বিভিন্ন, সকলেই জানে দুই পৃথক্; কিন্তু যেখানে মিলন, সেখানে কেহ পৃথক্ বুঝিতে পারে না। অতএব সাধক, তোমার যোগশিক্ষার সুযোগ হইল। যোগ আছে। সোণাকে ধরিয়া জীবের দিকে লইয়া যাইবে, লোককে সোণা করিবে, এই যোগ! স্বাভাবিক যোগের সঙ্গে সাধনসিদ্ধ যোগ। এক বস্তু যাহাকে তুমি মনুষ্য বলিতেছ, তাহারই মধ্যে ঈশ্বর এমনি ভাবে রহিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না, ঐ দিকে হরি, এই দিকে আমি। কোন্‌টি তিনি, কোন্‌টি আমি, চিনিতে পারে কে? যোগানন্দে ডুবিয়া গিয়া এরূপ হয়। এই স্থানেই ভ্রান্তিবশতঃ অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব কোথায়? সন্ধিস্থলে যোগস্থলে।

লৌহের ভিতরে যেখানে সাক্ষাৎ সোণা দেখিবে। তিনি আমাতে, আমি তাঁহাতে, এই ব্যাপারে তাঁহার না আমার কিছুই বুঝি না। এখানে একাকার, ভূমাসাগরে জলবিন্দু মিশিল। অহো যোগানন্দ কি সুমিষ্ট! হরিলীলা কি আশ্চর্য্য! লোহাতে সোণা দেখিলে। হরিতে আমার খানিক, আমাতে হরির খানিক; আমি গাছে খানিক উঠিতে উঠিতে হরি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নীচে মানুষ, উপরে ঈশ্বর, মধ্যে যোগ, বুঝে লও সাধক। মানুষ স্বতন্ত্র করে না যেন তাহা, যাহা ঈশ্বর একত্র কবিয়াছেন।

যোগের স্থান।

২রা ভাদ্র, ১৮০২ শক; ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যোগশিক্ষার্থী, কে যোগ সাধন করিবে তুমি শুনিলে; যার নিম্ন-ভাগে লৌহ, উপরি ভাগে স্বর্ণ। সে যে হউক, যোগ সাধন করিবে। গভীরতর যোগ সাধন কর, পরমাত্মাতে লীন হইবে। কে যোগ করিবে, স্থির হইল। সেই ব্যক্তি, যাহার বিচিত্র প্রকৃতি, তুমি জান না, আমি বুঝি না। এখন প্রশ্ন, কোথায় যোগ হইবে? পৃথিবীতে এমন স্থান কোথায়? হে জীব, তুমি দেখ, কোথায় চিহ্নিত স্থান? যোগাসন হস্তে ধরিয়াছ, পাতিবে কোথায়? জলে না স্থলে, পর্ব্বত-শিখরে না গহ্বরে, বৃক্ষতলে না নদীতীরে? পৃথিবী স্থান দেয় না। উচ্চ স্থান আবশ্যক। কি ভাবে উচ্চ? পরিমাণে উচ্চ? পৃথিবী নীচে, দশ হাত উপরে কাষ্ঠাসন পাতিলে যোগ হয়? জাহাজের মাস্তুলে যোগ হয়? দ্বিতীয়তল গৃহের ছাদের উপর উঠিলে যোগ হয়? এমন উচ্চ ভূমি চাই, যেখানে সংসার স্পর্শ করিতে পারে না।

সংসার হইতে উহা অনেক দূরে। যদি পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ সঙ্গে চলিল, তবে উচ্চ স্থানে গিয়া ফল কি? সেই স্থান যে আমোদ-কলুষিত। অপবিত্র আমোদের অনুচর সহচর জঘন্য দূষিত সুখের উপকরণ সেখানে। তবে কেন বৃথা কষ্ট শ্রম করিয়া এত দূর উঠিলে? এ উচ্চতা স্থানীয় উচ্চতা নহে। নিম্নদেশ হইলেই নিম্ন নয়। পাখীর আকাশেই ঘর, পাখীর গর্ত্ত মাটীর ভিতরে নহে। যোগী কখনও ভূচর নহে। ওহে সাধক, কি ভাবিতেছ, অণ্ড ফুটিয়াছে? তোমার আমার ভিতর হইতে পাখী বাহির হইয়াছে? সনাতন ধর্ম্ম নববিধান এতদিন উত্তাপ দিল। ভিতরের পাখী বাহির হইতেছে। সাবধান, এ সময়ে যোগী পক্ষীর জন্ম হইতেছে। যোগপরায়ণ ক্ষুদ্র হৃদয় বাহির হইল। করিবে কি? উড়িব। উচ্চ রাজপ্রাসাদে যদি রাখি, বড় গাছের উপরে যদি রাখি? কোথায় থাকিবে, যোগপক্ষী, বল। আহা তোমার কি সুপক্ষ! তোমার গায়ে কি পরিপাটী রঙ্গের সংযোগ। তুমি ঝট্ পট্ করিতে করিতে উড়িলে। পাখী যে উড়িবেই উড়িবে, উড়িবে, আকাশে যাইবে। তবে যে পাখীর শরীর আছে? শরীর পাখী নহে। স্থূল শরীর যদি পাখীকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে? যোগী পক্ষী যখন উড়িবে, তখন শরীর অনুকূল হইবে। সাঁতার যে না জানে, তাহার গুরু শরীর মগ্ন হয়, সন্তরণসিদ্ধের দেহ লঘু হয়। যে জীব আকাশে বিচরণ করিতে সিদ্ধ হয় নাই, সে ভূতলে পড়িবে। জন্মসিদ্ধ যোগপক্ষী উড়িতে শিখিয়াছে। শরীরও লঘু হয়, সাক্ষী সন্তরণ, সাক্ষ্য উড্ডীন হওয়া। যখন ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়, এই শরীর সহায় হয়। দেহ আছে কি না, যোগী বুঝিতে পারেন না। দুই মণ প্রস্তর পাখীর গলায় ঝুলিতেছে, কিন্তু পাখীর জোর এত অধিক যে, নীচে নামাইতে পারিল না। খেচর হইয়া জন্মিল যে, উড্ডীয়মান

হওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ। পাখীর স্বাভাবিক গতি উর্দ্ধে। অর্থ শুন। যোগশিক্ষার্থী, এ সকল নিরর্থক। যদি যোগ শিখিবে, পৃথিবীকে ক্ষুদ্র দেখিতে হইবে। তুমি জঙ্গলে যাইবে, আমি নিষেধ করিতেছি। জঙ্গলের নিকটেই তো তোমার বাড়ী। ঠিক শুনিতে পাইলে, যেন ছেলে কাঁদিতেছে। বিপদ প্রলোভন নিকটে যার, যোগসাধন হয় না তার। মনের নৈকট্যই নৈকট্য। শারীরিক নৈকট্য নৈকট্য নহে। সংসারকে দূরে এবং ছোট মনে করিতে হইবে। যদি বল, সংসার কি বড় সামগ্রী! তবে যোগ হইবে না। এমন স্থানে বসিতে হইবে, যেখানে সংসারের যাবতীয় বস্তু ছোট মনে হইবে। সমস্ত পৃথিবীকে ছোট দেখিবে। সমস্ত পৃথিবীকে এক সর্ষপকণার ন্যায় দেখিবে। কোথাকার পৃথিবী? সামান্য ধূলিকণা! সেইখানে আসন পাত, যেখানে পৃথিবীকে নিকট ও বড় মনে হইবে না। পৃথিবী এত দূরে, এত হীন ও অসার বস্তু যে, সে প্রাণকে কখন টানিতে পারিবে না। যোগপক্ষী ক্রমশঃ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আকাশে উঠে। হে আত্মন্, তদুপরি বসিবে। সেখানে বসিয়া একবার নীচে তাকাইবে, দেখিবে পৃথিবী সর্ষপকণা। আমার ধন মান দাস দাসী কোথায়? পৃথিবী যখন এরূপ হইয়া গেল, ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইবে, দেখিবে আর পৃথিবী নাই। ৭ম আকাশের উপরে উড্ডীয়মান হইয়া চলিতে লাগিল, এখন মহাকাশে চলিতে লাগিল—মহাকাশ, চিদাকাশ, ঘনাকাশ। চারিদিকে সাধুমণ্ডলী। এখানে কোন পার্থিব শব্দ শুনা যায় না, পার্থিব বস্তু দেখা যায় না। আকাশ বাড়ী, আকাশ বস্ত্র, বৃষ্টি পড়িবে না, আকাশ ছাদ আছে, আকাশ প্রাচীর আছে, চারিদিক্ হইতে বিঘ্ন আসিতে পারিবে না। হে আকাশ, তোমাকে আলিঙ্গন করি। দেখ, হে পরমবন্ধু আকাশ, যোগভঙ্গ যেন কেহ না করে। আকাশে

না বসিলে যোগ হয় না। মহাকাশে যখন বসিলাম, সংসার খসিয়া পড়িল; বিষয়লালসা বিলুপ্ত হইল। আকাশ যেমন অসীম, আমাদের শক্তি বল অসীমের সঙ্গে মিশিল। আমার মনে ধন উপার্জ্জন করিবে। যতক্ষণ যোগ হইবে না, ততক্ষণ আকাশের সঙ্গে যোগ চাই। এই যোগ স্থানের যোগ। এখন কোন্ স্থানে? আকাশে। সংসার খুব ছোট দেখাইতেছে, ক্রমে আর দেখা যাইতেছে না। পাখী খুব উড়িয়াছে, ব্রহ্মসূর্য্যের তেজ পড়িয়াছে। ব্রহ্মচন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—পাখীর উপরে। যোগী, তুমি আকাশে থাক। সুন্দর পক্ষী, নিরবলম্ব যোগপক্ষী, তোমায় আমি নমস্কার করি, যেন সকল নরনারী সংসার ছাড়িয়া ঐ মহাকাশে গিয়া বসে। আসক্তি প্রবৃত্তি কিরূপে আসিবে? সেখানে প্রলোভন বিভীষিকা নাই। মৃত্যুর অতীত স্থান আকাশ। আকাশের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। মন পাখী, তুমি ঐ স্থানে যাও। কুবাসনার পিঞ্জর ভাঙ্গ। যত পাখী এই ঘরে আছ, উড়। সমস্ত পাখীব দল উড়িল। ঐ যায়, ঐ গেল। অল্প দেখা যায়, পাখী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত। যখন যোগী হইবে, মানুষ জানিবে না তোমার নাম ধাম। তোমার রাজ্যে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে যাইবে না। তবে আকাশে বসিতে শিক্ষা কর, পৃথিবীর মাটীতে পা রাখিতে নাই। যে পৃথিবীতে পা রাখিল, তাহার উপরে অভিসম্পাত আছে। সে যোগ সাধন করিতে পারে না। পৃথিবীকে ছুঁইবে না, দুর্গন্ধ পৃথিবীর বায়ু নাসিকা গ্রহণ করিবে না। অতএব আকাশে যাও, পৃথিবী স্পর্শমাত্র মনের কুপ্রবৃত্তি আসিবে। পৃথিবীর বিষয় দর্শনে শ্রবণে বিকার হইবে। আকাশে যাইবার জন্য বিমান আসিয়াছে। মহেশ্বরের নিকট রথ প্রার্থনা কর, আকাশমার্গে ভ্রমণ কর। পৃথিবীর নিকটে বিদায় লইবে। পৃথিবী, তুমি

যোগসাধনে প্রতিকূল। একাগ্রতা সারথি হইয়া তোমার রথ আকাশে লইয়া যাইবে। যখন ঋষি কল্যাণরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, তথায় মানুষ পক্ষী অথবা দ্বিজাত্মা হইল। কিরূপ রথ? যাহা আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যায়। সেই দিনের প্রতীক্ষা কর, যে দিন মনের আনন্দে আকাশে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান-যোগ করিতে পারিবে। এক এক যোগী বসিয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করুন।

যোগের সময়।

৩রা ভাদ্র, ১৮০২ শক; ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী সাধক, মনঃসংযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যোগতত্ত্ব সারতত্ত্ব, জীবের পক্ষে হিতকর মোক্ষপথ, আরামের হেতু, বিশুদ্ধির উপায়। পাত্র, দেশ, কাল। প্রথমে পাত্র স্থির হইল, কে যোগসাধন করিবে। দ্বিতীয়, স্থান স্থির হইল। তৃতীয়, কখন কোন্ সময়ে যোগ সাধন করিবে, স্থির করিতে হইবে। বিশ্বমধ্যে বিবিধ স্থান আছে, সাধক, সে সকল মনোনীত করিও না, আকাশে একমাত্র স্থান। কিন্তু এই আকাশপ্রদেশে বসিবে কখন? সকল স্থান যদি অনুকূল না হয়, সকল সময়ও অনুকূল নহে। একটি বিশেষ স্থান যেমন আবশ্যক, একটি বিশেষ সময় নিরূপণ করাও তেমনি আবশ্যক। কাল নিরূপণ হইলে দেশ, কাল, পাত্র সকলই স্থির হইল। কোন্ কাল তোমার ভাল লাগে? কোন্ সময় তোমার পক্ষে অনুকূল? পাখা বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িবে। উড়িবে সঙ্কল্প করিলে, সময় পাইলে না। উড়িবার সময় না প্রাতঃকাল, না মধ্যাহ্ন, না অপরাহ্ণ। পাখী উড়িবার জন্য উন্মুখ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিল, সংসারীকে আদেশ

করিল, কর্ম্ম কর, পরিশ্রম কর। ঘণ্টা পাখীকে উপদেশ দিল না, পাখীর সম্পর্কে ঘড়ী বাজিল না। দিন বাড়িল, দিন কমিল, পাখী বলিল, আমাকে ডাকে না কেন? সংসারী সঙ্কেত বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গেল, আসিল। তাহাদের পরিশ্রম বিশ্রামের সময় হইল। যখন দিবস, যোগীর রাত্রি। পৃথিবী ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। ১২ ঘণ্টা ঢং ঢং বাজিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী নাচিল। ঘড়ী বাজে ঢং ঢং, বিষয়ীর টাকা বাজে টং টং। যোগী জানিল না, কর্ণপাত করিল না। যখন সূর্য্য চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, যোগীকে সংবাদ দিও, আমি চলিলাম; অন্ধকার না হইলে যোগী জাগিবে না। যোগী জাগিবে নিশীথে। যখন বিষয়ী আপনার তানপুরা ছাড়িল, যোগী আপনার তানপুরা ধরিল। যখন সংসারীদিগের রথ আরোহীদিগকে সংসারে নামাইয়া দিল, তখন যোগীদিগের রথ নামিল। এখন আকাশে উড়িবে ঘোড়া। যখন বিষয়ীর প্রদীপ নিবিল, যোগীর প্রদীপ জ্বলিল, তখন যোগ-জীবন আরম্ভ হইল। এখন সন্ধ্যা। যোগীর নিকট যখন ঘোর যামিনী সমুদায় বস্তু কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিল, তখন যোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, ভালরূপে জাগিলেন। এক হুঙ্কার। অন্ধকার যতক্ষণ না আসিবে, ততক্ষণ যোগীর ভাল লাগিল না। চক্ষু খুলিয়া বিনশ্বর বস্তু দেখিবে? কিছু নাই যখন, তখন তাঁর আনন্দ। তাঁর বন্ধুর হাতে চাবি। যখন তখন খুলিতে পার না। তাঁহার বন্ধুর নাম কি? অন্ধকার। যোগীর সহায় সহচর অন্ধকার। যোগী দ্বারে গালে হস্ত দিয়া বসিয়া আছেন, কখন আসিবে অন্ধকার। কেমন অন্ধকার? স্বয়ং অন্ধকার, আভাস নহে। 'অন্ধকার আসিয়া সমুদায় ঢাকিবে যখন, তখন যোগীর সময়। ঈশ্বর অন্ধকারের হাতে চাবি দিলেন কেন? বাহিরের চক্ষু যতক্ষণ দেখিবে, মনের চক্ষু খুলিবে

না। এই চক্ষু বন্ধ কর, ঐ চক্ষু খুলিবে। দুই চক্ষু এক সময়ে খোলা থাকে না। জীবের জীবন কি অশ্চর্য্য ফল!! যোগ-ধর্ম্মের চাবি তাহার হস্তে আসিবে না? দিবসে কি যোগ হয় না? রজনীর অন্ধকার না হইলে হইবে না? যোগের সমস্ত প্রস্তুত, তোমার চক্ষু দেখিল সংসার পরিবার ধন মান। ধর্ম্ম কীর্ত্তি যদি দেখে, তথাপি নয়। পরহিতের জন্য যে সকল কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা স্মরণে আসিলেও নয়। কোন জড় যদি চক্ষুকে আকর্ষণ করে, যোগেশ্বর তোমার যোগচক্ষু আকর্ষণ করিবেন না। ফুঁ দিয়া সমুদায় প্রদীপ নিবাও। সমুদায় নির্ব্বাণ কর। নির্ব্বাণ হইল। অন্যে দেখুক, তোমার সম্বন্ধে সব নিবিল। তোমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ কর। কিছুতে মন আকৃষ্ট হয় না, তখন দেশ কাল মিলিল। যেমন আকাশ তোমার আসন, অন্ধকার তোমার কাল। কাল তোমার কাল। আকাশ তোমার আবাস। ঘোর রজনীতে যোগ-সিঁড়ী দিয়া জীব আকাশে উঠিবে। হস্ত প্রসারণ কর, বস্তু নাই। কালতে কাল মিশিল। লৌহ কাল, আকাশ কাল, অন্ধকার কাল। বিজ্ঞানবিহীন লোক বলে, দিবসে তারা দেখা যায় না। মূঢ় জীব, তুমি কেমন করিয়া দেখিবে তাঁহাকে, অন্ধকার ভিন্ন যাঁহার প্রকাশ নাই? কোটী কোটী তারা, তারাভরা আকাশ, সূর্য্য তারাদিগকে ঢাকিল। যার নাম প্রকাশ, সে করিল অপ্রকাশ। সূর্য্যগ্রহণ হউক, তারা দেখিবে। সূর্য্য লুপ্ত হউক, তারামালা দেখা দিবে। যতক্ষণ প্রকাণ্ড মশাল জ্বলিতেছিল, তারাদল দেখা যায় নাই। পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দিতেছি। পৃথিবী বলি-তেছেন, আমি যতক্ষণ প্রকাশ, স্বর্গ ততক্ষণ অপ্রকাশ। আমি যখন অপ্রকাশ, নভোমণ্ডল প্রকাশ। পৃথিবী, তুমি তোমার বিকৃত মুখ ঢাক, স্বর্গের মুখ প্রকাশ হইবে। পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়িবে, যোগের

পৃথিবী প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মজ্যোতি যোগীদিগের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে। সংসারের সমস্ত বন্ধ হইল, বাহিরের দোকান বন্ধ হইল, ভিতরের সহস্রাধিক চক্ষু প্রকাশিত হইল। দুইজন আসিলেন বড় বড় ঝাঁটা লইয়া। এই অনন্ত ঘন আকাশ, আর এক অন্ধকার ঝাঁটা দিয়া সমুদায় বস্তু ফেলিয়া দিলেন। তোমার বন্ধু অন্ধকার। কোন্ অন্ধকার, যে অন্ধকারকে বিষয়ী ভয় করে, যে অন্ধকারে চোরে চুরি করে, যে অন্ধকারে কত পাপী পাপ করে, যে অন্ধকার যন্ত্রণা, যে অন্ধকারে পড়িলে মানব আপনাকে অসহায় মনে করে, যে অন্ধকারে মানব নিদ্রাভিভূত হয়, যে অন্ধকার এক অনুকরণ যমালয়ে লইয়া যাইবার, সেই অন্ধকার তোমার বন্ধু। যে অন্ধকারকে মানব ঘৃণা করে, ভয় করে, সেই অন্ধকারকে তুমি অভ্যর্থনা করিবে। সংসারী প্রদীপ জ্বালিল, তুমি প্রদীপ নিবাইলে। সংসারী চক্ষু খোলে পাছে বিপদ হয় বলিয়া, তুমি চক্ষু বন্ধ করিবে। চক্ষু বন্ধ করা, যোগছাত্র, তোমার পক্ষে আবশ্যক। কিঞ্চিৎ আলোক যদি দেখিতে পাও, সেখানে হইবে না। অনুকূল সময় অন্ধকার। ভগবানের সঙ্গে দেখা করিবার, যোগীদের সঙ্গে পরিচয় করিবার সময় অন্ধকার। অতএব অন্ধকারকে অবহেলা করিও না। যাই ঘর অন্ধকার হইল, ঐ আমার বন্ধু স্বর্গের চাবি লইয়া ডাকিতেছেন। চুপি চুপি অন্ধকার মানুষকে ডাকেন। নিঃশব্দে ঘোর অন্ধকার* আসিলেন, অত্যন্ত আস্তে আস্তে ডাকিতেছেন, যোগেশ্বরপুত্র, উত্থিত হও, আকাশে যাইবার রথ প্রস্তুত। যোগপুত্র, পবিত্র নিমন্ত্রণে আহূত। ভয়ানক অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, যোগী জাগিয়া দেখিলেন, জননী সেখানে। সুপ্তোত্থিত যোগী আস্তে আস্তে উঠিয়া গহনবনের দিকে চলিলেন। তোমার মন-ধ্রুব কোথায় যাইবে? আকাশকাননে।

রাত্রিতে বিদায় লইবে। লোকে দেখিবে যে, তুমি যোগী হও নাই। তোমার গতি রাত্রিতে। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে, লোক তাই দেখিল; কখন যোগ করিলে, দেখিতে পাইল না। এইরূপ কপট ভাবে যোগ সাধন কর। তোমার যোগ বাড়িবে, অন্যে জানিবে কি? গভীর নিশীথ সময় ঘোরান্ধকার মধ্যে বসিয়া আছ। দেশ কাল পাত্রের মিলন হইল। যোগেশ্বর যোগেশ্বরী দেখা দিলেন। যোগেশ্বরের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, কাল মেঘের চারিদিকে সূর্য্যরশ্মি যেমন। ক্রমে এই রশ্মি বাড়িবে। অন্ধকার যখন জ্যোতি খাবে—চাঁদ গিলিবে, আরম্ভ কর। কেবল অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মধ্যান কর, প্রকাণ্ড কালবস্ত্রে জ্যোতির পাড় দেখিতে পাইবে। তুমি অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া চাঁদকে হাতে লইয়া বাহির হইলে। ভগবান্‌চন্দ্র অন্ধকারের ভিতর প্রকাশিত। যখন যোগনয়নে যোগেশচন্দ্রকে দেখিবে, আর কি সংসারে ফিরিবে? রূপমাধুর্য্য পান কর, একেবারে মুগ্ধ হইবে। এই উৎকৃষ্ট যোগপথ কিছুতেই ছাড়িবে না।

নির্ব্বাণ।

৪ঠা ভাদ্র, ১৮০২ শক; ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি যে যোগধন লাভ করিবে, তাহার উপায় কি? কোন্ পথে গেলে যোগরত্ন পাইবে? উদ্দেশ্য তোমার যোগ, উপায় তোমার নির্ব্বাণ। পরপারে যোগ, এ পারে সংসার, মধ্যে নির্ব্বাণসমুদ্র। ঐ যোগের আশ্চর্য্য মনোহর অট্টালিকা, এখান হইতে যাত্রা আরম্ভ; নিবৃত্তির বিস্তীর্ণ মাঠ মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

নিবৃত্তির মাঠ অতিক্রম না করিলে যোগধামে উপস্থিত হইতে পারিবে না। যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সংসারে নিবৃত্ত হইতে হইবে। যোগগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বর্ত্তমান গৃহ ভাঙ্গিতে হইবে। যদি যোগবস্ত্র পরিধান করিতে চাও, তবে পৃথিবীর ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি যোগের অন্ন খাইতে চাও, এখানকার অন্ন ত্যাগ কর। যোগজীবন যদি চাও, অস্থি মাংসের জীবন পরিত্যাগ কর। বিয়োগ প্রথমে, যোগ পরে। মৃত্যু আগে, দ্বিতীয় জীবন পরে। তোমার এক জীবন আছে, এই জীবন থাকিতে তুমি অন্য জীবন পাইতে পার না। নীচ সংসারীর জীবন থাকিতে কিরূপে তুমি স্বর্গীয় জীবন পাইবে? এ পারে থাকিলে ওপার দেখিতে পাইবে না। অতএব এই পৃথিবীর নীচ সুখভোগের জীবন পরিত্যাগ কর, নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন কর। সর্ব্বপ্রথমে নিবৃত্ত হও। সকল প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। আসক্তি, কাম, ক্রোধ, কার্য্য, চিন্তা এ সমুদায় হইতে নিবৃত্ত হও, সংসার হইতে মনের সমস্ত অনুরাগ স্নেহকে নিবৃত্ত কর। যখনই কোন সংসারকামনা অথবা সংসারচিন্তা আসিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিবে। প্রিয় অপ্রিয়, মনে কাহাকেও স্থান দিবে না। উপেক্ষার পথ মধ্যবর্ত্তী। নিরপেক্ষ হওয়া চাই। কোন দিকে আসক্ত থাকিবে না। সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অবলম্বন করিবে। শান্ত নিস্তব্ধ ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে। যিনি চুপ করিয়া থাকেন, তিনি অনেক কার্য্য করেন। রাগ আসিবে না, সুতরাং ক্ষমাও আসিবে না। ধনী হইবে না, আপনাকে নির্ধনও মনে করিবে না। সুখ দুঃখ মান অপমান কোন জ্ঞান থাকিবে না। সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ, আংশিক নহে। একেবারে মনকে খালি করিয়া ফেলিবে। হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি এই যোগ অভ্যাস কর। কে তুমি? কোথায়

তোমার যোগাসন? কখন তুমি যোগ করিবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর তুমি পাইয়াছ। এখন যোগের উপায় কি? ভালরূপে এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। যোগের উপায় নির্ব্বাণ। যদ্দ্বারা মনকে একেবারে নিশ্চিন্ত এবং নির্ভাবনাযুক্ত করা যায়, তাহাই নির্ব্বাণ। তুমি সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মের আড়ম্বর ভাবিতে পার, ধর্ম্মের সহস্র বাহ্যিক ব্যাপার তোমার মনকে পরিশ্রমী করিতে পারে; কিন্তু যদি নির্ব্বাণ চাও, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সাধুতা, অসাধুতা কিছুই ভাবিতে পারিবে না। নির্ব্বাণে নিজের কোন ভাবনা থাকিবে না। একেবারে ঘটটি খালি না করিলে পূর্ণ নির্ব্বাণ হয় না। মনের ভিতর হইতে সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। সেখানে সহস্র প্রকার অগ্নি জ্বলিতেছে। নির্ব্বাণ-জল ঢালিয়া সমস্ত নির্ব্বাণ কর। কাম ক্রোধাদি সমুদায় অগ্নির মাথায় নির্ব্বাণসমুদ্রের জল ঢালিবে। নির্ব্বাণের অবস্থায় মনের চিন্তা ভাবনা আসক্তি কিছুই থাকে না। মনের যন্ত্রগুলিও নিষ্ক্রিয় এবং অহং পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, একেবারে শূন্য ঘর। সংসার নানা প্রকার প্রলোভন লইয়া ডাকিল, "ওহে অমুক", সংসারের চীৎকার খালি ঘরের প্রাচীর আঘাত করিল, প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল; কিন্তু 'আমি' বলিয়া কেহ আর উত্তর দিল না। হে সাধক, তোমার এই নির্ব্বাণের অবস্থা চাই; কিন্তু নির্ব্বাণ তোমার উদ্দেশ্য নহে, নির্ব্বাণ যোগপথের উপায়। নির্ব্বাণ—রাজা সম্মুখে চলিল, গ্রাহ্য নাই; প্রজা চলিল, গ্রাহ্য নাই। মনের ভিতরে মান অপমান কিছুই থাকিবে না। সমুদায় ঘটটিকে উপুড় করিয়া সমস্ত বাহির করিয়া দিবে, মনের ঘটটিকে এমনই শূন্য করিবে যে, তাহাতে একটি পিন্ পড়িলে ঠং করিয়া শব্দ হইবে। এইরূপে মনকে একেবারে খালি করিয়া, শান্ত সমাহিত ভাবে ঘোরান্ধকার

মধ্যে নিবৃত্তি সাধন কর। এক মিনিট অন্ততঃ সাধন কর দেখি। শূন্য মন কি তাহা ভাব, পূর্ণ মন ভাবিও না। জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন জীব ভাব। প্রতিজ্ঞা কর, কোন ভাবনাকে মনে আসিতে দিব না। যথার্থ বৌদ্ধ জীবন ধারণ কর। সমস্ত নির্ব্বাণ কর, কিছুই যেন মনেতে না থাকে। শেষে আপনি থাকিবে, তাহাকেও হাত ধরিয়া বিদায় করিয়া দিবে। যে এইরূপে আপনাকেও বিদায় করিয়া দেয়, সে যোগের নিকটবর্ত্তী হয়। এই নির্ব্বাণের জল হাতে করিয়া থাক, যাই মনের মধ্যে চিন্তার অগ্নি, কিম্বা কোন প্রকার বাসনাপ্রদীপের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে, তখনই তাহা ঐ জলে শোঁ করিয়া নিবাইয়া দিবে। হে সাধক, যোগেশ্বর সমক্ষে, মধ্যে এই নির্ব্বাণরূপ প্রকাণ্ড সাগর; এই সাগরে একবার ডুব দাও, সমস্ত আগুন নিবিয়া যাইবে, শীতল হইবে। এই জলে ডুবিয়া শীতল হইলে, অনায়াসে পরলোকে যাইবে। মধ্যের পথটি নির্ব্বাণ, ফকিরী, আত্মবিসর্জ্জন, আমিত্বের বিনাশ। যদি 'ঈশ্বর আছেন' যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তবে 'আমি নাই' ইহা সিদ্ধান্ত কর। জীবাত্মার বিয়োগ, পরমাত্মার আবির্ভাব। আমি না গেলে, হরি, তুমি আসিবে না। অতএব শীঘ্র শীঘ্র আমাকে তাড়াও। বলে পার, কৌশলে পার, 'আমি' শত্রুকে নির্ব্বাসন কর। 'আমি' গেলে আর পাপ প্রলোভনের সম্ভাবনা থাকিবে না। কেন না, প্রলোভন যাহাকে আকর্ষণ করিবে, সে নাই। আমিরূপ মূল কাট। সমুদায় পাপের মূল 'আমি' যদি থাকে, এই অহং আগুন ফোঁশ ফোঁশ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অতএব মূল কাটিয়া ফেল। এই গৌতমের জীবন, এই শান্তি, এই নির্ব্বাণ, এই পূর্ণ নিবৃত্তি। যে আমি মনে করে, আমি যোগ সাধন করি, সেই আমি সমূলে নিপাত হইল। অর্থাৎ অহঙ্কারের নিপাত হইলে যথার্থ যোগপথে যাইতে পারিবে। যদি

'আমি' না মরিয়া থাকে, তবে যোগপথে দ্রুতগামী হইও না। যদি তুমি মনে কর, তুমি ভাব, অথবা তুমি ভাব না, তাহা হইলে যোগের পথ বন্ধ হইবে। আমি ভাবি, তাহা নহে; আমি ভাবি না, তাহাও নহে। কিছুতে অহঙ্কার হইবে না। যোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, যখন আমি দেখা দেয়। যোগের চক্ষু কড়্ কড়্ করে আমাকে দেখিবে। ঐ সর্ব্বনাশের আমি পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তাপথের বহির্ভূত করিতে হইবে। যতক্ষণ আমি থাকে, ততক্ষণ দেখি, আমার দেহের মধ্যে নানাপ্রকার দীপমালা জ্বলিতেছে। যখন আমির মৃত্যু হইল, তখন সমুদায় প্রদীপ নিবিল এবং দেহস্বামীর সমাধি, তিরোভাব হইল। এই কত ক্রিয়াকলাপ চলিতেছিল, কত অহঙ্কারে আগুন জ্বলিতেছিল, এই সমস্ত নির্ব্বাণ হইল। পশু মরিল, আমি মরিল, নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা হইল। আমাকে আর দেখা যায় না। সমুদায় প্রবৃত্তির প্রদীপ নিবিল, আমি শুদ্ধ নিবিল। মৃত আমির ঘোর অন্ধকার এবং আকাশের অন্ধকার মিলিয়া ভয়ানক অন্ধকার হইল। অন্ধকার মধ্যে কে? উত্তর নাই। একাকী কেহ আছে? প্রকাণ্ড আকাশ-মাঠের মধ্যে কে তুমি? কে, কে, কে তুমি? শব্দেতে বরং আকাশ পৃথিবী নড়ে; কিন্তু মৃত হইয়াছে যে সাধক, সে কথা কহে না। সাধকের মস্তকের উপর পাথর ভাঙ্গ, প্রাণের প্রকাশ নাই। গৌতম প্রস্তর, নির্ব্বাণ জল। যোগশিক্ষার্থী, যদি যোগী হইতে চাও, এই অবস্থাতে আসিতে হইবে; তুমি যত কেন সাধু হও না, মহাদেবের সঙ্গে যোগ করিতে চাহিলে এই আমিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। লোকে বলে, নিশ্বাস অবরোধ করিলে যোগ হয়। কার নিশ্বাস? ভ্রান্তি, মানুষ নাই, নিশ্বাস কোথায়? যতক্ষণ নিশ্বাস, ততক্ষণ যোগ ধ্যানে নাহি বিশ্বাস। প্রাণ নাই, নিশ্বাস ফেলিবে

কে? যোগীর পক্ষে আত্মহত্যা পাপ নহে, অন্যত্র আত্মহত্যা মহা-পাপ। যেখানে অহং অথবা অহঙ্কারের বিনাশ, সেখানে আত্মহত্যা পুণ্য। উদাসীন হইয়া সন্ন্যাস অস্ত্রে এই অহংকে খণ্ড খণ্ড কর। সমুদায় সামগ্রী এবং সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ কর, বিবস্ত্র শূন্য অহং রহিল; এবার এইটিকে এক কোপে কাট, এই মূল অগ্নি নির্ব্বাণ কর। আমি আর নাই। বাড়ী হইল শূন্য, এবার হইবে পূর্ণ। মন হল সর্ব্বত্যাগী, এবার সকলই পাইবে। দিন দিন নিবৃত্তি সাধন কর। এমন অভ্যাস করিবে যে, আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না। ভাবনা ইহার ঔষধ ভেব না। ভাবনাকে না করিয়া না সাধন, হাঁ সাধন হয়। কেবল ঔদাসীন্য, কেবল নিবৃত্তি, নেতি নেতি। না-সমুদ্রে ভাসা। আপনাতে ও প্রকাণ্ড না-রূপ অন্ধকার মধ্যে না-রূপ জীবন ধর, না-মন্ত্র উচ্চারণ কর, না-বিধি সাধন কর। আকাশ বলুক—না, জীবনের রক্ত বলুক—না, অবশেষে পরপারে গিয়া যোগরাজ্যে, শান্তিরাজ্যে উপনীত হইবে। হে মহানির্ব্বাণ, আত্মহত্যার মন্ত্র সাধন করিতে শিক্ষা দেও, না-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও। না-তরী, নিবৃত্তির তরীতে আমাদিগকে তোল। প্রশান্ত (Pacific) মহাসাগরে অথবা অ্যাট্লাণ্টিক (Atlantic) মহাসাগরে কিবা ঝড় হয়, রক্ত-নদীতে যে প্রবৃত্তির তুফান লাগিয়াছে, তাহার আর তুলনা নাই। এই জন্য, হে ভবকাণ্ডারী, হে নিবৃত্তি, হে অনন্ত নির্ব্বাণ, হে পরম বৈরাগী, হে পরমহংসের উদাসীন হরি, তোমাকে বারংবার ডাকিতেছি, হরি, তুমি যে বলিতেছ—না, না। তোমার করুণা ভিন্ন, হে ঠাকুর, এই প্রবৃত্তিসাগর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না। পতিতপাবন, এস তবে। যে মনে করে, আমি আমার প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিব, সে কখনও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না।

ঐ যে সর্ব্বনাশের 'আমি' শত্রু রহিল। হে মোক্ষদায়িনী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নিবৃত্তির সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হই। শান্তিঃ॥

প্রবৃত্তি-যোগ।

৫ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ২০শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে যোগশিক্ষার্থী, মহাদেব যোগশিক্ষা দেন। মহাদেবের শিষ্য হইবে, তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবে। অখণ্ড পথ তোমার সম্মুখে। যোগের সাধন পরিমিত হইতে পারে না, যোগের গতি সমাপ্ত হইতে পারে না। এইজন্য, হে সাধক, সিদ্ধান্ত করিয়া লও, নিবৃত্তি শেষ গতি হইতে পারে না। না—পথ হইতে পারে, লক্ষ্য কিন্তু হাঁ। অস্বীকার উপায়, স্বীকার উদ্দেশ্য। পরিবর্জ্জন সাধন, প্রাপ্তি সিদ্ধি। ত্যাগ উপায়, লাভ পরম লক্ষ্য। নিবৃত্তিতে থাকিবে না, যদি যথার্থ যোগী হইতে চাও। নিবৃত্তি শাস্ত্রী, প্রবৃত্তি শাস্ত্রীর অনুগত। যথার্থ নিবৃত্তি যথার্থ প্রবৃত্তির পথ পরিষ্কার করে। শরীরের প্রবৃত্তি হইতে আত্মার প্রবৃত্তিতে যাওয়ার মধ্যপথ নিবৃত্তি। একবার রথ চলিবে, রথ তারপর থামিবে, পরে রথ বিপরীত দিকে গমন করিবে। নির্ব্বাণ, বাসনাবর্জ্জন, কামনার সমাপ্তি, তৃতীয় নূতন দিকে গতি। (১) গতি, (২) গতিরোধ, (৩) গতি। বাসনা, মরণ, নবজীবন। চণ্ডাল, মৃত্যু, দ্বিজ। বন্ধন, ছেদন, নূতন বন্ধন। সাধক, যোগার্থ কি? বন্ধন, না বন্ধন-শৈথিল্য? যোগের অর্থ একীভূত হওয়া। আবদ্ধ ভাবিলে বন্ধনের ভাব আইসে। মুক্ত হওয়া মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির উপরে, নিবৃত্তি-মার্গে গম্যস্থান নহে; কিন্তু নিবৃত্তি না হইলে, প্রবৃত্তি হয় না। এ মানুষ না মরিলে, নূতন মানুষের জন্ম হয় না। অতএব চক্ষু বন্ধ

করিয়া দেখ, কোন প্রবৃত্তি আছে কি না, একেবারে জীবনাবশেষ হইয়াছে কি না। নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য কি তোমায় অধিকার করিয়াছে? সংসার, স্বর্গ, কিছুরই ভাবনা নাই। যদি দেখিয়া থাক, নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য ভাব আসিয়াছে, তবে বুঝিতে পারিবে, যে কণ্টক তোমাকে কাল বিদ্ধ করিয়াছিল, আজ সে কণ্টকের উপরিভাগে সুকোমল গোলাপ ফুল!! সংসার-প্রবৃত্তির উজান স্রোতে তুমি চলিলে, রাগ হবেই না, লোভ হবে না। সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইবে। এ ভাবি না, ও ভাবি না; কিছুই নাই, তুমি একেবারে মনুষ্যত্ববিহীন আত্মা, এমন স্থানে আসিয়াছ। বিপরীত দিকে নৌকা লইয়া গেলে, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ। গঙ্গা অতিক্রম করিয়া নৌকা সাগরে পড়িয়াছে, এক প্রকাণ্ড অনন্ত একটু একটু করিয়া নৌকা টানিয়া, যেখানে বায়ু নাই, সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, কিছুই নাই, নিস্তব্ধ—শব্দ নাই, রূপ রস গন্ধ নাই, এমন স্থানে ভাবী যোগীর নৌকা আনিল। এক বিন্দু বায়ু নাই। ঘোরতর সন্ন্যাস। ইচ্ছাবিহীন মানুষ, জমাট আত্মসংযমের ভিতর যোগী বসিয়া আছে। এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল যোগীর জীবনে। এখন যোগরাজ্য আরম্ভ হইল, অর্দ্ধেক ব্যাপার সমাপ্ত হইল। কল্ কল্ করিতেছে জল, ভয়ানক স্রোতের মুখে নৌকাখানি পড়িল, নৌকা চলিল আবার; শান্ত নৌকা আবার চলিল। এবার চলিল না, চালিত হইল। এখন জীব কেবল চুপ করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিল। প্রবৃত্তির গভীর স্রোত টানিতেছে—প্রেমের রূপ, জ্ঞানের রূপ, শক্তির রূপ টানিতেছে। ঘোরান্ধকারে যোগী পড়িয়াছিল, প্রবৃত্তি দেখিল আমার সময় আসিয়াছে, তখনি নৌকা ধরিল। হে যোগশিক্ষার্থী, যদি সেই নির্ব্বাণের অবস্থায় আসিয়া থাক, ব্রহ্মের আকর্ষণ কেশাকর্ষণ করিবে। এখানে যোগ সাধন নহে,

যোগ ভোগ। যখন ঘট খালি হইল, ব্রহ্মস্রোত আসিয়া জীবকে পূর্ণ করিল। একাধারের ব্রহ্ম অন্য আধারে মিশিয়া যান, এইজন্য ঘটের ভিন্নতা, মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ব্রহ্ম অধিবাস করেন। ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মপুণ্য, ব্রহ্মানন্দ। তুমি নূতন মানুষ। নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহ সুবর্ণের যোগ দেখিয়াছিলে, এখন লৌহ কোথায়? উপাধি কেবল লৌহ, ভিতরে সোণা। এখন তোমার কথা তোমার কথা, যখন সেই যোগের অবস্থায় যাইবে, তখন দেখিবে সমস্ত ব্রহ্মের। শক্তিপ্রবাহ শক্তিসঞ্চালন ব্রহ্মের। আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞান পদার্থ ঈশ্বরের। আর কি আমার পাপ হইতে পারে? ব্রহ্ম কি পাপ করিতে পারেন? তুমি বেড়াইতেছ? পরীক্ষা কর, হে ভাবী যোগী, আমি আর নাই, ইচ্ছা নাই চলিবার। ব্রহ্মশক্তি তোমার ঘট পূর্ণ করিয়াছে। ব্রহ্ম তোমায় বসাইয়া দিলেন, ব্রহ্ম তোমার মুখের ভিতরে আহার পূরিয়া দিলেন। সমুদায় ব্রহ্মের খেলা। এ প্রবৃত্তি এ বলবতী ইচ্ছা, ব্রহ্মেরই কামনা, ব্রহ্মেরই শক্তি। সমুদায় ব্রহ্মের দিকে তোমাকে টানিতেছে। দেখিলে, পরিমিত নিবৃত্তি, অপরিমিত যোগ। এই দীপ নিবিল। আরও দীপ নিবিতে পারে? না। নিবৃত্তির অন্ত আছে। ঐ পরিমাণ, আর ঐ দিকে নির্ব্বাণ যায় না। নির্ব্বাণের শেষ আছে, নিবৃত্তি প্রবৃত্তির ন্যায় নহে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সাধুপ্রবৃত্তি অপরিমিত, কেন না ইহার ঈশ্বর অপরিমিত। যোগপথে অনন্তকাল চলা যায়। দৃঢ়তর নির্ম্মলতর যোগ হয়। লক্ষগুণে নিকটতর যোগ? হাঁ। কেন না, অনন্ত জ্ঞান যিনি, আমার ভিতরে যত যান, আরও ভিতরে যান। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে যাই, তাঁহার গভীরতর হৃদয় আছে। পাপ পরিমিত, অনন্ত হয় না। অসাধু চিন্তা, অসাধু রুচি, এক শত কুপ্রবৃত্তি নির্বাইলে;

আর কি নিবাইবে ? যখন এই কয়েকটার নিবৃত্তি হইল, সেই ভয়ানক নিবৃত্তির মধ্যে ব্রহ্ম আসিয়া সন্তানকে ডাকিলেন, 'মৃত সাধক, জাগ।' নিবৃত্তির ঘোর ঘুমের ভিতরে আচ্ছন্ন আত্মাকে ঈশ্বর ডাকিলেন। অনেক যোগীর নির্ব্বাণই স্বর্গ, তোমার যেন তাহা না হয়। নির্ব্বাণের অবস্থায় থাকা প্রার্থনীয় নহে। তাহা হইলে তো জীবন পরিমিত হইল। তুমি ছোট সংসারকে নির্ব্বাণ করিলে; কিন্তু অনন্ত ঈশ্বরকে যোগ দ্বারা বাঁধিতে পারিলে না। সংসার পাপ, সংসার পাপ, বলিতে বলিতে সংসার ছাড়িলে; কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলে না। সেই নির্ব্বাণের নিদ্রা হইতে নিদ্রিত আত্মাকে ব্রহ্ম ডাকেন। কেমন করিয়া জাগিল, সে বুঝিল না। ব্রহ্ম কল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পরে সংযুক্ত হইলেন। যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে। লৌহ সোণা এক। দিনের শেষে রাত্রি, রাত্রির শেষে দিন। স্বর যখন উঠিল, কোন্ স্বর কার ভিতর গেল ? সা হইল ঋ, গা হইল মা,—সংযোগ। জীব হইলেন পরমাত্মার আধার। পরমাত্মা জীবকে এক শক্তি দিলেন। সেই শক্তিতে জীবাত্মা প্রকাশ করিলেন প্রেম। সেই প্রেমে জীবাত্মা পরমাত্মা এক হইলেন, লৌহ সোণা এক ধাতু হইল। সোণার রং কখন কাল লৌহের ভিতরে গেল, জানি না; কাটিলে ভাঙ্গিলে, কিন্তু এই লৌহ সোণাকে আর পৃথক্ করিতে পারিলে না। এই যোগাবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মাকে আর স্বতন্ত্র করা যায় না, দুইয়েরই মধ্যে রেখা দেখা যায় না। এক জীব। ধীশক্তি কাট, এর কোন্‌খানে দেব, কোন্‌খানে নর, বাহির কর। কেবলই সুমতি সুবুদ্ধি। ক্ষুদ্র চিতের ভিতর বড় চিৎ। বস্তু বিভাগ কর। তোমার যে শক্তিতে ধ্যান কর, পরসেবা কর, তাহা

কার শক্তি? গাছ কাটিতে পার, মূল স্বতন্ত্র কর। যে যোগ বদ্ধ হইযাছে, সে যোগ আর কাটে না। যে বলে, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন, তুমি জানিবে, সে বিয়োগে আছে। নাস্তিকের অবস্থা বিয়োগ—সেখানে জীব ব্রহ্ম এক হয় না। যোগের তৃষ্ণা যখন খুব বলবতী হইবে, অনন্ত সোণাকে পাইতে অনন্তকাল লাগিবে। নদীতে ভয়ানক টান দেখিয়াছ, যোগপথ এইরূপ। ধীরে ধীরে যাইতেছ, ঘোর কালীমূর্ত্তি তোমায় ডুবাইবে। যায় নিশ্বাস যায়, আর টেন না, টান ছাড়িতে পার না, গভীর টানে ফেলিবে তোমাকে। মনোহর রূপ তোমায় সৌন্দর্য্য-সাগরে নিক্ষেপ করিবে। হরিরূপ মিষ্ট হইতে মিষ্টতর। কেবল আলোক। মাথায় শশী, বক্ষে শশী। অন্ধকার নিবৃত্তি, কঠোর তপস্যা উপায়; সে সমুদায় পার হইয়া যখন নৌকা পূর্ণিমার রাত্রে পড়িল, তখন কে আনন্দ প্রকাশ করে, কে জানে? নূতন রাজ্য, নূতন উদ্যান প্রকাশ পায়। গেরুয়া পরা সার নহে, নির্ব্বাণ শেষ নহে। নির্ব্বাণে শান্তি হইল, শান্তির 'পর আনন্দ আছে। স্বয়ং ভগবান্ অপরিমিত আনন্দ। বন্ধুর সঙ্গে সখ্যযোগ, সহস্র রজ্জুতে ভগবান্ জীবকে বাঁধেন। মার দিকে আরও যাই। এতক্ষণের পর ঘোর সুখসমুদ্রে পড়িলাম। মহাপ্রভু হে, এখন যদি হাসি, সে হাসি আর দুর্ব্বল হয় না, যদি এই শক্তির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিই! অতএব এমন অবস্থা আসে, যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ, নারীশ্রেষ্ঠ ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব। কি, তুমি কাম ক্রোধ জয় করার অহঙ্কার করিতেছ? এ কি ধর্ম্ম? সামান্য যোগে ধিক্। এ যোগ কৈ? বিয়োগ হইল। যোগ কৈ? ব্যাকরণ অনুসারে বল। নিবৃত্তিতে যোগবিনাশ, প্রবৃত্তিতে যোগ। ব্রহ্ম এখনি তোমায় হস্ত

দিয়া পেষণ করিবেন। দুঃখ আর যে নাই, সুখের যোগে এমনই যোগী। এই যে আধ্যাত্মিক উদ্বাহ হইল, আর ছাড়া যায় না। পুণ্যের সঙ্গে, সুখের সঙ্গে তুমি বদ্ধ হইলে। ভঙ্গ করা যায় না। চেষ্টা কর, মিথ্যা বলিতে পার না। চড়্ চড়্ করে বুক, যোগের বাঁধন তুমি ছিঁড়িতে পার না। একটা হাতী, আর একটা গাছ, ছোট সূত বাঁধা, একি যোগ? আমাকে ছেঁড়, দেখ আমি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়াছি কি না? ব্রহ্মরক্ত বাহির হইল, দুই বস্তু এক হইয়াছে। আমার চক্ষের ভিতর দিয়া জ্যোতি গিয়াছে। তোমারই ভিতরে যোগেশ্বর। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান তোমায় টানিবে। তখন সাহস করিয়া ব্রহ্মতনয় বলিতে পার, "আমি আর আমার পিতা এক"। ব্রহ্ম-পরিপূরিত জীব যোগী এই কথা বলে। তুমি কি শিখিলে? নিবৃত্তিতে থামিবে না। শুভক্ষণে হরি আসিয়া তোমায় টানিবেন, টানিতে টানিতে এমন স্থানে লইয়া যাইবেন, যেখানে অকূল সমুদ্র। এই আকাশ ব্রহ্মাকাশ হইবে। বেড়াই ব্রহ্মের ভিতরে, যাই ব্রহ্মের ভিতরে। একেবারে কিরণ তেজ, ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বাতী যেন কে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই দ্বিপ্রহর রজনীর অন্ধকারের ভিতরে যে এক তেজোময় পদার্থকে পায়, সে সিদ্ধযোগী। সময় আসিতেছে, যখন, হে প্রিয় সাধক, তুমি, আমি এবং আমরা সেই তেজ দেখিব। এই অপরিমিত অনন্ত সাধন কর। এমন সুখী হব যে, তিক্তরস আর খাব না। অন্ধ হইলে দিন কতক, বৈকুণ্ঠ দেখিবার জন্য; বধির হইলে দিন কতক, ব্রহ্মকথা শুনিবার জন্য; হাত নুলো হইল দিন কতক, ব্রহ্মচরণ ধরিবার জন্য। আত্মা এই তোমার হউক। এই নিবৃত্তি তোমায় ব্রহ্ম-বাসনার ভিতরে ফেলিয়া অপার আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া দিক্। *

---

* ষষ্ঠদিনের অনুশাসন হারাইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ দিবসে "সত্য শিব সুন্দরের" সহিত যোগ ব্যাখ্যাত হয়। সং।

সাধ্যসাধনোপনিষৎ।

নিবৃত্তি।

১১ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ২৬শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

জিতেন্দ্রিয় জিতাসন যোগারূঢ় গৈরিকবস্ত্রপরিহিত একতন্ত্রীকর তরুলতাগুল্মবেষ্টিত বেদীতে আসীন আচার্য্য বলিলেন, যোগপক্ষী, সংসারবন্ধন ছেদন কর, আমার সঙ্গে যোগান্তরীক্ষে উড়ে, নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া তত্ত্বচিন্তায় এই বিশ্বের শূন্যত্ব সম্পাদন কর। এখানে কি দেখিতেছ? এখানে সংসার নাই, বন্ধু নাই, চৈতন্য নাই, জড় নাই, দেহ ইন্দ্রিয় বিষয় সহকারে বিলুপ্ত হইয়াছে, আকাশ প্রাণকে গ্রাস করিয়াছে, মন তাহাতে বিলীন হইয়াছে, এখানে আর কিছুই নাই। তোমার ভয় পলায়ন করিয়াছে, বাসনা ছিন্ন হইয়াছে, এখন সর্ব্বথা নিবৃত্তিতে অবস্থান কর। বুদ্ধের ন্যায় চিরকাল নিবৃত্তিতে অবস্থিতি করিও না। ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বা প্রবৃত্তির অনুসরণ কর। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সমুদায় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হও।

সমুদায়কে শূন্যায়মান করিয়া যোগী নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এখন পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিত্যকাল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হউন।

শক্তি।

১২ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আচার্য্য বলিলেন, যোগার্থী, সংযতমনা হইয়া এইরূপে প্রণিধান কর।—আমি অশক্তি, আমি প্রকৃতিদুর্ব্বল, পাপবিদ্ধ, সংগ্রামকুশল নই, নিয়ত শত্রুকরগত। দেব, তুমি শক্তি বল বিক্রম। এ করদ্বয় তোমারই শক্তিতে শক্তিমান্, প্রাণ তোমারই শক্তিতে প্রাণবান্, শ্বাস ও শোণিতপ্রবাহ তোমারই শক্তিতে প্রেরিত। আমাতে কিছুই নাই, যাহা তোমার শক্তি বিনা সত্যতা লাভ করে।

আত্মারূপ শূন্য ঘট আমাতে এই পরা শক্তি আবির্ভূত হইলেন। তদ্দারা আমি অন্য তেজস্বী শক্তিমান্ বীর-প্রকৃতি হইলাম। পাপ-পিশাচকে বজ্রমুষ্টিতে পেষণ করিব, ক্রোধাদিকে সবলে বিদূরিত করিয়া দিব। আমি শক্তির সন্তান শক্তিমান্। আমি দুর্ব্বল নই, ভীরু নই, অক্ষম নই, কাপুরুষ নই। সে পাপের সন্তান, যে বলে, আমি পারি না।

অশক্ত ও দৌর্ব্বল্যনিপীড়িত আমি, তুমি শক্তিস্বরূপ। পাপযুক্ত আমাতে শক্তি সংক্রামিত করিয়া, দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধির শক্তিমত্তা সম্পাদন কর।

জ্ঞান।

১৩ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ২৮শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আমি অজ্ঞান, কুমতি, অবিবেক। দেব. তুমি জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিবেক, সুচিন্তা, সুবুদ্ধি, সদুক্তি। সরস্বতানদীর প্রবাহের ন্যায়, হে সরস্বতী, আমাতে প্রবেশ কর। আমাতে জ্ঞানরূপে যাহা কিছু স্ফূর্ত্তি পায়, তোমা ছাড়া তাহার কিছুই নাই।

সেই বিদ্যা দ্বারা বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া আমি বেদ, আমি শ্রুতি, আমি দেশীয় বিদেশীয় শাস্ত্র। আমি লৌকিক বেদ, শ্রুতি বা শাস্ত্র নহি। সরস্বতীমুখবিনিঃসৃত নিত্যকালপ্রবহমান বেদ আমি, শ্রুতি আমি, শাস্ত্র আমি। আমাতে যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিবেক, সুচিন্তা, সুবুদ্ধি, সদ্যুক্তি, তাহা আমার নহে, তাঁহারই। সরস্বতী আমাতে নিত্যপ্রবাহতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবাহে নীয়মান হইয়া আমি অজ্ঞান হইয়া সজ্ঞান, অবিবেক হইয়া সবিবেক, অসচ্চিন্তক হইয়া সচ্চিন্তক, অসদ্‌বুদ্ধি হইয়া সুবুদ্ধি, অপ্রজ্ঞ হইয়া সৎপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ, আমি কৃতকৃত্য। ইনি ধন্য, ইনি ধন্য, ইনি ধন্য!

জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, সুচিন্তা, সুবুদ্ধি, সদ্যুক্তি ঈশ্বরের, আমার নহে। তাঁহার সঙ্গে একতাবশতঃ আমার এই চিদ্ভাব, আমার এই শাস্ত্রত্ব।

বৈরাগ্য।

১৪ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ২৯শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আমি নিবৃত্ত হইয়াছি, আমি নিবৃত্ত হইয়াছি, আমি নিবৃত্ত হইয়াছি। এ দেহ শবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘোরান্ধকারসংবৃত মেদ শোণিত মাংস ও অস্থি মিশ্রিত বর্ণ এই শ্মশানভূমি। এই শবোপরি উপবেশন করিয়া যোগাবলম্বী হই। অহো! কোথা হইতে এই মহান্ কল কল শব্দ। এ কি দেখিতেছি? পাপরূপ পিশাচ, দানব ও প্রেত এই শবকে অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অহো! মহতী ভীতি, মহতী ভীতি! সাধক, ভয় করিও না, ভয় করিও না। দেখ, কাহার কর্তৃক

অধিষ্ঠিত এ শ্মশানভূমি? পরম উদাসীন মহেশ্বর কর্ত্তৃক। বৈরাগ্য, বৈরাগ্য, বৈরাগ্য! বৈরাগ্যরূপে ইনি সর্ব্বথা চিত্ত অপহরণ করিতেছেন। আশ্চর্য্য! কেন ইনি আমাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন? একি বৈরাগ্য দ্বারা বৈরাগ্যের আকর্ষণ? মূর্খ আমাকে ধিক্! আমি একটি ভগ্ন বরাটিকা, একখানি শবাবেষ্টন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি, ইনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বসৃষ্ট বিশ্ব, দিব্য রাজ্যাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। অহো! লজ্জা আমাকে আবৃত করুক। আমি অপদার্থ, আমার নাম নাই, সর্ব্বথা বিলুপ্ত গ্রস্ত এই বৈরাগ্যসাগর দ্বারা। এ কি দেখিতেছি? দুঃখ, দারিদ্র্য, অকিঞ্চনত্ব। তবে কি এ বৈরাগ্য, বিষণ্ণ মলিনমুখ ইহলোকের সন্ন্যাসিগণের? মহাশ্চর্য্য বিপরিবর্ত্তন! সেই যোগী মহেশ্বর এক হস্তে কমণ্ডলু, অপর হস্তে ধান্যরাশি ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার এই হস্ত সন্তানরক্ষণ, প্রতিপালন, সুখশান্তি-বর্দ্ধন কার্য্যে ব্যগ্র রহিয়াছে। ইনিই লক্ষ্মী শ্রী সম্পৎ। এখানে উভয় প্রকৃতির আশ্চর্য্য মিলন। সর্ব্বথা আত্মত্যাগী, পরের জন্য পরিত্যক্ত-সর্ব্বস্ব, একান্ততঃ তাহাদিগের সুখসংবর্দ্ধনে উৎসুক; সেই কার্য্যে সহাস্য প্রফুল্লবদন। এইরূপ আমি আমাকেও করিব। দ্বিমূর্ত্তিধর দেব আবির্ভূত হউন। তাঁহাতে নিমগ্ন, তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত, তদ্ভাবচেষ্টা-সম্পন্ন হইয়া কৃতকৃত্য হইলাম। আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ, আমি আত্মসুখ পরিত্যাগ করিয়াছি, নিয়ত পরের সুখবর্দ্ধনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, সেই মহেশ্বরে লক্ষ্মীতে আমি বিলীন।

পাপপিশাচসেবিত শবায়মান এই দেহোপরি উপবেশন করিয়া, আত্মসুখে ত্যাগী বিরাগী; পরের সুখের জন্য নিয়ত যত্নশীল হইয়া বিচরণ করি।

বিবেক।

১৫ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ৩০শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আমি পাপ, আমি লৌহময় পুরুষ, নিতান্ত মলিন, পাপদূষিত আমার শোণিত, ব্যাধিগ্রস্ত; নিয়ত কুস্মৃতি, কুকল্পনা, কুচিন্তানিচয় দ্বারা প্রপীড়িত। বিবেক, তোমাকে আমি অভ্যর্থনা করি। তুমি ঈশ্বরের প্রভাব, স্বয়ং ঈশ্বর; তোমা দ্বারা আমি তাঁহার সঙ্গে একত্ব লাভ করিব।

তুমি পুণ্য, তুমি নির্ম্মল, তুমি অগ্নিস্বরূপ; মলিন অঙ্গারতুল্য আমাতে প্রবেশ করিয়া নৈর্ম্মল্য এবং দীপ্তিমত্তা বিধান কর।

সম্প্রতি আমি পুণ্যসম্পন্ন নির্ম্মল তেজস্বী পুণ্যবলে বলবান্ হইয়াছি। কোথায় রে পাপপিশাচ, তোকে আমি পুণ্যাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব। বিপুল পুণ্যযজ্ঞসম্পন্ন পুণ্যাগ্নিরেখার মধ্যগত আমাকে কলুষজাল অধিকার করিতে সক্ষম নহে। প্রবিষ্ট পুণ্য দ্বারা আমার শোণিত বিশোধিত, আমার চিন্তা বিশুদ্ধ, আমার কল্পনা কুচিত্রশূন্য, স্মৃতি অদুষ্ট, সকলই আমাতে পুণ্যোর্জ্জিতসত্ত্ব। আমি ধন্য! বিবেক পুণ্যসহ একীভূত হইয়া আমি পুণ্যত্বসম্পন্ন হইয়াছি।

পরমেশ্বর প্রভব (উৎপত্তি-স্থান), বিবেক প্রভাব, ভিন্নরূপ নহেন। পরমেশ্বর মনুষ্যে বিবেক দ্বারা বিকাশ লাভ করিয়া তাহাতে অবতীর্ণ। আমি সেই বিবেকযোগে ঈশ্বরের একত্ব লাভ করি।

সৌন্দর্য্য।

১৬ই ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ৩১শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

অশক্তি হইতে নিবৃত্তি, শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি, জ্ঞানে প্রবৃত্তি, সংসার হইতে নিবৃত্তি, বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি, পাপ হইতে নিবৃত্তি, পুণ্যে প্রবৃত্তি লাভ করিয়া আমি কি সম্পন্ন হইলাম? ইহা-দিগের সম্মিলন তো হয় নাই। ইহারা সম্মিলিত হইলে তবে যোগে পূর্ণত্ব। ইহাদিগের একতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে। তবে এখন তাহারই অনুসরণ করি। অহো! ঘনীভূত প্রেম, ঘনীভূত আনন্দ মহেশ্বর বিশ্বকে বিমুগ্ধ করতঃ, শক্তিতে বিদ্যাতে বৈরাগ্যে পুণ্যে আবি-র্ভূত হইয়া, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করিলেন। যদি তাঁহার করুণাতে সেই সেই স্বরূপে আবিষ্ট হইয়াছি, তবে ইহাতে কেন মগ্ন হইব না? অহো! যোগভূমিতে আনন্দোৎসব লক্ষিত হইতেছে। তবে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদায় দুঃখ পরিত্যাগ করি। পরম আনন্দে আবিষ্ট, সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ, চিরপ্রমত্ত, পাপবিকারোত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম। আনন্দময়ীর ক্রোড়ে বিলীন, তাঁহার স্তন্যপানে অপূর্ব্বতাপ্রাপ্ত, তাঁহার সন্ততিগণের মধ্যগত হইয়া আমি পারপ্রাপ্ত হইলাম, পারপ্রাপ্ত হইলাম।

সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বজনগণ লইয়া আনন্দময়ী আনন্দনৃত্য বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া, নিত্য স্তন্য পান করিয়া, কৃতার্থ হইলাম, বন্ধনবিমুক্ত হইলাম।

পরিশিষ্ট।

ভক্তিশিক্ষার্থী ও সেবাশিক্ষার্থীকে বস্ত্রাদিদান।

কলুটোলা, শুক্রবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক ;
২১শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

কেশবচন্দ্র ভক্তিশিক্ষার্থী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্ত-বিহারীকে প্রণাম করি।

অনন্তর উপস্থিত উপাসকগণ মধ্যে সেবাশিক্ষার্থী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বিনীতমস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বস্ত্র ও পাদুকা উপহার দিলেন।

হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি স্বহস্তে যাঁহাদিগকে উচ্চপদস্থ করিয়াছ,

তাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিল না, কেবল তাঁহাদের শরীর দেখিল, তাই পরস্পরের প্রতি নির্য্যাতন। মনুষ্যের কাছে বসা কি শক্ত ব্যাপার! যাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগের অগৌরব করিবার ইচ্ছা করা কি ভয়ানক অপরাধ! তোমার সন্তানেরা আমার প্রভু, সেই প্রভুদের চরণতলে আমার আসন বিস্তার করিতে দাও। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। তাঁহারা শূদ্রের সেবা গ্রহণ করেন, ইহা আমরা গৌরব বলিয়া বিশ্বাস করিব। হে শূদ্রের পিতা, হে ব্রাহ্মণের পিতা, যাহাতে ভক্তির সহিত দান করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যথার্থ বিনয় দাও। বাহিরের ব্যাপারগুলি যদি কপট হয়, তবে তো আমি গেলাম। আমি দীন, আমি দুঃখী, আমি শূদ্র, শূদ্রের যতদূর বিনয়াচারী হইতে হয়, তাহাই কর। উপদেশ দিবার ভার আমাকে দিলে, প্রভু-দিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে আমি শূদ্র হইয়াও উপদেশ দিব, তুমি আমার গলায় বিনয়ের বস্ত্র দাও। সুন্দর বিনয়-ভূষণ আমি যেন সর্ব্বদা গলায় রাখিতে পারি। এত বড় লোকদের সঙ্গে যেন আমি যেমন তেমন ব্যবহার না করি। আমি দোষ গুণের বিচার করিব না। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল তোমার অংশ দেখিব। ব্রাহ্মণের সেবা করিব আমি, কি স্পর্দ্ধা শূদ্রের? তোমার অনুগ্রহে তোমার সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিব। ভ্রাতৃপ্রণয় চাহি না, আমি কি আমার প্রভুদিগের সমান যে আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে যাইব? আমি যদি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করি, আমার পরিত্রাণ হইবে না। প্রাণের যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সেবা করিলে আমার পুণ্য হইবে। ভক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি দিলে শূদ্রের হৃদয় পবিত্র হইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে তুমি বাস কর, ইহা জানিয়া ভাই

ভগ্নিদিগকে শ্রদ্ধা করিব। অত্যন্ত বিনীত দাস হইয়া ব্রত পালন করিব। হে অধমবৎসল, সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!